PRINTED IN INDIA

PRINTED AND PUBLISHED BY RANABIR DASGUPTA,
SUPERINTENDENT, CALCUTTA UNIVERSITY PRESS,
48, HAZRA ROAD, BALLYGUNGE, CALCUTTA.

সূচীপত্র

প্রস্তাবনা

আঁখি মেলে তোমার আলো
প্রথম আমার চোখ জুড়ালো
ঐ আলোতেই নয়ন রেখে
মুদবো নয়ন শেষে

তারাশংকরের মৃত্যু সংবাদ শুনে কবিগুরুর ঐ কথাগুলোই বার বার মনকে চঞ্চল করে তুলছিলো—হ্যাঁ, আলোর ঝরণা ধারায় স্নান করে, স্নিগ্ধ হয়ে, মহাতামসীকে নমস্কার করে, পরমানন্দ মাধবের দর্শন পেলেন—চোখ জুড়িয়ে গেল সে আলোয়, আবেশে মুদে গেল শান্তির পারাবারে। প্রায় পরিণত বয়সে পরলোকে প্রয়াণ করেছেন তিনি, আর এমন সময়ে যখন তাঁর সারস্বত সত্তা তাঁর দেশবাসীর চিত্তাকাশে তুঙ্গী, যখন তিনি গণ-দেবতার 'প্রিয়ানাং প্রিয়পতি, নিধিনাং নিধিপতি', তাঁর রচনা-সম্ভার সর্বত্র সমাদৃত, তাঁর সাহিত্যিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা পারদ-যন্ত্রের উচ্চ সীমায়, জীবন ঔজ্জ্বল্যে ভরা, দীপ্তিতে প্রখর, প্রাপ্তিতে নধর—সে পাওয়ার পরিধি শুদ্ধ অর্থে আভিজাত্যে, বাড়ীতে গাড়ীতে ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সে নয়, মানুষের প্রীতিতে শ্রদ্ধায় হৃদয়ের আতিথ্যে ভালোবাসার রূপান্তরিত রসায়নে; সব পাওয়াকে ছাপিয়ে যখন 'পাওয়া' হয় 'হওয়া'।

বাইবেলোক্ত সপ্ততিবর্ষের সীমানা পেরিয়ে তিনি জীবনদেবতাকে বলতে পারতেন—কতো গান ত হলো গাওয়া, আর কেন তবে গাওয়াও—না, তিনি জীবনসায়াহ্নেও গাণ্ডীবকে ছাড়েন নি আর গাণ্ডীবও তাঁকে ছাড়ে নি—অনর্জুনরা মাঝে মাঝে বলেছে যে আপনি এবার কলম থামান। সারস্বত তপস্বী সে কথায় কান দেন নি। বরং সৃষ্টি-মূলক সাহিত্য থেকে দেখি তাঁর মন চলেছে সাহিত্যের উপাদান বিশ্লেষণে বিচারে, কিন্তু বিনি মূলে স্রষ্টা সাহিত্যিক তাঁর বিচার রসাশ্রয়ী হতে বাধ্য, শুধু তর্ক-বিতর্ক মতপথ কণ্টকিত কূট মন্তব্যেই পর্যবসিত হয় না। তারাশংকরেরও হয় নি। সত্যকার সৃষ্টি

হচ্ছে আত্ম-আবিষ্কার, আত্মপ্রসারণ, আত্মচিন্তা, নিজেকে পরের মাধ্যমে ফিরে পাওয়া। আসল সাহিত্যের সীমানা হচ্ছে ভাব থেকে রূপে যাওয়া, রূপ থেকে ভাবে আসা, ঐতিহ্য থেকে প্রতীক, প্রতীক থেকে ঐতিহ্য—from legend to symbol and from symbol to legend. দুই মিলিয়েই রসের জগৎ, কল্পনার সৃষ্টি, বিচারের মানদণ্ড।

তারাশংকরের আবির্ভাব এমন এক যুগ-সন্ধিক্ষণে, যখন সাহিত্যাকাশের প্রতিটি কোণ রবিকরসমৃদ্ধ, রাত্রির প্রতিটি প্রহর শরৎ চন্দ্রের উজ্জ্বল কিরণে সমুদ্ভাসিত, যখন কল্লোলীয় ভাবপ্লাবনে আমরা হাবুডুবু খাচ্চি, পটলডাঙার পাঁচালির মর্বিডিটিতে ভুগছি, মহাপ্রস্থানের পথের রোমাঞ্চিত স্নিগ্ধতায় মুগ্ধ হচ্চি, তখন রুচির তৃষ্ণা মেটাবার জল নিয়ে এলেন তারাশংকর মাটির ভাঁড়ে, কিন্তু সে প্রাণহরা বারি স্বর্ণভৃঙ্গারে আনীত পানীয়ের চেয়ে কম তৃষ্ণা-হরা নয়—স্বাদু স্বাদু পদে পদে। ঋতুর পরিবর্তন ঘটলো বাংলা সাহিত্যের চিদাকাশে তথাকথিত রিয়েলিজমের সঙ্গে আদর্শবাদীর জীবন জিজ্ঞাসার হল মিলন-আলিঙ্গন-আলিম্পন।

চৈতালী ঘূর্ণীর দিন থেকে আজ পর্যন্ত তিনি দাঁড়িয়েছেন জীবন দেবতার সামনে, রাত্রির তামসীতে, অন্ধকারের গহিনে, কখনো বিচারকের স্তব্ধদৃষ্টিতে, যার অন্তরলোকে চৈতন্য পূর্ণচন্দ্রের মত জ্যোতিষ্মান হয়ে ওঠে, যিনি আত্ম-সমর্পণ করতে চান 'ডিভাইন জাষ্টিসে'র কাছে, সুনীতির মত কালিন্দীর ধারে দেখতে পান "মেঘমুক্ত ভাবী আকাশের সর্বপাপঘ্ন দেবতার দ্যুতি"। এই জীবনবোধ, জীবনবাদ না হয়ে, হয়েছে যুগযন্ত্রণার উপরে একটি শাশ্বত জীবনবেদ। তাই তাঁর লেখায় গল্প উপন্যাসের শিল্প কর্ম ছাড়াও অতিরিক্ত কিছু পাওয়া যায় যাকে বলা যেতে পারে—আত্মজিজ্ঞাসা। এই কথা না জানলে তারাশংকরকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা যাবে না। বলতে ইচ্ছে করে—ধ্যান সাঙ্গ হলো? মাধবের চরণাশ্রয়ে শান্তি পেলে? তাঁর একটি কবিতা মনে পড়ছে,

তোমার শেষ বিচারের আশায়
বসে আছি; তোমার রাজ কর্মচারীর দেউড়ীতে হে
বসে আছি।
চোখের জলই কি পাওনা শুধু
এই জীবনের বিকিকিনির পেশায়
তুমি ছাড়া কেউ জানে না
অপর জনে তা মানে না, ডিক্রী নিয়ে শাসায়;

আমরা কিন্তু বলতে পারি বৈষ্ণব বাউলের ভাষায়—

আর ভাবনা নাই খ্যাপা মন
আর ভাবনা নাই
এপার ওপার রেলের লাইন
পেতেছে নিমাই
গড়গড়িয়ে যাবি চলে
ওরে আর ভাসতে হবে না
ক্ষ্যাপামন—নাই, ভাবনা নাই।

(২)

তারাশংকর আজ ইতিহাস। তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে প্রচুর, ভাব গদগদ স্মৃতিতে, বন্ধুবৎসল প্রীতিতে, তাঁর গল্প উপন্যাস সম্বন্ধে বিশ্লেষণ বিচার অতীতে হয়েছে, আজও হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে একথা জানি। স্রষ্টা সাহিত্যিককে নিয়ে যুগে যুগে নিরীখ বদলায়, নব মূল্যায়ন হয়, যুগোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়। শরৎচন্দ্রের বেলায় আমরা তা দেখেছি। তাই আজ তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির সম্পর্কে নূতন কিছু না বলে তাঁর নিজের কথায় নাট্যকারের বিচার-বিশ্লেষণের ধারার উপরই দু-একটা মন্তব্য পেশ করে যাব। আমরা সবাই জানি তারাশংকর হতে চেয়েছিলেন নাট্যকার—থিয়েটার তিনি ভালবাসতেন, থিয়েটার তিনি করতেন, থিয়েটার তিনি দেখতেন এবং গ্রামে বসে তার জন্য 'পালা' লেখা সুরু করাই তাঁর সাহিত্য অঙ্গনে প্রবেশের প্রথম লগ্ন। তাঁব উপন্যাসের নাট্যরূপ বহুদিনই জনচিত্তকে আমোদিত প্রমোদিত করেছে। নাট্যকার তারাশংকরের ইতিহাস আমি বলছি না, কিন্তু তাঁর মনে এই নাট্য-ভাবনা কি রূপ নিয়েছিল তারি একটি দলিল সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে এসেছে সেইটিই আপনাদের কাছে সভয়ে দাখিল করছি। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে বলি যে শুনেছি যে আপনি থিয়েটার করতে ভালবাসতেন, সেই নাট্যভাবনা সম্বন্ধে আপনি কিছু বলুন না। তিনি রাজী হয়ে বললেন যে আমি যে বক্তৃতামালা রচনা করছি "পাঁচজন নাট্যকারের সন্ধানে" তারি মধ্যে এ সম্বন্ধে কিছু বলবো, পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করবো। মহাকাল তাঁকে ডেকে নিলেন। বক্তৃতামালা তিনি উদ্বোধন করে যেতে পারেন নি, কিন্তু তাঁর বক্তব্য লিখে রেখে গেছেন। বিখ্যাত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান (গোলপার্ক) রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউটের সহযোগিতায় এই বক্তৃতাগুলির সারাংশ সম্পাদন করে, পাঠ করবার ভার বিশ্ববিদ্যালয়

আমার উপর দেন। আমি যতটা উচিত ও সঙ্গত ততটা হয়ত পারিনি। সেইগুলিই এখন প্রকাশিত হলো। এই বক্তৃতামালায় তিনি মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও রবীন্দ্রনাথ (দুটি মধুর নাটক) সম্বন্ধে তাঁর নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন। সাহিত্য-স্রষ্টা সেখানে সাহিত্য-সমালোচক। একথা তিনি নিঃসঙ্কোচে বলেছেন যে জীবনে শিল্প-বোধ উন্মেষের প্রথম কালেই, প্রথম যৌবনেই নাট্যমঞ্চ, নাটক ও অভিনয়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ঘটেছিল। তিনি তাঁর স্বগ্রামে নাট্যমঞ্চে অভিনয় করেছেন, অভিনয় যোগ্য নাটক অভিনয়ের প্রয়োজনে, প্রাণের আনন্দে। এবং সেই সঙ্গে গোপনে গোপনে নাটক রচনা করবার চেষ্টাও করেছেন। অবশ্য পরের যুগে নাট্যকার রূপে তাঁর নিজের আবির্ভাব সকলেরই জানা। তাঁর রচিত নাটক তাঁর গ্রামের নাট্যমঞ্চে মহাসমারোহে অভিনীতও হয়েছে। সেই জন্য বলতে পারা যায় সাহিত্যে তাঁর হাতেখড়ি নাটকের মধ্য দিয়েই। কিন্তু সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব নাট্যকার হিসাবে নয়, গল্পকার বা ঔপন্যাসিক হিসাবেই। অবশ্য পরবর্তীকালে তাঁর এই নেপথ্য অভিজ্ঞতা তাঁকে নাটক রচনার কাজে সহায়তা করেছিল। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে নাটক সম্পর্কীয় সমস্ত জ্ঞান তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ, হয়তো "পল্লবগ্রাহী এবং অগভীর" (তাঁর নিজের কথায়)। সৌজন্যসূচক এই অতি বিনয়ের কথা মেনে নিলেও একথা সুস্পষ্ট যে বাল্যকাল থেকেই তিনি নাটকের ভক্ত, বহু নাটকের বহু ভূমিকায় অভিনয় করেছেন এবং শুধু অভিনয় নয়, তার মুগ্ধ পাঠক ও গুণগ্রাহী রসাস্বাদী। তারাশংকরের মূল্যায়নের সঙ্গে অন্য পাঁচজনের মূল্যায়নের প্রভেদ এখানেই। নাটক সাধারণভাবে মূলতঃ অভিনয়ের মাধ্যমে নাট্যমঞ্চের পীঠভূমিতে আস্বাদনের বস্তু, তারাশংকরের মতে নাট্যমঞ্চের ও অভিনয়ের পটভূমিতেই তার আসল ও সঠিক বিচার তবু সাহিত্যরসাস্বাদনের আলোচনার মধ্যে তার বক্তব্যকে তিনি সীমাবদ্ধ রেখেছেন। কবির কাব্য, নাট্যকারের নাটক, গল্পকারের গল্প শুধু ধ্বনির লাবণ্যে নয়, রসাত্মক বাক্যের সৃষ্টিতে নয়, ঘটনার সমষ্টিতে নয়, সব মিলিয়ে রসাস্বাদন করবার ও করাবার সমঞ্জস রীতিতে, সমর্থ নীতিতে। কারণ সাহিত্যিক শুধু কথার ছবিই আঁকেন না, সমাজজীবনের চিত্রকরই নন, গুণী কারুশিল্পী বা ক্র্যাফটসম্যান্ নন বা ক্রিটিক্ অফ্ লাইফ নন্ তিনি এ সব ত বটেই তবু তাঁর লেখায় বা চরিত্রে পরিস্ফুট হবে ঐশ্বর্যের ও মাধুর্যের এক নূতন তুরীয় লোক। বাচ্যবস্তুর স্পষ্টতার সঙ্গে ধ্বনির একটি অনির্বচনীয় যোগ—প্রসাধনের বৈচিত্র্যের সঙ্গে উপলব্ধির নিবিড়তা। নাটকেও এই অনুভূতি রূপ নেয় একটি নিটোল রসাস্বাদে। কতটুকু ব্যক্ত হবে, কতটুকু অব্যক্ত থাকবে, সেটা নির্ভর করবে নাট্যকার কোন জিনিষ ফোটাতে চাচ্ছেন কতটুকু জীবন চেতনা, কতটুকু লীলা, কতটুকু

লাস্য, কতটা বিভঙ্গ কি ভঙ্গীতে। তাছাড়া নাটক শুধু পড়ার জন্য নয়, এটা প্রধানতঃ audio-visual। সাহিত্যিক সমালোচকদের ভুললে চলবে না যে সেখানে সাহিত্যিক-চেতনা ছাড়াও ঘটনার সমাবেশে একটা গতিময়তার ছাপ থাকা চাই। সেখানে পাত্র-পাত্রীদের ভঙ্গী, বক্তব্য, অঙ্গবিন্যাস, সাজসজ্জা, আলো, পটভূমিকা, অভিনয় কুশলতা, সৌকর্য, সবই নাটকের পরিস্ফুটনের সহায়ক। নাটকের পূর্ণ বিকাশে এর উপাদান। জানি এখনি সমালোচক বলবেন—নাটকের সাহিত্যিক কাঠামোটার (Literary form) স্থায়ী রূপ আছে, কিন্তু তার audio-visual রূপটি দুদিনের। সেই ক্ষণিককে নিত্য করছে কে এবং শিল্পরুচি, কারুকৌশল, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দল যুগে যুগে বদলায়, তার নিরীখও বদলায়। শেক্সপীয়র চিরকালের কিন্তু ডেভিড্ গ্যারিক, বীরভূমন্ত্রী, আর্ভিং খন্ডকালের। এক হ্যামলেট চরিত্রই কতো রকমে রূপায়িত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবীই ধরুন, শ্রদ্ধেয় শম্ভু মিত্রের পরিচালনায় তার এক নূতন রূপ আমরা দেখেছি, হয়তো কবি সে অর্থে নাট্যরূপ দেন নি। বার্নার্ড 'শ সেই কথাই বললেন তাঁর— "The Interpreters" প্রবন্ধে— "The cry is still they come".

(৩)

আর একটা উদাহরণ দিই। "রাজা ও রাণী" কবির অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সের রচনা। রাজা বিক্রমের প্রচণ্ড আসক্তি ছিল রাণীর প্রতি, সুমিত্রার মৃত্যুতে হলো তার অবসান। কবির দ্বিধা ছিল এর সম্যক রূপটি বুঝি ফোটে নি "রাজা ও রাণীতে"। কুমার ও ইলার প্রেমও বাধা দিয়েছে নাটকের মূল ধারাকে। তার বদলে কবি যোগ করলেন, নরেশ-বিপাশার মনোরম কাহিনী মূলতত্ত্বের সঙ্গে ভারসাম্য রেখে। "রাজা ও রাণী"র নাট্যভূমিতে লিরিকের প্লাবনে আমরা দেখেছি কাশ্মীর দুহিতাকে যে জালন্ধর-রাজের দুর্দান্ত হিংস্র প্রেমকে প্রতিহত করছে। তপতীতে কাশ্মীর কন্যা বিপাশা বলছে—

মানব না, ও কথা মানব না, কাশ্মীর জয় করেছ তোমরা, মানব না। নরেশ তার উত্তর দিয়েছিলো—অরসিক ইতিহাস মধুর কণ্ঠের সম্মতির অপেক্ষা রাখে না।

জবাবও এসেছিল সঙ্গে সঙ্গে—আর দাম্ভিক কণ্ঠের আস্ফালনের ভাষাও তার ভাষা নয়।

সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের বাঁকা স্রোতখানি আমাদের নিয়ে যায় সেই দেশে যেখানে সৃষ্টি স্বপ্নে কথা কইতে চায়—

বলিতে না পারে স্পষ্ট করি
অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ উঠিছে গুমরি

এই অব্যক্তকেই কবি আরো ব্যক্ত স্পষ্টতর করতে চেয়েছেন তপতীতে। সুমিত্রার মৃত্যুতে আসক্তির অবসান হওয়াতে সেই স্মৃতির মধ্যেই সুমিত্রার সত্যস্থান রাজা উপলব্ধি করেন। যদিও সুপণ্ডিত ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বলেন যে এই উপলব্ধি হয়েছিল কিনা নাটকে তাহা লিখিত হয় নাই। সাহিত্য-সমালোচকের দৃষ্টিতে এই মন্তব্য সত্য ও সমীচীন, কিন্তু অভিনয় দ্রষ্টা হিসাবে এই সত্য যে উপলব্ধি হয়েছিল তার বিশেষ প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের তপতী অভিনয়ে। সেদিন শেষ দৃশ্যে রাজার বেশে দূরে চিতাগ্নির ম্লান ছায়ায় কবির অপূর্ব ভঙ্গীতে উপস্থিতি আজও মনে পড়ছে—সঙ্গে সঙ্গে বেদমন্ত্র পাঠ হচ্ছে—ভস্মান্ত শরীর আসক্তির মূল শিকড়কে উপড়ে দিয়ে প্রেমের অনির্বচনীয়তায় পরিণত করছে—ওঁ ক্রতো স্মর, কৃতং স্মর।

(৪)

তারাশংকরের আলোচনাতেও নাটকের এই দিকটির দিকে দৃষ্টিপাত হয়েছে দেখি। বাংলা নাটকের একশো বছরের কিছু বেশী বয়স—তার ইতিহাস আলোচনা করে তারাশংকরের মত যে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের মধ্যে এর অভিনয় সীমাবদ্ধ থাকে নি, একান্ত স্বতঃস্ফূর্তের মত তা বাঙালীর সামগ্রিক জীবনের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাঙালী, জাতি হিসাবে নাটক ভালবাসেন, অভিনয় ভালবাসেন এবং সে সম্পর্কে তাঁদের অনুরাগ অতি প্রবল। তারই প্রকাশ বাংলাদেশের শহরে গ্রামে নিয়মিত ও অনিয়মিত অভিনয়—আয়োজনের শতাব্দীব্যাপী ধারাবাহিক প্রচেষ্টার মধ্যে সুপরিস্ফুট। রঙ্গমঞ্চের চৌহদ্দীর মধ্যে যেমন নাটক লেখা হয়েছে, তেমনি নাট্যোৎসাহী মানুষ দূরে থেকেও নাট্য রচনা করেছেন, সে নাটকের অভিনয় করাচ্ছেন। সে আয়োজনও তারাশংকরের মতে বাংলার নাট্য সাহিত্যকে কম সম্পদ দেয় নি। মহাকবি রবীন্দ্রনাথই তার শ্রেষ্ঠ ও উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। সে প্রচেষ্টা, আজও নিঃশেষ হয় নি। আজকের দিনে অসংখ্য সৌখীন, আধা-সৌখীন, আধা-ব্যবসায়িক নাটক রচনা ও তার অভিনয়ের মাধ্যমে নাট্য-আন্দোলন বেশ একটা মূর্তি নিয়ে আবির্ভূত

হয়েছে। তারাশংকর একথাও সশ্রদ্ধভাবে স্বীকার করেছেন যে বাংলার নাটক ও রঙ্গমঞ্চ এই দীর্ঘকাল ধরে বাংলাদেশকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যা দিয়েছে তার পরিমাণ কম নয়। ১৮৬০ সালে "নীল দর্পণের" আবির্ভাবের সঙ্গে তীব্র প্রতিক্রিয়া দিয়ে বাংলা নাটকের সূত্রপাত, বাংলা নাটক পরবর্তী কালে সেই ভূমিকায় কম বেশী অভিনয় করে আপনার কর্তব্য পালন করতে বিরত থাকে নি। স্বদেশী আন্দোলনে ও স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা নাটকের দান বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। বিভিন্ন সামাজিক কুসংস্কার দূর করার কাজেও বাংলা নাটক কালে কালে তার কাজ করেছে। তারাশংকর তাকে অভিহিত করেছেন—নাটক ও রঙ্গমঞ্চের সদাজাগ্রত চক্ষু ও সদা-সতর্ক বিবেক বলে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও তাঁর প্রতীতি হয়েছে যে কেবলমাত্র তাৎক্ষণিক প্রয়োজন সিদ্ধ করবার জন্যই বাংলা নাটক রচিত হয় নি। বহুসংখ্যক বাংলা নাটকে মানুষের, সমাজের ও দেশের তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অল্প-বিস্তর সিদ্ধ হয়েছে এ গৌরবের কথা, কিন্তু সেই মুহূর্তের নগদ লাভের শিরোপাই (রবীন্দ্রনাথ যা শরৎচন্দ্রকে বলেছিলেন) শুধু তার পাওনা নয়। তার মধ্যে নিত্যকালের আনন্দের সামগ্রী বিধৃত—এইটিই সব চেয়ে বড় কথা। সেই দিক থেকে বিবেচনা করেই তিনি বাংলা নাট্যকারদের দীর্ঘ উজ্জ্বল তালিকার মধ্য থেকে গুটিপাঁচেক নাম বেছে নিয়েছেন। বলা বাহুল্য এই পাঁচজনকেই যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলে গণনা করেছেন এমন কথা কেউ যেন মনে না করেন। তাঁর ব্যক্তিগত রুচিই তাঁকে প্রভাবান্বিত করেছে। নিত্যকালের সাহিত্যের পটভূমিতেই তাঁর আলোচনা। তাছাড়া তাকে ঠিক সাহিত্য বিচারও বলবো না। তাঁর রসাস্বাদনের অভিজ্ঞতাই পুনরায় আস্বাদনের জন্য উপস্থাপিত করেছেন, যদিও তাঁর মতে তাৎক্ষণিক প্রয়োজন কালানুযায়ী অনিবার্যতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে দীনবন্ধুকে নাট্যকার হিসাবে প্রকটিত করেছিল এবং 'নীলদর্পণ' তাঁর জীবনের মাত্র একবার অগ্নি-উদ্‌গিরণের ইতিহাস।

(৫)

একটি গল্প তিনি বলেছেন—একদিন প্রভাতের প্রথম প্রহর; আমাদের বৈঠকখানা বাড়ীর বিস্তীর্ণ, ভগ্নপ্রায় হতশ্রী বাগানে খেলা করে ফিরছিলাম। নির্জন পল্লীগ্রাম, পথে মানুষের আনাগোনা বিরল, সমস্ত পাড়াটা প্রায় নিস্তব্ধ। এমন সময় কানে কিসের দীর্ঘধ্বনি ভেসে এসে আঘাত করল। সতর্ক হয়ে শুনতেই বুঝলাম—সুর, গানের সুর ভেসে আসছে। গানের সুতীক্ষ্ম সুমধুর সুরের কোলে কোলে কোন সঙ্গীত যন্ত্রের সুর বেজে চলছে।

কেউ গান গাইছে হারমোনিয়াম বাজিয়ে। গানের কথা কিছু বুঝলাম না, কিন্তু গানের সুরে যেন প্রায় পঙ্গুর মত দাঁড়িয়ে রইলাম। এমন সুর, এমন বাজনা তো এর আগে কখনও শুনিনি। পরমুহূর্তেই সেই সুরের উৎস সন্ধান করতে বেশীদূর ছুটে যেতে হল না। আমাদের বৈঠকখানার সামনের রাস্তার ধারের একতলা ঘর থেকে গান ভেসে আসছে। ছুটতে ছুটতে গিয়ে রাস্তার ধারের জানালার দুটো গরাদে দুই হাতে মুঠি করে ধরে, একান্ত আগ্রহাতিশয্যে দুটো গরাদের ফাঁকে মুখ চেপে রেখে গান শুনতে লাগলাম।

আমাদেরই গ্রামের দুটি সতেরো-আঠারো বছর বয়সের তরুণ। তাঁদের একজন একটা উঁচু পায়ের চাপে বাজানো হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান করছেন, অন্যজন তাঁর পাশে বসে আছেন একখানা কাগজ সামনে রেখে। সাধারণ হারমোনিয়াম দেখেছি, এ সেই রকম, কিন্তু তার থেকে কিছু পৃথক। এর সুর অনেক বেশী মধুর, স্বর অনেক জোরালো। পরে জানলাম ওকে অর্গান বলে। সেই অর্গান বাজিয়ে অতি সুকণ্ঠ তরুণ গায়ক গান গাইছেন—ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা। মন্ত্রমুগ্ধের মত গানখানি সবটা শুনলাম। মন ভরে গেল বললে সে অভিজ্ঞতার কিছুই প্রকাশ করা হয় না। মনে হল এমনটি আর এর আগে শুনিনি। এমন কথা, এমন ভাব, এমন সুর, তার সঙ্গে এমন বাজনা... এইতো শুনতে চাইছিলাম এতদিন, এরই জন্য তো আমার মন তৃষিত হয়েছিল। দেশ কাকে বলে, দেশাত্মবোধ কি, তা না জেনে, না বুঝেও মন সঙ্গে সঙ্গে তাকে গ্রহণ করলে, এতটুকু কুণ্ঠা করলে না। তারাশংকরের এই উক্তি উল্লেখযোগ্য, কারণ বাংলা নাটকের সম্বন্ধেও তাঁর ঠিক এই কথাটিই মনে হয়েছিল। মধুসূদন সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য একটি স্বল্পবাক্ সমালোচকের হলেও উদ্ধৃতির অপেক্ষা রাখে, কারণ কয়েকটি কথায় বাংলা নাট্য সাহিত্যে মধুসূদনের স্থান তিনি নির্দেশ করেছেন সুষ্ঠুভাবে। তিনি বলেছেন—মধুসূদনের পরিচয় লিপ্সু কেউ তাঁর নাটকগুলি বাদ দিয়ে শুধুমাত্র তাঁর কাব্য পাঠ করেই তা পাবেন না। তাঁকে তাঁর সব নাটকগুলিও পড়তে হবে।

নাটকে মধুসূদন দীর্ঘদিন মনোনিয়োগ করতে পারেন নি। এই আশ্চর্য প্রতিভাময় পুরুষটির সত্যকারের সাহিত্য-কর্মের কাল মাত্র চার সাড়ে চার বৎসরের। প্রথমেই নাটক রচনা দিয়ে তাঁর সাহিত্যজীবন আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু তাঁর আর নাটক রচনার সময় ছিল না। তাঁর সম্পূর্ণ চিত্তাকাশ তখন কল্পনার ঘনকৃষ্ণ মেঘে মেদুর হয়ে উঠেছে। সেই মেঘমেদুর কল্পনার আকাশে তখন বিদ্যুৎচমকের মত স্বর্ণলঙ্কা নামক এক অমরাবতীর সৌধশীর্ষ ও দেবদেউল আর সেই সঙ্গে রাবণ নামক এক পুরুষের ট্র্যাজিক মহিমার মহিমান্বিত, বিষণ্ণ মুখ বার বার উদ্ভাসিত হয়ে উঠে তাঁকে ক্ষণে ক্ষণে বিচলিত করছে। সেই

বিদ্যুচ্চকিত মেঘমেদুর আকাশের কোণে কোণে কোলে কোলে অমিত্রাক্ষর ছন্দের মেঘমন্দ্র মৃদঙ্গধ্বনি ক্ষণে ক্ষণে গুরু গুরু করে ধ্বনিত হয়ে চলেছে। কবির কল্পনা স্বর্গ থেকে 'মেঘনাদবধ' নামক মহাকাব্যের আধারে মর্ত্যলোকে শ্লোকে শ্লোকে সেই আকাশ-গঙ্গার ধারা বর্ষণ তখন আসন্ন। কিন্তু মধুসূদনের সম্পূর্ণ পরিচয় লাভ করতে পদক্ষেপ করে কোন পথিক যদি নাটকগুলিকে পাশ কাটিয়ে একেবারে তার মহাকাব্যের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে অগ্রসর হন, তবে শতাব্দী পারের সত্তর-অতিক্রান্ত এক সামান্য সাহিত্যসেবী হিসাবে একান্ত নম্রভাবে তর্জনী উত্তোলন করে, সেই মহাকবিরই বাক্য উদ্ধৃত করে তাঁকে শোনাব—

দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব বঙ্গে,
তিষ্ঠ ক্ষণকাল।

নাট্যঅঙ্গনে তথা বাংলা সাহিত্যের গর্ভগৃহে মধুসূদনের প্রবেশের কথা সম্পর্কে তারাশংকর বলছেন—পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহেব উদ্যোগে বেলগাছিয়ার বাগানবাড়ীতে রামনারায়ণ তর্করত্নের "রত্নাবলী" নাটক উপলক্ষে মধুসূদনকে আহ্বান করা হয় ইংরাজী অনুবাদের জন্য। তাঁর ভাগ্যদেবতা বা জীবনদেবতা এই যোগাযোগটি করিয়ে দেন। তিনি বন্ধু গৌরদাস বসাককে বলেছিলেন—'কি দুঃখের কথা যে রাজারা এই কাজে নাটকের জন্য এত টাকা খরচ করছেন। আগে জানলে আমি তোমাদের থিয়েটারের জন্যে উপযুক্ত নাটক লিখে দিতাম। গৌরদাস নাকি হেসে বলেছিলেন 'তুমি, কি লিখবে? বিদ্যাসুন্দরের মত আর একটা খেউড় তৈরী করবে তো।' কথাটা মধুসূদনের অন্তরে আঘাত করেছিল। তাঁর প্রথম নাটক "শর্মিষ্ঠা" (১৮৫৯ খৃঃ অঃ)। শর্মিষ্ঠার ইংরাজী অনুবাদও করেছিলেন। ১৮৪৯ সালে 'The Captive Ladie'র দশ বৎসর পরে। তারপর 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'পদ্মাবতী নাটক', 'কৃষ্ণকুমারী', 'মায়া কানন' ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে একটি মন্তব্য করেছেন তারাশংকর, কথাটি প্রণিধানযোগ্য—সেদিন নিজের মাতৃভাষায় নাটক রচনা করতে গিয়ে মধুসূদন অতি-মহার্ঘ নাটকের অজস্র সম্ভারে পরিপূর্ণ ইংরাজী নাটকের দিকে তাকান নাই—এই কথা ভাবলে কিছুটা আশ্চর্য লাগে। সকলেই জানেন ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যেই মধুসূদনের রসিক কবিচিত্ত জন্মলাভ করেছিল এবং তার রস তিনি যেমন করে পান করেছিলেন বিদেশী কেউ কদাচিৎ তেমন করে পান করেছেন। তাঁর চিত্তের মূল স্ফূর্তিই ছিল ইংরাজী ভাষার চর্চায়, ইংরাজী সাহিত্যের আস্বাদনে (ফ্রেঞ্চ, ইতালিয়ান, লাতিনও তিনি বেশ ভালভাবে জানতেন)। এ ছাড়াও ঊনবিংশ শতাব্দীতে নাটক রচনা করবার জন্য,

উপযুক্ত আদর্শ সন্ধানের প্রয়োজনে সেক্সপীয়রের যুগের নাটকের দিকেই তাকানো একান্ত স্বাভাবিক ও বুদ্ধিসঙ্গত ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, মধুসূদন সেদিকে দৃষ্টিপাত না করে তাকিয়েছিলেন সংস্কৃত নাটকের দিকে। এর কারণ কি, আজ তা আবিষ্কার করা একান্ত দুরূহ। তৎকালিক অবস্থা বিবেচনা করে সংস্কৃত নাটকের আদর্শে নাটক রচনা করবার স্বল্প-পরিমাণ শ্রান্তি ও তাঁর চিত্তের অজ্ঞাত কোন গূঢ় প্রবণতার কারণেই ঘটেছিল তা বলা যায় না। তারাশংকরের এই উক্তি নিয়ে কিছু তর্ক আলোচনা সুধীদের মধ্যে হওয়া অসম্ভব নয়। তাঁর রচিত নাটকে ইংরাজী প্রভাব নেই একথা বলা যায় না, বিশেষ করে উপস্থাপিত নাট্য কৌশলে—তিনি কিছুটা ইংরাজী রীতি, কিছুটা সংস্কৃত নাটকের রীতি গ্রহণ করেছেন বলেই মনে হয়। সূত্রধার নেই কিন্তু বিদূষক আছে, indirect reportage আছে। তিনি নিজেই বলেছেন যে সংস্কৃত ভাব কল্পনার আদর্শে মাধুর্যমণ্ডিত ভাষা অতি সুচারু ও ললিত সাধু শব্দের সন্নিবেশে রচিত। সাধারণতঃ এই ধরনের কাব্যময় সাধুভাষা নাটকের সংলাপের উপযুক্ত নয়—একথা সত্য হলেও রবীন্দ্রনাথে এর ব্যতিক্রম দেখেছি, দেখেছি ইবসেনে। অবশ্য সমালোচকরা বলেছেন যে সেখানে musical illusion, scenic illusion-এর সাহায্য নেওয়া হয়েছে। নাটকেরও থাকা চাই "কান্তময় বপু"। কিন্তু নাটকের মূল উদ্দেশ্য কি—ঘটনার আলিম্পন, চরিত্রের বিকাশ, অনুভূতির প্রকাশ না তিনে মিলে একটা নূতন সুষ্ঠু চেতনার পরিবেশ সৃষ্টি? সে চেতনায় গতিময়তা থাকা চাই—গীতি কণ্টকিত দার্শনিক তত্ত্ব নয়, ঠাকুরদা বা কবিশেখরের মত পথ জুড়ে বসে থাকা নয়। আমেরিকার প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের "The use of the Drama" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে গিয়ে একজন সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক বললেন—More vital however than consistency of convention will be the inner quality of dramatic integrity অর্থাৎ নাটকীয় রূপ রীতিনীতির চেয়ে বড় গুণ হচ্ছে নাটকীয় সমগ্রতা ও নিষ্ঠা। মধুসূদনের নাটকে সেই গুণ ছিল এবং তারাশংকর সেই কথাই বলতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাব ও কিছুটা ভাষা ধার করেই বলি—পাঁজি মিলিয়ে মর্ডানের সীমা বা নাটকের বৈচিত্র্য নির্ণয় করা চলে না। এটা কালের কথা যতটা নয়, ততটা ভাবের কথা—আধুনিকতা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে। গভীর জীবনোপলব্ধিই নাটকের মূল অঙ্গ এবং তার জন্য প্রয়োজন একটি utilitarian father ও aesthetic mother-এর মিলন। কিন্তু শরৎচন্দ্র যে কথা বলেছিলেন যে বাহিরের ঘটনা সাজাইয়া গোছাইয়া দেখাইলেই হৃদয়ের গভীরতার পরিমাপ পাওয়া যায় না। নাটকে বহিরঙ্গের চেয়েও অন্তরঙ্গের প্রস্ফুটন আছে। নাটক দৃশ্যকাব্য—অভিনয়ের জন্য এর দাবী প্রথম, চরিত্র ও দৃশ্যসজ্জার মধ্যেই

এর পরিপুষ্টি। নাট্যসংজ্ঞা অনুসারে রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটকই নাটক-পদবাচ্য নয়।

গীতিকণ্টকিত দার্শনিকতত্ত্ব মুখরিত নাটকের মূল উদ্দেশ্য কি—ঘটনার আলিম্পন, না চরিত্রের বিকাশ, না অনুভূতির প্রকাশ না তিনে মিলে একটা সুষ্ঠু চেতনার পরিবেশ সৃষ্টি যাতে থাকবে সংঘাত, সংঘর্ষ পেরিয়ে একটা গতিময়তা— 'Drama' কথাটাই এসেছে গ্রীক শব্দ Dras বা "করা" হতে।

রবীন্দ্রনাথ "কালের যাত্রায় (রথের রশি) লিখলেন—মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ-বন্ধন, দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত সেই বন্ধনই এই রথটানার রশি। সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে, মানবসম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়েছে তাই বর্ণাশ্রমধর্মী ব্রাহ্মণকে পালাতে হলো, বাহুবলে বলীয়ান্ আভিজাত্য ধর্মী ক্ষত্রিয় হার মানলে, বৈশ্যপন্থী ধনপতির দলও হটে গেল—এলো শূদ্ররা। তাদেরই বেহুঁস টানে রথ চললো। নাট্যজগতের ইতিহাসও তাই, কারণ মানবমনের সঙ্গে সমান্তরালেই সে চলে। কুলীনকুলসর্বস্ব থেকে আজকের এবসার্ড নাটক পর্যন্ত সেই ইতিহাসের ধারাই চলছে। মাঝখানে পাঁচটি নাট্যকারের কথা শ্রদ্ধেয় তারাশংকর বলেছেন। যদিও তাঁর বক্তব্য ও মন্তব্যের সঙ্গে প্রত্যেকটি জায়গায় আমাদের সকলের সাহিত্যিক চেতনা ও মানসিক সত্তার মিল আছে তা নয়, তবে তাঁর কথা তাঁরই কথা হয়ে থাক্, আমি বদলাইনি শুধু মুখে সেইগুলির সম্বন্ধে আমার বক্তব্যের ধারা বুঝাইয়া দিয়াছি এবং তারই পরিপোষকরূপে এই প্রস্তাবনার প্রস্তুতি। স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় তারাশংকরের সাথে সাহিত্যিক-সম্বন্ধ ছাড়াও ছিল ভালবাসার, স্নেহের, প্রীতির, শ্রদ্ধার সম্পর্ক, আত্মার আত্মীয়তা। তিনি আমাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার মতই দেখতেন। আমি সাহিত্যিক নই, শুধু সাহিত্যরসরসিক হিসাবেই দূর থেকে তাঁকে প্রণাম জানিয়েছি, কাছে গিয়েছি, পেয়েছি অপার স্নেহ—সেই লাভপুর-বীরভূমের গ্রাম থেকে, বাগবাজারের বাসা থেকে টালায় তাঁর সারস্বত নীড়ে। আর একদিকে শৈলজানন্দ, আর একদিকে সজনীকান্ত থাকছেন। ইতিহাস প্রীতিময়, যতিময়, জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে। দ্রষ্টা হয়েছেন স্রষ্টা—মহাতামসীর মধ্যে মহাশক্তির আভাস পেয়েছেন

যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা বহতি বিধিহুতং যা হবির্যা চ হোত্রী
যে দ্বে কালং বিধত্তঃ শ্রুতিবিষয়গুণা যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম্।

বাক্ আর অর্থ সম্পৃক্ত হয়ে গেলো বাগর্থ প্রতিপত্তয়ে, এলেন তারাশংকর ও তাঁর সমকালীনরা—যেমন যুগে যুগে আসেন সাহিত্যে, শিল্পে, ধর্মে—

আচার্যের দল। আর আমরা অর্বাচীনরা শুনেছি, পড়েছি, মুগ্ধ হয়েছি। ৬৫ পৃষ্ঠায় গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটকের কথা বলতে গিয়ে তারাশংকরের উপমা হচ্ছে বিগতদিনের ক্ষীরের পুতুল ও পুরোপুরি ছানার সন্দেশের। আমরা কি আর ছানার সন্দেশের যুগে আছি, এখন যে ভেজালের যুগ। রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, রবীন্দ্রনাথের হৃদয় হতে স্বদেশী যুগে সংগীতের প্লাবন গংগাধারার মত নেমে এসেছিল, আর দ্বিজেন্দ্রলালের হৃদয় থেকে স্বদেশ-প্রেম তরল উত্তপ্ত লাভা স্রোতের মত নাটকের মূর্তি নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। এর প্রকাশ রাজপুত ইতিহাস-ভিত্তিক তিনখানি নাটক—প্রতাপ সিংহ, দুর্গাদাস, মেবার পতন ১৯০৫-১৯০৮। কিন্তু রবীন্দ্রনাথও সে সময় গোরা লিখতে সুরু করছেন। এই প্রসংগে শ্রদ্ধেয় তারাশংকরবাবু বর্ণিত শিশিরকুমার যখন গোড়ায় গলদের নাট্যরূপ আনতে শান্তিনিকেতনে যান তখন সেটা সকলের বিশেষ মনঃপুত না হওয়ায় কবি তখনি ফালাফালি করে পাণ্ডুলিপি ছিঁড়ে ফেললেন এ গল্পটি তাঁর কাছেই প্রথম শুনি এবং আদ্যোপান্ত নূতন করে রচনা করলেন নাটকটি, এক রাত্রের মধ্যে। নিখুঁত আশ্চর্য বলছেন তারাশংকর। কবি বললেন—গোড়ায় গলদ ছিল, শেষ রক্ষা হল। এর নাম শেষ রক্ষা। শ্রদ্ধেয়া রাধারাণী দেবীর কাছে শুনি যে আর এক অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র মৌলিক নাটক ত লিখলেনই না পাছে তা স্টেজওয়ালাদের অদলবদল করতে বলে তাঁকে দিয়ে তাদের হুকুম তামিল করায় (শরৎচন্দ্র মানুষ এবং শিল্প পৃঃ ১০০)। রবীন্দ্রনাথের যে দুটি নাটক তারাশংকরবাবু আলোচনা করেছেন সে দুটির কাল নিজেই উনি বলেছেন অপসৃত। অথচ রবীন্দ্রনাথের নাট্যসংখ্যা (নৃত্য-নাট্য বাদেও) প্রায় পঞ্চাশ। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের নাট্যশিল্পের পূর্ণ পরিচয় দেবার প্রয়াস তিনি করেন নি এবং স্বল্প বক্তৃতায় তা সম্ভবও নয়। শুধু দুটি নাটকই বেছে নিয়েছেন। এর সামান্য একটু দায়িত্ব আমার আছে। রবীন্দ্রনাথের সকলের সামনে ঐ পাণ্ডুলিপি ছিঁড়ে ফেলার গল্পটি তারাশংকরের নিজের ভাষায় শোনবার ও অপরকে জানাবার লোভ ছিল। যাক্, রবীন্দ্রনাথের কথাতেই শেষ করি যে কথাগুলি তিনি বলেছিলেন শ্রদ্ধেয় শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে সেগুলি তারাশংকর সম্বন্ধেও বলা যায়।

শুধু কথাসাহিত্যের পথে নয়, নাট্যাভিনয়ে, চিত্রাভিনয়ে তাঁব প্রতিভার সংস্রবে আসবার বেদনায় আপন ঔৎসুক্য বেড়ে চলেছে। তিনি বাঙালীর বেদনায় আপন বাণীর স্পর্শ দিয়েছেন। সে বাঙালী যদিও বিশেষ করে রাঢ়দেশের।

সাহিত্যে উপদেষ্টার চেয়ে স্রষ্টার আসন অনেক উচ্চে। চিন্তাশক্তির বিতর্ক নয়, কল্পনাশক্তির পূর্ণ দৃষ্টিই সাহিত্যে শাশ্বত মর্যাদা পেয়ে থাকে।

তারাশংকর সেই স্রষ্টার আসন থেকেই তাঁর পূর্বসূরি পাঁচজন নাট্যকারকে—মধুসূদন-দীনবন্ধু-গিরীশচন্দ্র-দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথকে মাল্যদান করেছেন। কবির কথায়

হৃদয় আমার দিতে যে চায়
কেবল নিতে নয়
বয়ে বয়ে বেড়ায় সে তার
যা কিছু সঞ্চয়।

প্রাক্ কথন্

আপনারা সকলে আমার সম্ভ্রমপূর্ণ নমস্কার গ্রহণ করুন।

প্রায় দেড় শতাব্দী কালের ধারাবাহিক বিবিধ বিদ্যা ও জ্ঞান-চর্চার দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল, বহু বহু জ্ঞান-সাধকের সাধনার দ্বারা পবিত্র, বিদগ্ধ ও পণ্ডিতমণ্ডলী দ্বারা অলংকৃত, এই প্রাচীন ও পবিত্র মন্দিরে প্রবেশ করে এই মহামর্যাদার মঞ্চে দাঁড়িয়ে বার বার মনে হচ্ছে যেন এখানে অনধিকার প্রবেশ করেছি। আজ এই বক্তৃতা-মঞ্চে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে, আমি ভুল আসনে এসে পড়েছি প্রক্ষিপ্তের মত; আমার সত্যকারের আসন এই মঞ্চে বক্তার আসনে নয়; আমার সঠিক আসন শ্রোতৃমণ্ডলীর আসনের শেষ সারিতে। আপনারা এ আমার অতি-বিনয় জ্ঞান করবেন না। কারণ বিদ্যার যে অধিকারে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উজ্জ্বল অঙ্গনে বিদগ্ধ শ্রোতাদের সম্মুখে রেখে এই মঞ্চে দাঁড়ানো যায়, সে অধিকার আমার নাই। তাই আমাকে যখন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাংলা নাটকের উপর বক্তৃতা দেবার জন্য আহ্বান জানালেন তখন বিস্মিত হয়েছিলাম, সঙ্কোচ বোধ হয়েছিল, আবার সেই সঙ্গে লোভও হয়েছিল। সেই লোভের বশেই, যে নিমন্ত্রণ আমার অস্বীকার করা উচিত ছিল, তা গ্রহণ করেছি। কিন্তু সেই সঙ্গে বার বার নিজেকে প্রশ্ন করেছি— এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে বাংলা নাটক সম্পর্কে কিছু বলবার অধিকার ও সম্বল আমার কোথায়?

সেই উত্তরই বার বার নিজের মনে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছি। আজ প্রায় চল্লিশ বৎসরের উপর বাংলা সাহিত্যের সেবা করে আসছি, এই দীর্ঘ কাল সাহিত্যের বিবিধ কর্মের সঙ্গে জড়িত হয়ে রয়েছি, গল্প-উপন্যাসের সঙ্গে কিছু নাটকও রচনা করেছি, সে নাটক কলকাতার সাধারণ নাট্যমঞ্চে অভিনীত হয়েছে। আমার সাহিত্য-কর্মের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জন্যই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাকে এই নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন বলে ধরে নিয়েছি। এবং তাই মনে করেই এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি। সেই কারণে আমার বক্তৃতায় প্রথাগত বিদ্যার ও জ্ঞানের কোন সাক্ষাৎ বা সন্ধান আপনারা পাবেন না, সে কথা পূর্বাহ্নেই আমি সবিনয়ে নিবেদন করে রাখছি।

তবে জীবনে শিল্পবোধ উন্মেষের প্রথম কালেই, প্রথম যৌবনেই নাট্যমঞ্চ, নাটক ও অভিনয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ঘটেছিল। আমার স্বগ্রামের নাট্য-মঞ্চে অভিনয় করেছি, অভিনয়যোগ্য নাটক অভিনয়ের প্রয়োজনে, প্রাণের

আনন্দে পড়েছি। সেইখানেই ক্ষান্ত থাকি নি; একান্ত তরুণ বয়সেই অভিনয় আরম্ভ করার সমসাময়িক কাল থেকেই গোপনে গোপনে নাটক রচনা করবার চেষ্টা করেছি, পরে প্রকাশ্যেই নাট্যকার হবার চেষ্টা করেছি। আমার রচিত নাটক, আমার গ্রামের নাট্যমঞ্চে মহাসমারোহে অভিনীত হয়েছে। সাহিত্যে আমার হাতে খড়ি নাটকের মধ্য দিয়েই।

সেই সব অভিজ্ঞতা নিয়েও সে সব কিছু নেপথ্যে রেখে সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলাম গল্প-উপন্যাস হাতে নিয়ে। পরবর্তী কালে সেই নেপথ্য অভিজ্ঞতা আমাকে নাটক রচনার কাজে সহায়তা করেছিল। সেই অভিজ্ঞতা-টুকু সম্বল করেই আমি আপনাদের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছি। কাজেই এ কথা বলতে পারি, অসঙ্কোচেই বলতে পারি যে আমার নাটক সম্পর্কীয় সমস্ত জ্ঞান আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ, কিন্তু পল্লবগ্রাহী, এবং অগভীর। তবে নাটক ভাল লাগে, আমার দেশের নাটকের মধ্যে বহু নাটকের বহু ভূমিকায় অভিনয় করেছি, এবং নাটক পড়েছি এবং তার রসাস্বাদন করবার চেষ্টা করেছি।

তাই আমার যৎসামান্য প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য থেকে কয়েকজন নাট্যকারকে আমার আলোচনার বিষয় হিসাবে বেছে নিয়েছি। নাটক সাধারণভাবে মূলতঃ অভিনয়ের মাধ্যমে নাট্যমঞ্চের পীঠভূমিতে আস্বাদনের বস্তু; কাজেই নাট্য-মঞ্চের ও অভিনয়ের পটভূমিতেই তার আসল ও সঠিক বিচার। এ কথা মনে রেখেও আমি আমার বক্তব্যের মধ্যে যে ক'জন নাট্যকারকে গ্রহণ করেছি তাঁদের নাটকের সাহিত্য-রসাস্বাদনের আলোচনার মধ্যেই আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রেখেছি। তাঁদের রচনার সাহিত্য-মূল্যের বিচারই আমার মূল আলোচ্য বিষয়।

সকলেই অবগত আছেন ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই যদিও বাংলা নাটকের জন্ম ও যাত্রা শুরু হয়েছে, নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৮৭২ সালে। কিন্তু এই সময়ের মাঝামাঝি সময়ে ১৮৫৯।৬০ সাল থেকে সত্যকারের বাংলা নাটকের জন্ম। ১৮৫৯ সাল থেকে আজ এই ১৯৭১ সালে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের বয়স একশো বারো-তেরো বৎসর এবং এই বৎসরে বাংলা নাট্যমঞ্চের এক শতাব্দী পূর্ণ হতে চলেছে।

এই একশো বছরের কিছু বেশী সময়ের মধ্যে, আমাদের সৌভাগ্যক্রমে খুব কম কৃতী নাট্যকার আবির্ভূত হন নি! এবং সে ইতিহাসও অনুজ্জ্বল নয়। এই এক শতাব্দীতে মাইকেল মধুসূদন, দীনবন্ধু থেকে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত পর্যন্ত যে সব নাট্যকারেরা নাটক রচনা করেছেন তার ইতিহাস আজ আমাদের সমগ্র সাহিত্যের ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল ও বিশিষ্ট অংশ। তাঁদের রচনাকে অবলম্বন করেই বাংলা দেশের নাট্যশালা আত্মপ্রকাশ করেছে,

স্ফূর্তিলাভ করেছে। এই প্রভাবের পরিমাণ এতই প্রবল যে তা মাত্র বাংলা দেশের সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, একান্ত স্বতঃস্ফূর্তের মত তা বাঙালীর সামগ্রিক জীবনের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাঙালী জাতি হিসাবে নাটক ভালবাসেন, অভিনয় ভালবাসেন এবং সে সম্পর্কে তাঁদের অনুরাগ অতি প্রবল। তারই প্রকাশ বাংলা দেশের শহরে, গ্রামে নিয়মিত ও অনিয়মিত অভিনয়-আয়োজনের শতাব্দীব্যাপী ধারাবাহিক প্রচেষ্টার মধ্যে সুপরিস্ফুট। রঙ্গমঞ্চের চৌহদ্দির মধ্যে রঙ্গমঞ্চের সঠিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য যেমন নাটক লেখা হয়েছে, তেমনি নাট্যোৎসাহী মানুষ রঙ্গমঞ্চের চৌহদ্দির থেকে দূরে থেকেও নাটক রচনা করেছেন, সে নাটক অভিনয় করেছেন। সে আয়োজনও বাংলার নাট্য-সাহিত্যকে কম সম্পদ দেয় নি। মহাকবি রবীন্দ্রনাথই তার শ্রেষ্ঠ এবং উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। সে প্রচেষ্টা, একান্ত সুখের কথা, আজও নিঃশেষ হয় নি, বরং তীব্রতর ও ব্যাপকতর হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকের দিনে অসংখ্য সৌখীন আধা-সৌখীন, আধা-ব্যবসায়িক নাটক রচনা ও তার অভিনয়ের মাধ্যমে নাট্য-আন্দোলন বেশ একটি মূর্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। বলা বাহুল্য, সাধারণ নাট্যমঞ্চ নিজের গতিতে আজও অব্যাহত। সেখানেও তার সামগ্রিক কর্মধারায় ছেদ পড়ে নি।

এ কথা এখানে উল্লেখ করতেই হবে যে বাংলার নাটক ও রঙ্গমঞ্চ এই দীর্ঘকাল ধরে বাংলা দেশকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যা দিয়েছে তার পরিমাণ কম নয় এবং তা সবিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ১৮৬০ সালে 'নীল-দর্পণে'র আবির্ভাবের সঙ্গে যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দিয়ে বাংলা নাটকের সূত্রপাত, বাংলা নাটক পরবর্তী কালে সেই ভূমিকায় কম-বেশী অভিনয় করে আপনার কর্তব্য পালন করতে বিরত থাকে নি। স্বদেশী আন্দোলনে ও স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা নাটকের দান বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণীয়। বিভিন্ন সামাজিক কুসংস্কার দূরে করার কাজেও বাংলা নাটক কালে কালে তার কাজ করেছে। নাটক ও রঙ্গমঞ্চ এ দিক দিয়ে বার বার জাতির সদা-জাগ্রত চক্ষু ও সদা-সতর্ক বিবেকের কাজ করেছে। সেই কথা স্মরণ করে বাংলা নাটক ও বাংলা রঙ্গমঞ্চকে সশ্রদ্ধ নমস্কার ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

তবে এ কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে কেবলমাত্র তাৎক্ষণিক প্রয়োজন সিদ্ধ করবার জন্যই বাংলা নাটক রচিত হয় নি। বহুসংখ্যক বাংলা নাটকে মানুষের, সমাজের ও দেশের তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অল্প-বিস্তর সিদ্ধ হয়েছে এ গৌরবের কথা। কিন্তু সেই মুহূর্তের নগদ লাভের কৃতজ্ঞতার শিরোপাই শুধু তার পাওনা নয়। তার মধ্যে নিত্যকালের আনন্দের সামগ্রী বিধৃত— এইটিই সবচেয়ে বড় কথা। আমি সেই দিক থেকে বিবেচনা করেই বাংলার নাট্যকারদের দীর্ঘ, উজ্জ্বল তালিকার মধ্য থেকে গুটি পাঁচেক নাম বেছে

নিয়েছি। বলা বাহুল্য, এই পাঁচজনকেই যে আমি সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলে গণনা করি এমন কথা যেন কেউ মনে না করেন। এই নাম বাছতে আমার ব্যক্তিগত রুচিই আমাকে প্রভাবিত করেছে এ কথা বলাই বাহুল্য। আমি সেই পাঁচজন নাট্যকারের উপর পাঁচটি বক্তৃতা পাঁচ দিনে আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করব। নিত্যকালের সাহিত্যের পটভূমিতেই আমার এ আলোচনা। এ কোন সাহিত্য-বিচারও নয়। আমি তাঁদের নাটক পাঠ করে সে রস আস্বাদন করেছি, আমার সেই রসাস্বাদনের অভিজ্ঞতাই আমি আপনাদেব পুনরায় আস্বাদনের জন্য উপস্থাপিত করব মাত্র। সেই কারণেই আমার বক্তৃতামালার আমি নামকরণ করেছি—'পাঁচজন নাট্যকারের সন্ধানে'। আমাব প্রথম আলোচনার নাট্যকার হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। আজ আমি তাঁকে নিয়েই আলোচনা করছি। ডঃ সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মারফত্‌ বিশ্ব বিদ্যালয়ের বিশেষ অনুরোধে তিনি এই বক্তৃতামালা রচনা করেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে এই বক্তৃতাগুলি তিনি তাঁর জীবদ্দশায় দিতে পারেন নি। ঐগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনক্রমে ডঃ সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (যাঁকে তাঁর জীবিতকালেই ঐ বক্তৃতাগুলি ব্যবস্থাপনা সম্পাদন ও প্রকাশনের মৌখিক সম্মতি দিয়াছিলেন সহৃদয় লেখক মহাশয়) সামান্য অদলবদল করে পাঠ করেন।

পাঁচজন নাট্যকারের সন্ধানে

প্রথম বক্তৃতা

(১) মাইকেল মধুসূদন দত্ত

(১)

বাংলা নাটকের প্রথম আবির্ভাবের কথা মনে হলেই আমার নিজের জীবনের একটি অতি ক্ষুদ্র অথচ অতি অবিস্মরণীয় ঘটনার কথা মনে পড়ে। আমার বয়স তখন নয়-দশ বৎসরের বেশী নয়। সদ্য কিছুকাল পূর্বে পিতৃবিয়োগ হয়েছে। পিতার একান্ত স্নেহের প্রথম সন্তান পিতার স্নেহচ্ছায়া-অপগত হয়ে অনেক সময় একা একা বিষণ্ণ আতুরের মত ঘুরি ফিরি। নিজের অন্তরের সব দুঃখ-বেদনা নিজের অন্তরেই পরিপাক করবার প্রথম কষ্টকর প্রয়াসে তখনও অভ্যস্ত হই নি। সেই সময় একদিন প্রভাতের প্রথম প্রহর; আমাদের বৈঠকখানা-বাড়ীর বিস্তীর্ণ ভগ্নপ্রায়, হতশ্রী বাগানে খেলা করে ফিরছিলাম। নির্জন পল্লীগ্রাম, পথে মানুষের আনাগোনা বিরল, সমস্ত পাড়াটা প্রায় নিঃশব্দ। এমন সময় কানে কিসের দীর্ঘ ধ্বনি ভেসে এসে আঘাত করল। সতর্ক হয়ে শুনতেই বুঝলাম—সুর, গানের সুর ভেসে আসছে। গানের সুতীক্ষ্ম, সুমধুর সুরের কোলে কোলে কোন সঙ্গীত-যন্ত্রের সুর বেজে চলেছে। কেউ গান গাইছে হার্‌মোনিয়াম বাজিয়ে। গানের কথা কিছু বুঝলাম না, কিন্তু গানের সুরে যেন প্রায় পঙ্গুর মত দাঁড়িয়ে রইলাম। এমন সুর, এমন বাজনা তো এর আগে কখনও শুনি নি! পর মুহূর্তেই সেই সুরের উৎস সন্ধান করবার জন্য ছুটে বেরিয়ে গেলাম। সে সঙ্গীতের উৎস সন্ধান করতে বেশী দূর ছুটে যেতে হল না। আমাদের বৈঠকখানার সামনের রাস্তা ধরে একটু এগিয়ে যেতেই বুঝতে পারলাম, আমাদেরই এক আত্মীয়ের রাস্তার ধারের একতলা ঘর থেকে গান ভেসে আসছে। ছুটতে ছুটতে গিয়ে রাস্তার ধারের জানলার দুটো গরাদে দুই হাতে মুঠি করে ধরে, একান্ত আগ্রহাতিশয্যে দুটো গরাদের ফাঁকে মুখ চেপে রেখে গান শুনতে লাগলাম।

আমাদেরই গ্রামের দুটি সতেরো আঠারো বছর বয়সের তরুণ। তাঁদের একজন একটা উঁচু, পায়ের চাপে-বাজানো হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান করছেন, অন্যজন তাঁর পাশে বসে আছেন একখানা কাগজ সামনে রেখে। সাধারণ হারমোনিয়াম দেখেছি, এ সেই রকম, কিন্তু তার থেকে কিছু পৃথক। এর সুর অনেক বেশী মধুর, স্বর অনেক জোরালো। পরে জানলাম, ওকে অর্গান বলে।

সেই অর্গান বাজিয়ে অতি সুকণ্ঠ তরুণ গায়ক গান গাইছেন—'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা'।

মন্ত্রমুগ্ধের মত গানখানি সবটা শুনলাম। মন ভরে গেল বললে সে অভিজ্ঞতার কিছুই প্রকাশ করা হয় না। মনে হল এমনটি আর এর আগে শুনি নি। এমন কথা, এমন ভাব, এমন সুর, তার সঙ্গে এমন বাজনা—এ তো এর আগে কখনও শুনি নি। সব কিছু একান্ত সহজেই মনকে আবিষ্ট করে তুললে, একান্ত নূতন ও অভিনব হওয়া সত্ত্বেও আবিষ্ট করে তুললে। তাকে গ্রহণ করতে এতটুকু কষ্ট হল না, মন বিরোধিতা করল না। বরং মনে হল—এই তো শুনতে চাইছিলাম এতদিন, এরই জন্য তো আমার মন তৃষিত হয়েছিল। দেশ কাকে বলে, দেশাত্মবোধ কি তা না জেনে, না বুঝেও মন সঙ্গে সঙ্গে তাকে গ্রহণ করলে, এতটুকু কুণ্ঠা করল না।

বাংলা নাটকের কথা মনে হলে ঠিক এই কথাটিই মনে হয়। একশো বছরের কিছু আগে যখন বাংলা নাটক ও তার অভিনয় প্রথম আবির্ভূত হয়েছিল তখন তা তৎকালিক সমাজে একান্ত নূতন ও অভিনব হওয়া সত্ত্বেও তাকে একান্ত আপনার বলে গ্রহণ করতে বাঙালীর বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় নি। তাঁরা সাগ্রহে তাকে, তার সকল নূতনত্ব সত্ত্বেও, একান্ত আপনার বলে গ্রহণ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তখনকার বিশিষ্ট বাঙালীরা তাকে যেন প্রত্যুদ্গমন করে নিজেদের সমাজে পরম সমাদরে আহ্বান করে এনেছিলেন।

যে উপমা বাংলা নাটক ও তার অভিনয় সম্পর্কে দিয়েছি, ঠিক সেই উপমাই নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন সম্পর্কে দেওয়া চলে। যদিও তাঁর আগে বাংলায় নাটক লেখা হয়েছে এবং কলকাতার বিশিষ্ট ও ধনী ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে তা মহাসমারোহে অভিনীত হয়েছে, এবং যদিও তাঁর আগে রামনারায়ণ নাটক রচনা করে খ্যাতিলাভ করেছেন, তবু একথা বোধ হয় দ্বিধাহীনভাবে বলা চলে মধুসূদনই আমাদের আধুনিক নাট্য-সাহিত্যের আদি উজ্জ্বল পুরুষ। আমাদের নাট্য-সাহিত্যের সেই আদি পুরুষ মধুসূদনের নাট্য-সাহিত্য আলোচনাই আমার আজকের বক্তব্য বিষয়।

(২)

এ কথা সত্য যে মধুসূদনের আসল ও প্রধান পরিচয় তিনি কবি, আমাদের নবযুগের প্রথম মহাকবি। তাঁরই কাব্যে সর্বপ্রথম নবযুগ সহজ, সুন্দর ও অভ্রান্ত মূর্তি লাভ করেছিল। তাঁরই কাব্যে সর্বপ্রথম নবযুগের মনোধর্মের নবজাতকের ক্রন্দন-ধ্বনি ধ্বনিত হয়েছে। তাঁরই কাব্যে বাঙালীর নবযুগের ধ্যান ও ধারণার নবীন উৎকণ্ঠা সর্বপ্রথম সহজ, সুন্দর ও স্পষ্ট বিগ্রহমূর্তি ধারণ করেছে, নবযুগের নূতন মানুষের নূতন পিপাসা তাঁরই কাব্যে শুধু বাণীরূপ ধারণ করে নি, তার চিন্তা, ভাব ও আবেগ সমস্ত কিছু একসঙ্গে এক মিশ্র পদার্থ হয়ে জীবন্ত প্রাণময় মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে তাঁর কাব্যে।

তিনি মহাকবি বলেই বাঙালীর কাছে পরিচিত ও চিহ্নিত। তাঁর প্রতিভার বৈশিষ্ট্যই হল তাঁর উজ্জ্বল ও দিব্য কাব্যশক্তিতে। কিন্তু তাঁর সাহিত্য-রচনার এক শতাব্দী পরে আজ সহজেই বলতে পারি যে, তাঁর বিশিষ্ট কবি-প্রতিভা তাঁকে অনিবার্যভাবে ও নির্ভুলভাবে শিল্পের ভিন্নতর ক্ষেত্র থেকে কাব্য-রচনার ক্ষেত্রে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও আজ উচ্চারণ করতে পারি যে তিনি যদি আদৌ কবিতা না লিখতেন, তা হলেও নূতন যুগের প্রথম নাট্যকার হিসাবে তাঁর নাম আজও কীর্তিত হত। অবশ্য আমাদের পরম সৌভাগ্য যে নাট্য-রচনাতেই তাঁর শিল্পকীর্তি শেষ হয় নি, নাট্যকর্মে যার আরম্ভ তার সমাপ্তি কাব্য-রচনায়।

কিন্তু এ কথা আজ বাংলা নাটকের পক্ষ থেকে সহর্ষে উচ্চারণ করতে পারি যে নাটক রচনাই তাঁকে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে টেনে এনেছিল। আজ কল্পনা করতে একান্ত বিস্মিত কৌতুক বোধ করি যে মধুসূদনের নাকি বাংলা ভাষার প্রতি প্রথম জীবনে অবজ্ঞার অন্ত ছিল না। আজ মনে হয় এ যেন তাঁর জীবন-দেবতারই দক্ষিণ মুখের কৌতুক। তাই তিনি তাঁর প্রাণের অন্তরালে অবস্থান করে নাটক-রচনার বঁড়শিতে তাঁর ইচ্ছাকে গেঁথে বাংলা সাহিত্যেব সরোবরের মাঝখানে এনে নিক্ষেপ করে নিজের কৌতুকটুকু সম্পন্ন করে অন্তরালে অপেক্ষা করতে লাগলেন পরবর্তী সংঘটনের জন্য। তিনি যা চেয়েছিলেন মধুসূদনের ভাগ্যে তাই ঘটল। তিনি শেষ পর্যন্ত মহাকবির মহিমময় মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করলেন।

একবার মধুসূদনের জীবনের দিকে তাকালেই এর হিসাব মিলবে। মধুসূদনের জীবনকাল সম্পূর্ণ পঞ্চাশ বছরেরও নয়। তিনি মাত্র সাড়ে ঊনপঞ্চাশ বৎসর বেঁচে ছিলেন। জন্ম তাঁর জানুয়ারী ১৮২৪ সালে, তাঁর

জীবনান্ত ঘটেছে ১৮৭৩ সালের জ্বন মাসে। এর মধ্যে তাঁর সাহিত্য-কর্মের জীবন প্রসারিত মাত্র সাড়ে চৌদ্দ বৎসর, ১৮৫৯ জানুয়ারী থেকে মৃত্যুকাল জ্বন ১৮৭৩ পর্যন্ত। তাও মাত্র অঙ্কের হিসাবে, আনুষ্ঠানিকভাবে। তাঁর সত্যকারের সাহিত্য-জীবনের প্রসার মাত্র চার বৎসর, ১৮৫৯ থেকে ১৮৬২ সাল পর্যন্ত। তাঁর প্রায় যাবতীয় সাহিত্য-কর্ম এই কালের মধ্যেই সমাপ্ত হয়েছে। এর পর মাত্র একখানি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে ১৮৬৬ সালে। মধুসূদনের সমস্ত কীর্তি ও খ্যাতি এই অতি স্বল্পকালের কর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত।

পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের উদ্যোগে বেলগাছিয়ার বাগানবাড়ীতে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী' নাটক অভিনয়ের উপলক্ষ্যে ইংরেজ দর্শকদের নাটকাভিনয় উপভোগের অসুবিধা দূর করবার জন্য 'রত্নাবলী' নাটকখানির ইংরাজী অনুবাদের প্রয়োজন হয়। এই অনুবাদের দায়িত্ব দেওয়া হয় মধুসূদনকে। সেই অনুবাদের দায়িত্বের সূত্রে নাটকের মহলার সময় মধুসূদন সেখানে এসেছেন। তাঁর ভাগ্য-দেবতাই বলি আর জীবন-দেবতাই বলি, তিনি এখানে সকলের অজ্ঞাতসারে সেই আশ্চর্য কৌতুকটি সংঘটিত করলেন। বাংলায় নাটক রচনা করার অদম্য ইচ্ছাটি তিনি এইখানে মধুসূদনের অন্তরে সঞ্চারিত করে দিলেন। অভিনয়ের মহলা দেখতে দেখতে প্রতিভাবান, শক্তিগর্ভ, আশ্চর্য কল্পনাধর মধুসূদনের কল্পনা উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিল। তিনি পার্শ্ববর্তী বন্ধু গৌরদাস বসাককে একান্তে বলেছিলেন—'কি দুঃখের কথা যে রাজারা এই বাজে নাটকের জন্য এত টাকা খরচ করছেন! আগে জানলে আমি তোমাদের থিয়েটারের জন্যে উপযুক্ত নাটক লিখে দিতাম।' গৌরদাস মধুসূদনের কথা শুনে হেসেছিলেন। ইংরেজীনবিশ মধুসূদনের এমনি ধরণের বাংলা ভাষা সৃষ্টি করবার কথায় প্যারিচাঁদ মিত্র প্রভৃতিও ইতিপূর্বে একবার এমনিভাবে হেসেছিলেন। মধুসূদনের এই ধরণের উক্তিকে সবাই রহস্যচ্ছলেই গ্রহণ করতেন। গৌরদাস সেদিন হেসে তাঁকে বলেছিলেন—'তুমি কি লিখবে? বিদ্যাসুন্দরের মত আর একটা খেউড় তৈরী করবে তো?' কথাটা সঙ্গে সঙ্গে মধুসূদনের অন্তরে আঘাত করেছিল। বাংলা ভাষায় সত্যিকারের ভাল নাটকের অভাবের কথা তো তাঁর না-জানা ছিল না। তাই বন্ধুর খোঁচা খেয়ে তিনি চুপ করে গিয়েছিলেন। চুপ করবার আগে তিনি শুধু মৃদু স্বরে বলেছিলেন—'আচ্ছা, দেখা যাক।' পরদিনই মধুসূদন এশিয়াটিক সোসাইটির অফিসে গৌরদাসের ঘরে গিয়ে হাজির। তিনি তাঁর কাছ থেকে কয়েকখানা সংস্কৃত ও বাংলা নাটক ধার করে নিয়ে গেলেন। এর পর সপ্তাহ দুয়েক যেতে না যেতে

একখানি নাটকের প্রথম কয়েকটি দৃশ্য লিখে এনে মধুসূদন হাজির করলেন গৌরদাসের কাছে।

এইভাবে মধুসূদনের মাতৃভাষায় প্রথম সাহিত্যসৃষ্টি, প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা' রচিত ও প্রকাশিত হল। প্রকাশিত হল ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের প্রথমে। তার পূর্বেই তিনি রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী' নাটক ইংরাজীতে অনুবাদ করেছেন, এবং তা প্রকাশিতও হয়েছে ১৮৫৮ সালে। এখানে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য যে, যে-কবি তাঁর জীবনারম্ভের কাল থেকে এক ভিন্ন ভাষা, ইংরাজী ভাষাতে নিজের কবিশক্তিকে স্ফূরণের স্বপ্ন দেখতেন, যিনি একদা সেই স্বপ্নকে বাস্তব মূর্তি দিতে গিয়ে ইংরাজীতে কাব্য রচনা করে প্রথম যৌবনে, পঁচিশ বৎসর বয়সে, ১৮৪৯ সালে 'The Captive Ladie' নামে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন, তিনি তাঁর কল্পনা থেকে, যেন কার নির্দেশে, ধীরে ধীরে আত্ম-অজ্ঞাতসারে সরে আসছিলেন। ১৮৫৮ সালে 'রত্নাবলী'র ইংরাজী অনুবাদের পর তাঁরই হাত দিয়ে প্রথম মাতৃভাষায় রচিত নাটক প্রকাশিত হল। প্রকাশিত হল পর বৎসর, ১৮৫৯ সালে। সেই বৎসরই তিনিই আবার 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করলেন। বলতে গেলে এই তাঁর প্রায় শেষ ইংরাজী রচনা। আর যেটুকু বাকী রইল তা ভিন্ন প্রসঙ্গে প্রকাশিতব্য। সব দেখে মনে হয়, মধুসূদন ইংরাজী ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টির স্বপ্ন দেখতেন, যাকে তিনি বাস্তবে রূপ দেবার কম প্রয়াস ও যত্ন করেন নি, সেই সমস্ত প্রয়াস, যত্ন ও কর্ম তাঁর প্রাণময় অস্তিত্বের অঙ্গ থেকে ধীরে ধীরে একটি জীর্ণত্বক নির্মোকের মত তাঁর নিজেরও অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে তাঁর সত্যকারের অস্তিত্বের থেকে একটি পৃথক পদার্থের মত পৃথক ও বিচ্ছিন্ন হয়ে আসছিল। তাই একদা নিজের মাতৃভাষায় সাহিত্য-সৃষ্টি আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রাচীন নির্মোকের মত তাঁর অস্তিত্ব থেকে স্খলিত হয়ে পড়ল। তখন তাঁর অস্তিত্বের নবীন মসৃণ ত্বক দেখা দিয়েছে। তিনি সেই প্রাচীন পরিত্যক্ত স্খলিত নির্মোকের দিকে আর পিছন ফিরে চান নি।

মধুসূদনের জীবনে সাহিত্যসৃষ্টির কাল যত সংক্ষিপ্ত, তাঁর নাটক-রচনার কালও সেই অনুপাতে সংক্ষিপ্ত। বলতে গেলে মাত্র আড়াই কি তিন বৎসর তিনি নাটক রচনা করেছেন। ১৮৫৯ থেকে ১৮৬১ সাল—এই সামান্য সময়ের মধ্যে তিনি মোট পাঁচখানি নাটক রচনা করেছেন। রচনাকালের ধারা-বাহিকতা রক্ষা করে বলতে গেলে বলতে হয়—'শর্মিষ্ঠা নাটক', 'একেই কি বলে সভ্যতা?', 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'পদ্মাবতী নাটক' ও 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'। এর মধ্যে 'একেই কি বলে সভ্যতা?' ও 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ'

ক্ষুদ্র নাটিকা দুটি প্রহসন। এ ছাড়া পরবর্তী কালে, মৃত্যুর কিছু পূর্বে, রোগকাতর ও অর্থাভাবে ক্লিষ্ট মধুসূদন অর্থের প্রয়োজনে আর একখানি নাটক রচনা করেন। সেটি তাঁর মৃত্যুর পরবৎসর ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। সেটির নাম 'মায়াকানন'।

এ কথা আবার উল্লেখ করি যে বঙ্গসাহিত্য সরস্বতী একদা তাঁকে মাতৃ-ভাষায় নাটক রচনার মাধ্যমে বঙ্গসাহিত্যের সিংহদ্বারপথে আবাহন করে নিয়ে এসেছিলেন। তারপর একদা আবার তিনিই তাঁকে পরম সমাদরে ইসারা দিয়ে কাব্যলক্ষ্মীর অন্তঃপুরে আবাহন করে এনেছিলেন। এবং তিনিই তাঁকে পরম সমাদর করে সেই ঐশ্বর্যময় অন্তঃপুরে মহাকবির চিহ্নিত আসনে চিরকালের জন্য স্থাপন করে দিয়েছেন।

আজ আমার বক্তব্যে সেই অন্তঃপুরের কাহিনী নয়, মাত্র সেই সিংহদ্বারে অবস্থিতির ও বিচরণের কাহিনীটুকুর বর্ণনা। সে কাহিনীও কম মহার্ঘ, কম উজ্জ্বল নয়। তার মধ্যেও কিছু বিস্ময়কর অংশ আছে, যা আমরা সচরাচর লক্ষ্য করি না। যা আমরা তাঁর মহৎ ও তুলনাহীন কবিকীর্তির পটভূমিতে সচরাচর অবহেলা করে থাকি।

(৩)

সেদিন নিজের মাতৃভাষায় নাটক রচনা করতে গিয়ে মধুসূদন অতি-মহার্ঘ নাটকের অজস্র সম্ভারে পরিপূর্ণ ইংরাজী নাটকের দিকে তাকান নাই—এই কথা ভাবলে কিছুটা আশ্চর্য লাগে। সকলেই জানেন ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যেই মধুসূদনের রসিক কবিচিত্ত জন্মলাভ করেছিল এবং তার রস তিনি যেমন করে পান করেছিলেন বিদেশী কেউ কদাচিৎ তেমন করে পান করেছে। তাঁর চিত্তের মূল স্ফূর্তিই ছিল ইংরাজী ভাষার চর্চায়, ইংরাজী সাহিত্যের আস্বাদনে। এ ছাড়াও ঊনবিংশ শতাব্দীতে নাটক রচনা করবার জন্য উপযুক্ত আদর্শ সন্ধানের প্রয়োজনে সেক্‌স্‌পীয়রের যুগের নাটকের দিকেই তাকানো একান্ত স্বাভাবিক ও বুদ্ধিসঙ্গত ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, মধুসূদন সে দিকে দৃষ্টিপাত না করে তাকিয়েছিলেন সংস্কৃত নাটকের দিকে। এর কারণ কি, আজ তা আবিষ্কার করা একান্ত দুরূহ। এই দৃষ্টিপাতের ও পক্ষপাতের কারণ তৎকালিক অবস্থা বিবেচনা করে সংস্কৃত নাটকের আদর্শে নাটক রচনা করবার স্বল্প-পরিমাণ ভ্রান্তি, না এ তাঁর চিত্তের আত্ম-অজ্ঞাত কোন গূঢ় প্রবণতার কারণে ঘটেছিল তা বলা যায় না।

যাই হোক, তাঁর প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা নাটক' রচনার প্রথম পদক্ষেপেই,

যখন নাটকটির মাত্র কয়েকটি গর্ভাঙ্ক রচিত হয়েছে তখনই তা সুপ্রচুর উৎসাহ ও উত্তেজনার কারণ হয়ে দাঁড়াল। গৌরদাস নাটকের সামান্য রচিত অংশ পড়ে সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে 'খাঁটি বস্তু'র সন্ধান পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তা জানালেন রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে। একখণ্ড 'Captive Ladie' পাঠিয়ে নাটক রচনার সংবাদ যতীন্দ্রমোহনকে জানাতেই যতীন্দ্রমোহন গৌরদাসকে জানালেন যে তিনি যে কোন দিন সন্ধ্যায় তাঁদের সময়মত তাঁদের দুজনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করবেন।

আজ এই বক্তৃতার মধ্যে এ সব উল্লেখ করবার একমাত্র উদ্দেশ্য হল, আজ এক শতাব্দীর পারে তাঁর নাটককে যখন আমরা নিরাসক্ত, ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি, তার গুণাগুণ বিচার করছি, তখন একই সঙ্গে, সেই নাটকের জন্ম-মুহূর্তে তা যে উত্তপ্ত অভিনন্দন লাভ করেছিল তা থেকেই এ কথা স্পষ্টভাবে অনুমান করা যায় যে সে আবির্ভাব একান্ত ভাবেই নূতন ও অভিনব বলেই গৃহীত হয়েছিল।

সে অভিনবত্ব ও নূতনত্ব অনুভবের কারণ আজ এতকাল পরেও নির্ভুল-ভাবে আমরাও অনুমান করতে পারি। তার কারণ নাটকটির ভাষা ও সংলাপ এবং সামগ্রিক ভাব-কল্পনা। যে শক্তিশালী পুরুষ এই নাটক রচনার সামান্য কাল পরেই বাংলা অমিত্রাক্ষর ছন্দের ভাব-গম্ভীর মৃদঙ্গধ্বনি সৃষ্টি করবেন এ ভাষা সেই শক্তিশালী পুরুষের অসামান্য শক্তির স্পর্শ বহন করেই প্রকাশিত। সংস্কৃত ভাব-কল্পনার আদর্শে মাধুর্যমণ্ডিত ভাষা অতি সুচারু ও ললিত সাধু শব্দের সন্নিবেশে রচিত। সাধারণত এই ধরণের কাব্যময় সাধু ভাষা নাটকের সংলাপের উপযুক্ত নয়। কিন্তু নাটকের সংলাপের উপযুক্ত এমন একটি সুন্দর ও স্বচ্ছন্দ কথ্যরীতি মধুসূদনের আয়ত্তে ছিল যা এই কাব্যময় সাধুরীতির সঙ্গে যুক্ত করে ভাষাকে সমগ্রভাবে নাটকের সংলাপের উপযুক্ত এক ভারহীন লঘুচ্ছন্দ বৈচিত্র্যে মণ্ডিত করতে পেরেছিল।

'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র সুপরিচিত কাহিনী মহাভারত থেকেই গৃহীত। মহাভারতের এই কাহিনী বিশেষ স্থান ও কালের স্পষ্ট চিহ্নে চিহ্নিত হয়ে মহাভারতের মধ্যে সগৌরবে বিরাজ করছে। কিন্তু মধুসূদন যখন এই কাহিনীকে নাটকে গ্রহণ করলেন তখন তাঁর হাতের স্পর্শে তা স্থান-কাল-বিরহিত এক মূর্তি গ্রহণ করল। এ ভাল হয়েছে কি মন্দ হয়েছে এ কথা এখানে আলোচ্য বিষয় নয়। চিরকালের মধ্যে এ কাহিনীর বসতি স্থাপন করলেন তিনি। আর তার স্থান যেন মর্ত্যেও নয়, স্বর্গেও নয়; স্বর্গ-মর্ত্যের মাঝখানে এক সৌন্দর্যলোকে তার অবস্থান। তার ফলে তাতে এক অসামান্য সৌন্দর্য ও লাবণ্য সঞ্চারিত। এ স্থানে স্থানে এমন সুষমা ও

সৌন্দর্যের আধার হয়ে দাঁড়িয়েছে যে তাতে কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-এর মারীচের আশ্রম-দৃশ্যের সুষমা বা মহাকবি রবীন্দ্রনাথের একান্ত পরিণত বয়সের সৃষ্টি নৃত্যনাট্যগুলির মধ্যে যে সুষমা ও সৌন্দর্য, তার সমধর্মী আস্বাদ পাওয়া যায়।

চরিত্রের মধ্যে তিনটি মূল চরিত্রের উপরই নাট্যকার স্বাভাবিক ভাবেই জোর দিয়েছেন। এক নায়ক, দুই নায়িকা। রাজা যযাতি এবং শর্মিষ্ঠা এবং দেবযানী। এইখানে এ কথা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য যে মধুসূদন প্রথম শ্রেণীর প্রতিভার উপযুক্তভাবেই ধ্রুব মানবিক প্রবৃত্তিগুলির উপরই নাটক উপস্থাপন করেছেন। কাম, ক্রোধ, ঈর্ষা প্রভৃতি মৌল জীবনাবেগ নিয়েই কারবার তাঁর এই নাটকে। তাই যে কামপ্রবণতা ও নারীলুব্ধতা অবসর ও ঐশ্বর্যের অবকাশে পুরুষের চিত্তে জাগ্রত হয় ও পরিতৃপ্তি খোঁজে, নাট্যকার রাজা যযাতির মধ্যে তা পূর্ণ পরিমাণে সন্নিবেশ করেছেন। তাই শাপগ্রস্ত রাজার অন্তরের হাহাকার নাটকের শেষাংশে অতি সত্যভাবে ধ্বনিত হয়েছে। অন্য দিকে শুক্রাচার্যের আদরের দুলালী, একান্তভাবে আত্মপরায়ণ, দম্ভী ব্রাহ্মণ-কন্যা দেবযানীর সমগ্র চরিত্র মূলত ক্রোধের রক্তবর্ণে রঞ্জিত। এই চরিত্রের জীবনের প্রথম পুরুষ দর্শনের ফলে যে তীব্র পূর্বরাগ তাও এই কন্যার ক্রোধময় চরিত্রের রক্তবর্ণভূমিকে একটি স্বর্ণবর্ণ জরির পাড়ের মত সুন্দর ও সুশোভিত করেছে। আর দৈত্যরাজকন্যা শর্মিষ্ঠা! বিপুল অপমান ও বেদনার নীরব সহ্যশক্তিতে, সর্বাঙ্গীণ বিবেচনার শান্ত বুদ্ধিতে মহীয়সী। কিন্তু হলে কি হয়? সেও তো নারী! দেবযানীর সৌভাগ্যের ঈর্ষাই তাকে ঈর্ষিত করে তুলে রাজা যযাতির দিকে তার দৃষ্টিকে নিবন্ধ করে দিয়েছে।

এই মানুষগুলি যেমন চিরকালের মানুষ, যে সব হৃদয়াবেগ তাদের তাড়িত করেছে তাও যেমন সনাতন, তেমনি আবার এগুলি একান্তভাবে নিজের যুগের বিশেষ লক্ষণের দ্বারা লক্ষণাক্রান্ত। যে নবীন কালের চেতনা বিগত কালের চিন্তা-সম্ভূত আত্মার উপরে দেহ ও দেহাধিষ্ঠিত প্রাণমনকে স্থান দিয়েছিল ও স্থাপন করেছিল সেই যুগ-চেতনাই দেহের আধারে ধৃত প্রাণ ও মনের অমর আকাঙ্ক্ষাগুলিকেই এই সনাতন ভারতীয় চরিত্রগুলির আধারে প্রকাশ করে নিজের প্রাণের উৎকণ্ঠাকে পরিতৃপ্ত করেছে।

এই সব গুণের জন্যই ১৮৫৯ সালে ৩রা সেপ্টেম্বর বেলগাছিয়া নাট্যশালায় 'শর্মিষ্ঠা নাটক'-এর অভিনয় বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছিল। এই অভিনয়ের বেশ কিছুকাল পরে মধুসূদন বন্ধু রাজনারায়ণকে এই অভিনয় সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে আবেগ সম্বরণ করতে পারেন নি। অভিনয় শেষ হবার পর বন্ধুবান্ধব ও গুণগ্রাহীদের সুবিপুল ও সহর্ষ অভিনন্দনের

কথা তিনি বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন। এখানে এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে মধুসূদন আরও চারখানি নাটক রচনা করেছিলেন; কিন্তু তাঁর জীবিতকালে আর কোনটির অভিনয় হয় নি।

কিন্তু এহ বাহ্য। মধুসূদনের প্রথম নাটকে অভিনবত্ব ও সৌন্দর্য কম নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও বলতে হবে নাটকের ত্রুটির পরিমাণও কম নয়। সবচেয়ে প্রধান ত্রুটি ঘটনার অভাব। অথচ নাটকের বিষয়বস্তু রচনা করবার সময় তিনি মহাভারত থেকে একটি অত্যন্ত উজ্জ্বল নাটকীয় অংশ বেছে নিয়েছিলেন। এ সত্ত্বেও নাটকীয়তার বিশেষ অভাব নাটকখানিতে। দেবযানীকে শর্মিষ্ঠা কূপগর্ভে নিক্ষেপ করা থেকে যযাতির পুনরায় যৌবনলাভ পর্যন্ত নাটকের কাহিনী বিস্তৃত। অথচ এই বিশেষ নাটকীয়তাপূর্ণ কাহিনী যখন 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র মধ্য দিয়ে পরিবেশিত হল তখন তার নাটকীয়তা বহুলাংশে বিদূরিত হয়েছে। যা প্রত্যক্ষভাবে নাটকে ঘটনার মাধ্যমে দেখাতে পারলে আশ্চর্য নাটকীয়তা সৃষ্টি হতে পারত তার অধিকাংশটুকুই মঞ্চে প্রত্যক্ষভাবে দেখানো হয় নি। অধিকাংশ ঘটনাই বিবৃত করা হয়েছে কোন না কোন পাত্র-পাত্রীর মুখ দিয়ে। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে সব পাত্র-পাত্রী নাটকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কুশীলব। যা ঘটনায় প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পেলে দর্শকরা মন্ত্রমুগ্ধ হতে পারত তারই পরোক্ষ বিবৃতি শুনে দর্শক দেখার কিছু পায় না; শ্রোতা কাব্যময়, ললিত, চঞ্চল-মন্থর ভাষায় যতটা বিমুগ্ধ হয়, লাভ ততটুকুই। মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ বিবৃতিতে শ্রোতাও ক্লান্ত হয়। এর উপরে আছে দীর্ঘ স্বগতোক্তি। তাও তাদের ভাষার মাধুর্য সত্ত্বেও শ্রোতাকে অনিবার্যভাবে ক্লান্ত করে।

এই ত্রুটির কারণ সংস্কৃত নাটকের আদর্শে নাটক রচনার চেষ্টায়। সংস্কৃত নাটককে অলঙ্কার শাস্ত্রের শাসন মেনে চলতে গিয়ে বার বার খণ্ডিত ও খর্ব হতে হয়েছে। তার ফলে সংস্কৃত নাটক তাদের বহু উৎকর্ষ ও উৎকৃষ্ট কাব্যময়তা সত্ত্বেও বহু স্থলে নিষ্প্রাণ হয়েছে। প্রথাগত ও অনুষ্ঠানগত ভাব ও ভাবনা সেখানে জীবনকে ও চরিত্রকে বহু স্থলে পাষাণ প্রতিমার মত স্থাণু করে রেখেছে। এ ছাড়া বহু চরিত্র সেখানে দেখা যায় যাদের নাম-উচ্চারণ মাত্রেই দর্শক বুঝতে পারেন এদের চরিত্র কেমন হবে, এরা নাটকে কোন্ কর্ম সম্পন্ন করতে এসেছে। সংস্কৃত নাটকের আদর্শ অনুসরণ করতে গিয়ে নবীন কালের নাট্যকার হয়েও মধুসূদন এই সব ত্রুটিগুলিকে এড়াতে পারেন নি। তাঁর নাটকের মন্ত্রীও সংস্কৃত নাটকের রাজমন্ত্রীর মত কর্মব্যস্ত, সদাচঞ্চল ও বর্ণহীন; তাঁর বিদূষক সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের মত সমান ঔদরিক ও স্থানবিশেষে রাজবয়স্যের কর্ম করতে গিয়ে স্থূল রসিকতার আশ্রয় গ্রহণ

করে। সংস্কৃত নাটকের আদর্শে রচিত বলেই নাটকখানি মিলনান্তক, শর্মিষ্ঠার শাপমোচনে তার সমাপ্তি।

অনেক ত্রুটি সত্ত্বেও 'শর্মিষ্ঠা নাটক' বাংলা সাহিত্যের নবযুগের প্রথম নাটক, যা নবযুগের প্রথম শিল্পীর হাতের রচনা এবং যা নবযুগের ভাব-তৃষ্ণাকে প্রথম শিল্পরূপ দান করেছে।

(৪)

'শর্মিষ্ঠা নাটক' রচনার পর মধুসূদন দুখানি ছোট প্রহসন রচনা করেন। সেই প্রহসন দুটির বিষয় পৃথকভাবে আলোচ্য বলে এখানে এখনি আলোচনা করছি না। তারপর তিনি রচনা করলেন 'পদ্মাবতী নাটক'। 'শর্মিষ্ঠা নাটক' রচনা থেকে 'পদ্মাবতী নাটক' রচনার ব্যবধান এক বৎসর কয়েক মাসের। এ নাটকখানিও 'শর্মিষ্ঠা নাটক'-এর ধাঁচে তৈরী। সেই সংস্কৃত নাটকের আদর্শ অনুসরণ করেই এর রচনা।

কাজেই 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র প্রায় সব দোষগুণই অল্প-বিস্তর এই নাটকখানিতেও বর্তমান। তবে প্রথম নাটক রচনার অভিজ্ঞতা তাঁকে বেশ খানিকটা অভিজ্ঞ করে তুলেছিল। তার সুফল সবই এ নাটকে কিছু কিছু আছে। তবে অন্য দিকে নাটকটির একটি খামতি ঘটেছে। ত্রুটি রয়েছে এর কাহিনীতে। যতদূর মনে হয় এ কাহিনী মধুসূদন নিজেই রচনা করে নিয়েছিলেন। নাটকের প্রথমাংশে বিদেশী পুরাণের ছায়া রয়েছে। সে কথা তিনিও ক্ষেত্রান্তরে স্বীকার করেছেন। স্বর্গের শ্রেষ্ঠ তিন প্রবলপ্রতাপান্বিতা সুন্দরীর সম্মুখে একটি দুর্লভ স্বর্ণপদ্ম স্থাপন করে কোন্দলের দেবতা নারদ বলে গেলেন—'এ স্বর্ণপদ্ম শ্রেষ্ঠা সুন্দরীর প্রাপ্য।' যেহেতু তাঁরা স্বর্গলোকের শ্রেষ্ঠ প্রতাপান্বিতা দেবী, সেই কারণেই এ তাঁদেরই কারও প্রাপ্য বলে এর বিচারের জন্য তাঁরা দ্বারস্থ হলেন নিকটেই মৃগয়ারত বিদর্ভরাজ ইন্দ্রনীলের কাছে। ইন্দ্রনীল স্বর্ণপদ্মটি তুলে দিলেন রতি দেবীর হাতে। রতি দেবীর ইচ্ছায় মর্ত্যলোকের শ্রেষ্ঠা রূপসী রাজকন্যা পদ্মাবতীর সঙ্গে ইন্দ্রনীলের বিবাহ হল। কিন্তু অন্য দুই দেবী—শচী দেবী আর মুরজা দেবী তাঁদের শত্রু হয়ে দাঁড়ালেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা দুজনে কলির সাহায্য প্রার্থনা করায় কলি এই সুখী দম্পতির বিচ্ছেদ ঘটিয়ে তাদের ক্ষতি সাধনে এগিয়ে এলেন। তারপর এই মর্ত্য-দম্পতিটির জীবনে দুঃখ ও বিচ্ছেদ নেমে এল। শেষে পার্বতীর ইচ্ছায় এই মর্ত্য-দম্পতির শত্রুরা শত্রুতা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

সম্পূর্ণ কাল্পনিক কাহিনী। এখানে পাত্র-পাত্রীর সুখ-দুঃখ যেন অবাস্তব বলে মনে হয়। এখানে কাম নাই, অতি মৃদু প্রেম আছে দূরাগত ধূপগন্ধের মত। নাটকের সমস্যাও অবাস্তব, তার সমাধানও সমান বাস্তবতার স্পর্শহীন। জীবনের কোন মৌল আবেগ এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। মনোভাবগুলিও মৃদু, তারা সত্যমূর্তি লাভ করে নি। সত্যকারের কোন দুঃখ-বেদনা বা কোন সমস্যা নাটকখানিতে অনুপস্থিত হওয়ার জন্য কোন সত্যকার সমাধানও নাই। দুঃখ এখানে দেবতার বিবেচনাহীন অভিশাপের মত এসেছে জীবনের বাইরে থেকে, এবং একদা আপনিই দূর হয়েছে। এ যেন আকাশে একদা মেঘ করে অন্ধকার ঘনিয়ে এল, আবার একদা অপসারিত হয়ে গেল। সব সুখ-দুঃখ এখানে বাইরে থেকে যেন প্রায় অকারণেই নর-নারীর জীবনে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে, আবার একদা অকারণেই অপসারিত হয়েছে। পাত্র-পাত্রর জীবন থেকে কোন কিছু জন্মলাভ করে নি। সমস্ত ব্যাপারটাই যেন কাল্পনিক। তার ফলে পাত্র-পাত্রীর সুখ-দুঃখ যেমন সত্যমূর্তি লাভ করে নি, তেমনি একটি চরিত্রকেও স্পষ্ট আকারে চেনা যায় না, বুঝা যায় না। এর উপরে চিরাচরিত বিদূষক এখানে চিরাচরিত মূর্তিতে আবির্ভূত হয়ে চিরাচরিত প্রথায় চিরাচরিত ঔদরিকতা প্রকাশ করেছে।

এ সব সত্ত্বেও এমন কিছু গুণ 'পদ্মাবতী নাটকে' আছে যা মধুসূদনের এর পূর্বের সৃষ্টি 'শর্মিষ্ঠা নাটকে' দেখা যায় নি। এর কাহিনীর প্রকৃতি যেমনই হোক, এখানে নাটকের কাহিনী অপেক্ষাকৃত সুবিন্যস্ত, এবং নাটকীয় ঘটনার মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে প্রকটিত। সংলাপ এখানে প্রায়শই, এক বিদূষকের ক্ষেত্র ছাড়া, হ্রস্ব ও সংক্ষিপ্ত, যার ফলে সংলাপ অনেক বেশী জোরালো হয়ে দেখা দিয়েছে।

এই নাটকটি সম্পর্কে যেটি সর্বশেষ কথা, সেটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। আমাদিকে সে কথা চিরকাল স্মরণ রাখতে হবে। এই 'পদ্মাবতী নাটকে'ই মধুসূদন সর্বপ্রথম কয়েক স্থানে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার করেন। তিন স্থানে, একবার কঞ্চুকীর মুখে, আর দুবার কলির মুখে অমিত্রাক্ষর ছন্দে নাটকীয় ভাব প্রকাশ করেছেন মধুসূদন। সে ঠিক সংলাপের মূর্তিতে আসে নি, একবার নাতিদীর্ঘ আবৃত্তিতেই তার সমাপ্তি ঘটেছে। এইখানে যার সূত্রপাত, বাংলা নাটক পরবর্তীকালে তাকেই বার বার বহু বিভিন্ন ভঙ্গিতে ব্যবহার করে ক্ষেত্রবিশেষে আশ্চর্য নাটকীয় মহিমা অর্জন করেছে। সে মহিমা ও গাম্ভীর্য কিছুতেই সাধারণ গদ্য বা ছন্দোবন্ধ পয়ারের ব্যবহারে অর্জন করা যেত না।

(৫)

এর পর মধুসূদন 'ব্রজাঙ্গনা' রচনার সঙ্গে সঙ্গে রচনা করেন 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'। 'কৃষ্ণকুমারী' মধুসূদনের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক এবং বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য বিয়োগান্ত নাটক। আজ এ কথা নিষ্ঠুর পরিহাসের মত শুনাবে যে মধুসূদন যখন সত্যকার নাটক রচনা করবার শক্তি আবিষ্কার করলেন ও সত্যকার নাটক রচনা করবার ক্ষেত্র খুঁজে পেলেন, প্রায় তখনই তিনি নাটক রচনা পরিত্যাগ করে কাব্যলক্ষ্মীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন কবির মূর্তিতে। বাংলা নাটক আর তাঁর অসামান্য করস্পর্শ লাভ করে নি।

এই ঘটনার প্রায় এক যুগ পর, তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে, অর্থাভাবে তিনি আরও একখানি নাটক রচনা করেছিলেন। সে নাটকখানির নাম 'মায়াকানন'। নাটকখানি তাঁর মৃত্যুর পর বৎসর পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এই নাটকখানির আনুষ্ঠানিক অস্তিত্ব সত্ত্বেও আমি তাঁর 'কৃষ্ণকুমারী'কেই তাঁর সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক বলে অভিহিত করছি।

'পদ্মাবতী' নাটকখানি প্রকাশিত হবার পর বন্ধু রাজনারায়ণকে তাঁর অভিমত জানতে যে পত্র তিনি লিখেছিলেন তাতে দুটি উল্লেখযোগ্য কথা লিখেছিলেন। 'পদ্মাবতী নাটকে' যৎসামান্য অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করার পর তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে আমাদের দেশে নাটক অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত হওয়া উচিত। তাঁর দ্বিতীয় অভিমত হল—আর যদি তাঁকে নাটক লিখতে হয় তা হলে তিনি সাহিত্য-দর্পণকার শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথের নির্দেশ আর মানবেন না; নাটকের আদর্শের জন্য অতঃপর তিনি ইউরোপের মহৎ নাট্যকারদের দ্বারস্থ হবেন।

'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রচনার সময় নটরাজ কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে যে পত্র লিখেছিলেন তার মধ্যেও এই ধরণের অভিমত আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছিলেন। ইউরোপের মহৎ নাটকগুলিতে জীবনের সুকঠিন বাস্তব সত্য, এবং অতি উচ্চ কোটির আবেগ ও বীর্যবত্তার সাক্ষাৎ মেলে। কিন্তু আমাদের নাটকে সবটাই কোমলতা আর স্বপ্নালুতা। আমরা বাস্তব সত্যের কথা বাস্তব পৃথিবীর কথা ভুলে যাই, কেবল পরীর দেশের স্বপ্ন দেখি। আমাদের দেশে সত্যকার নাটকীয় প্রতিভা এখনও যৎসামান্যও স্ফূর্তিলাভ করে নি। 'শর্মিষ্ঠা নাটকে' আমি কাব্যের পথ পরিত্যাগ করে নাট্যকারের পথ ধরেছি। কাব্যময়তার সন্ধান করতে গিয়ে আমি অধিকাংশ সময় বাস্তবকে বিস্মৃত হই। আমি এখন যে নাটকখানি লিখছি সেটি রচনার সময় আমি নিজের উপর সর্বদা কড়া নজর রেখেছি যাতে কাব্যের পথে গিয়ে আমি পথভ্রষ্ট না হই।

সেই নাটক হল 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'। আশ্চর্যের কথা, মধুসূদন নিজের কর্মের অতি নিখুঁত সমালোচনা নিজেই করে গিয়েছেন। কাজেই 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে' তিনি যা করতে চেয়েছেন তাই-ই করতে পেরেছেন।

নাট্যাদর্শের মুখ ফেরানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি সত্যকার নাটকের সঠিক ভূমি পেয়ে গেলেন। আর মহাভারত কি পুরাণ কি অমনি ধরণের কাল্পনিক কি পৌরাণিক কাহিনী নয়, যদিও তাঁর কবিচিত্তের রুচি ও প্রবণতা সব সময় তাঁকে অমনি ধারার কাহিনী ও কথার দিকে ঠেলত, যেখানে কাব্যশক্তিকে, কাব্যে সুষমা ও লালিত্যকে প্রকাশের অধিকতর অবকাশ ঘটে। শেষ জীবনে অর্থের প্রয়োজনে যখন হৃতস্বাস্থ্য, ক্ষয়িতশক্তি মধুসূদন মনোভঙ্গের মধ্যে আবার নাটক রচনায় হাত দিয়েছেন তখন আবার কল্পিত কাহিনীকেই স্বাভাবিকভাবে স্পর্শ করেছেন। তারই ফল 'মায়াকানন'।

নাট্যাদর্শের সঠিক ভূমি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত কাহিনী মিলতেও বিলম্ব হল না। টডের রাজস্থান থেকে কাহিনী সংগৃহীত হল। এ কাহিনী পুরাণকথার কল্পলোকবাসী মানুষের কল্পিত কাহিনী নয়। এ মানব-ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল ও উত্তপ্ত অধ্যায় থেকে সংগৃহীত—এ সেই সব মানুষের কথা, যারা একান্তভাবে বাস্তব, যারা একদা আমাদেরই মত জীবনের সুখ-দুঃখকে আস্বাদ করেছিল, নিজেদের কর্মবিপাকে নিজের ও অপরের জীবনে যন্ত্রণা ও দুঃখকে টেনে এনেছিল। এখানে সুখ-দুঃখ বাইরে থেকে প্রক্ষিপ্ত পদার্থ নয়; কাছের ও দূরের মানুষ, যাদের সঙ্গে অন্য মানুষের ভাগ্য কোন না কোন ভাবে জড়িয়ে গিয়েছে, তাদেরই সমবেত কর্মের কার্য-কারণের জটিল অঙ্কের যোগফলে মানুষের জীবনে সুখ-দুঃখ অনিবার্য নিয়তির আকারে নেমে আসছে। 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' সেই তপ্তরক্ত মানুষের হৃদয়বেদনার কাহিনী।

'কৃষ্ণকুমারী নাটক' একখানি সত্যকারের বিয়োগান্ত নাটক। নাটকের প্রথমারম্ভ থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত একটি অনুজ্জ্বল বিবর্ণতা ও বিষণ্ণতার ছায়া সমস্ত নাটকখানির উপর এক বিবর্ণ যবনিকার মত দুলছে। নাটক সমাপ্তির মুখে পঞ্চম অঙ্কে এই বিবর্ণ বিষণ্ণতা এক ব্যথিত ভয়াবহতায় রূপান্তরিত হয়ে সেই বিবর্ণতাকে কৃষ্ণতায় পরিণত করেছে। নাটকের মধ্যে কোথাও আনন্দের চিহ্নমাত্র নাই। এমন কি শুভ্র, সবল, কোমল কৃষ্ণকুমারীর মানসিংহের জন্য প্রেমের পূর্বরাগের দৃশ্যেও দর্শকের হৃদয়ে আনন্দের স্পর্শ লাগে না। বরং দর্শক অনুভব করেন কৃষ্ণকুমারীর জন্য এক আশ্চর্য, অসহায় মমতা। দর্শক বুঝতে পারেন এই নায়িকা কন্যাটির আশ্চর্য শুভ্র এই অনুরাগ, এ তো চরিতার্থ হবে না; এর অন্তরালে যে এক জটিল ছলনার

জাল পাতা রয়েছে: সরল কৃষ্ণকুমারী সেই ফাঁদে পা দিয়ে বিপদে পড়তে চলেছেন।

নাটকে এমন একটি মানুষের সাহচর্য পাই না যার সঙ্গ লাভ করে একবার মনে হয়—আঃ, খানিকক্ষণ শান্তি, তৃপ্তি ও স্বস্তি পাওয়া গেল। এর অর্থ এই নয় যে নাটকের সমস্ত চরিত্রগুলিই প্রচলিত অর্থে খারাপ মানুষ। না, তা অবশ্যই নয়। নাটকে বিয়োগান্ত পরিবেশ রচনার এমনিই কৃতিত্ব যে কোন পাত্র-পাত্রীর দীর্ঘ সান্নিধ্য স্বস্তি ও পরিতৃপ্তি দেয় না। প্রচলিত অর্থে সংসারে যেমন ভাল ও মন্দ দুরকমেরই মানুষ প্রায় সমান সংখ্যায় ছড়িয়ে আছে এ নাটকেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। রাজা জয়সিংহ, ধনদাসের মত 'খারাপ' মানুষও যেমন আছে, ভীমসিংহ, বলেন্দ্রসিংহের মত 'ভাল' মানুষও তেমনি রয়েছে নাটকে। কিন্তু ভীমসিংহের চরিত্রের সৌন্দর্য তাঁর অক্ষমতায় ও হাহাকারে ম্রিয়মাণ, বলেন্দ্রসিংহের বীর্যবত্তা বিয়োগান্ত মর্মান্তিকতায় কাতর। তা ছাড়া ছলনা, শঠতা, অর্থ-লালসা, নারী-লালসা এই বাস্তব পৃথিবীতে যেমন থাকে তেমনি পরিমাণে আছেই। তাই চরিত্রগুলি সকলেই বিয়োগান্ত বেদনার লক্ষণাক্রান্ত: সে যে ছলনা ও চক্রান্ত করছে সেও যেমন, যার বিরুদ্ধে ছলনা ও চক্রান্তের জাল পাতা হচ্ছে সেও তেমন। এই নাটকে, সব পাত্র-পাত্রীই, যে যেখানেই অবস্থান করুক, সকলেই একটি বিবর্ণ, বিষণ্ণ পৃথিবীর হতাশার ও দুর্ভাগ্যের অংশীদার। সে দিক দিয়ে বিয়োগান্ত নাটকরূপে 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র গৌরব অসামান্য। অথচ প্রতিটি চরিত্র একান্তভাবে সজীব, আমাদেরই মত জীবন্ত।

কাহিনী-বিন্যাসেও এই নাটকের অসাধারণ সাফল্য। ঘন-সন্নিবদ্ধ নাটকীয় কাহিনী অতি চমৎকার নাটকীয় বিন্যাসে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত। নাটকীয় ঘটনার বীজ নাটকারম্ভের প্রথমেই উপ্ত হয়েছে। রাজ-বয়স্য ও রাজ-সভাসদ দুষ্টবুদ্ধি ধনদাসের লম্পট রাজা জয়সিংহ বা জগৎসিংহের নিকট কৃষ্ণকুমারীর পটপ্রদর্শন দিয়ে তার আরম্ভ। তারপর নাটকের বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর স্বার্থে স্বার্থে সংঘাতের পথে সেই কাহিনীর বিস্তার। এই সমস্ত চক্রান্তের বলি হয়ে যে দাঁড়াল তার মত সরল, সুষমাময়, সুন্দর, কোমল জীব আর কল্পনাই করা যায় না। তার নাম কৃষ্ণকুমারী। জীবনের নানা কুটিল ও জটিল অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞা, চতুরা মদনিকা, তার সখী রাজা জয়সিংহের আশ্রিতা বারবনিতা বিলাসবতীর কল্যাণ-কামনায় নিজের চাতুর্য প্রয়োগ করে সরলা কৃষ্ণকুমারীর সুকুমার অপাপবিদ্ধ মনটিকে মরুদেশের রাজা মানসিংহের প্রতি অনুরক্ত করে তুললে। অদেখা প্রেমিকের প্রতি পূর্বরাগে কৃষ্ণকুমারীর কোমল মনটি যখন আতুর ও উন্মুখ তখন নিজের ঈপ্সিত দুষ্ট

কর্ম সম্পাদন করে মদনিকা অন্তর্হিত। এই পটভূমিতে মরুদেশের রাজা মানসিংহ এবং জয়পুরের রাজা জয়সিংহ কৃষ্ণকুমারী কৃষ্ণার পাণিগ্রহণের জন্য যুদ্ধোদ্যত। রাজা ভীমসিংহ এবং রাণী অহল্যার সমর্থন যখন কৃষ্ণার পাণি প্রথম প্রার্থনা করায় রাজা জয়সিংহের পক্ষে, তখন একান্ত সঙ্গোপনে কৃষ্ণার অনুরাগবিদ্ধ মন রাজা মানসিংহের পক্ষে। দ্বন্দ্ব অনেক, যন্ত্রণা বহুবিধ। এই পটভূমিকায় হতাশ, অকর্মণ্য, সাহসহীন রাজা ও পিতা ভীমসিংহের হাতে কৃষ্ণার অপসারণ ছাড়া আর কোন্ সমাধান ছিল? সেই সমাধানের পথই বেছে নিলেন ভীমসিংহ। ভ্রাতা বলেন্দ্রসিংহকে ঘাতক নিযুক্ত করা হল। অবস্থা জানতে পেরে অসহায় ব্যথিত কৃষ্ণকুমারী নিজের হাতে আত্মহত্যা করে নিজের অভিমানী ও দ্বিধাগ্রস্ত হৃদয়ের দ্বিধা ও জ্বালা নির্বাপিত করলেন, নির্বাপিত করলেন অশান্তির আগুন।

নবযুগের একেবারে প্রথম দিকের যে দু-একখানি নাটকে কল্পনাবিলাস পরিত্যাগ করে একান্তভাবে বাস্তবতার পীঠভূমির উপর দাঁড়িয়ে নাটকের কাহিনী রচনা করা হয়েছে মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' তাদের সর্বাগ্রজ। সেই সর্বাগ্রজের শ্রদ্ধা ও সম্মান তার অবশ্যপ্রাপ্য। তবে তার পাওনা সেইখানেই শেষ নয়। যে সনাতন শিল্পমূল্যে সাহিত্যের বিচার হয়, সেই শিল্পমূল্যের নিকষে মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' চিরকাল স্বর্ণোজ্জ্বল মহিমায় চিহ্নিত থেকে নাট্যসাহিত্য-পাঠকের শ্রদ্ধা ও সমাদর আদায় করবে।

(৬)

কালানুক্রমিক হিসাবে তাঁর প্রহসন দুটি 'একেই কি বলে সভ্যতা?' ও 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ' তাঁর প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র পরই রচিত। কিন্তু সে দুখানি নাটকের আলোচনা আমি এখনও করি নি। তখনকার দিনের রীতি অনুযায়ী এগুলিকে প্রহসন নামে অভিহিত করা হয়েছে। নাটক দুখানি দুটি ছোট ছোট হাস্যরসাত্মক নাটক। দর্শকদের সকৌতুক আনন্দরস পরিবেশনের জন্যই এদের সৃষ্টি। নাটক দুখানি কলেবরে একান্ত ক্ষুদ্র। তখনকার একখানি সাধারণ পূর্ণাঙ্গ নাটকের কলেবরের অর্ধেক। নাটক দুখানির প্রকাশকাল ১৮৬০ সাল। দেখে মনে হয়, নাটক দুখানি একই সঙ্গে রচিত হয়েছিল যাতে একসঙ্গে পর পর অভিনীত হয়ে একখানি পূর্ণাঙ্গ নাটকের অভিনয়ে যতখানি সময় লাগে, এই দুখানি নাটক পর পর একসঙ্গে অভিনীত হলে ততখানিই সময় লাগবে।

নাটক রচনার ক্ষেত্রে কলকাতার তিনজন ধনাঢ্য ব্যক্তি বিশেষভাবে তাঁর

পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। আর একজন তাঁকে নাটক সম্পর্কে বরাবর সৎ পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন। ধনাঢ্য ব্যক্তিগুলি হলেন পাইকপাড়ার দুই রাজা, প্রতাপচন্দ্র সিংহ আর ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, যাঁদের উদ্যোগে ও অর্থানুকূল্যে বেলগাছিয়ায় নাট্যশালা পরিচালিত হত; আর তৃতীয় জন হলেন রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। আর নাটক রচনায় পরামর্শদাতার নাম হল কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। ইনি একজন অতি উৎকৃষ্ট নাট্যবোদ্ধা, রসিক মানুষ এবং বেলগাছিয়া থিয়েটারের প্রধান অভিনেতা ছিলেন। মধুসূদনের প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা নাটক' রচনার পর রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মধুসূদনকে প্রহসন লিখবার জন্য অনুরোধ করে লেখেন—'আমরা যে গভীর ভাবের এবং হাস্য-রসের উভয়বিধ নাটকই রচনা ও প্রযোজনার ব্যবস্থা করতে পারি এ কথা জনসমাজে প্রমাণ করতে চাই।' এই অনুরোধের উত্তরে মধুসূদন 'একেই কি বলে সভ্যতা?' এবং 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ' রচনা করেন।

রচনা করে নাটক দুটি তিনি রাজাদের হাতে দিয়েছিলেন। কিন্তু নাটক দুটি অভিনয় হয় নি। অভিনয় না হবার কারণ তৎকালীন 'ইয়ং বেঙ্গল' শ্রেণীর কয়েকজন কর্তৃক এই নাটকাভিনয়ে বাধা প্রদান। যাঁরা বাধা দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে এমন কেউ ছিলেন যিনি পাইকপাড়ার রাজভ্রাতাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম ছিলেন। তাঁর এবং তাঁদের দলের আপত্তিতে নাটকটির আর অভিনয় হতে পারে নি। তাঁদের অভিযোগ ছিল 'একেই কি বলে সভ্যতা?' নাটকটিতে মধুসূদন 'ইয়ং বেঙ্গল'কে ব্যঙ্গ করে চিত্রিত করেছেন।

আজ এক শতাব্দীরও দীর্ঘতর কালের এপার থেকে 'একেই কি বলে সভ্যতা?'-র মধ্যে কতখানি সত্য আর কতখানি অতিরঞ্জন তা সঠিক আবিষ্কার করা দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর চালচলন ও রীতি-পদ্ধতি যে অনেকটাই এই রকম ছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। কারণ 'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রকাশের পাঁচ বৎসর পরে ১৮৬৬ সালে দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' প্রকাশিত হয়। সেটিও প্রহসন, কাজেই তার মধ্যেও স্বাভাবিকভাবে অতিরঞ্জন আছে। কিন্তু দুইয়ের মধ্যেই 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর যে স্বরূপ প্রকাশিত ও উদ্ঘাটিত হয়েছে তার মধ্যে এমন আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে যে নাটকের বিষয়বস্তুর অধিকাংশই যে সত্য স্বরূপে উদ্ঘাটিত হয়েছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

'একেই কি বলে সভ্যতা?' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে একটি সবিস্ময় কৌতূহল জাগে। মধুসূদন এই নাটক রচনার পূর্ববর্তী কালে, একদা, তাঁর যখন তরুণ যৌবন, তখন নিজেই 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর মিছিলে

ধ্বজাবাহী অগ্রবর্তী পুরুষ ছিলেন। তিনি, তাঁর যখন মধ্য যৌবন, বয়স যখন তাঁর পঁয়ত্রিশ, তখন এই নাটক রচনা করেছেন। এ কি 'হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন' রচনার মনোভাবের পূর্বাভাষ?

'একেই কি বলে সভ্যতা?'-র মধ্যে 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর প্রতি যে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ বর্ষিত হয়েছে তার তীব্রতা ও দুঃসাহসিকতা অপরিমেয়। ইংরেজ সমাজের ও ইংরেজী রীতি-নীতির অন্ধ অনুকরণ-প্রবৃত্তি যে তাৎকালিক ভদ্র-সন্তানদের কতদূর বিপথে পরিচালিত করেছিল তা নাটকটির ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত। জ্ঞানতরঙ্গিণী সভায় জ্ঞানচর্চার নামে কদাচার ও অনাচার করে তৎকালীন বিত্তবান্ ও মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তানরা নিজেদের ও নিজের সমাজের যে সুদূরপ্রসারী আত্মিক ক্ষতি সম্পাদন করেছেন তা স্পষ্ট ভাবে ও আভাসে দুই ভাবেই বর্ণিত হয়েছে।

'একেই কি বলে সভ্যতা?'-য় কলকাতার নাগরিক জীবনে ইংরেজী রীতি-নীতি ও আচারের অন্ধ অনুকরণের অতি স্পষ্ট ছবি এঁকেছেন মধুসূদন। আর 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ'তে বাংলা দেশের পল্লীগ্রামে ধর্মধ্বজী, লম্পট জমিদারের ও তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন সমাজের ছবি এঁকেছেন মধুসূদন। একটির পর অপরটি না আঁকলে, এই দুটি প্রহসন একসঙ্গে না লিখলে সামাজিক বিচারের তুলাদণ্ডের দণ্ডটি ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল সরল রেখায় থাকত না। এ দিক দিয়ে মধুসূদনের বিবেচনাকে পরিপূর্ণ সাধুবাদ দিতে হবে। ইংরেজী ও দেশীয় সভ্যতার ও সংস্কৃতির পীঠভূমি, নব কালের বিত্তবান্‌দের অধিষ্ঠানভূমি, প্রথমে কোম্পানীর ও পরে ব্রিটিশ শাসনের রাজধানী, বর্ণাঢ্য ও উজ্জ্বল কলকাতা মহানগরীর কথা, তার ভাল, তার মন্দ—এ সব শুনবার মানুষের অভাব হবার কথা নয়, কোন দিন হয়ও নি। কিন্তু এই সংস্কৃতির ও বিত্তের আলোকোজ্জ্বল পরিমণ্ডলের বাইরে অজানার অন্ধকারে বেদনায় আচ্ছন্ন, মূক, নীরব যে বাংলা দেশ ছিল, চিরকালই ছিল, সেদিনও ছিল, সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন, অজানা, নীরব, বেদনায় নিমজ্জমান বাংলার কৃষিভিত্তিক পল্লী-সমাজের কথা জনসমক্ষে, বোধ হয় সর্বপ্রথম, তার সত্যমূর্তিতে উদ্‌ঘাটিত করে মধুসূদন দেশবাসীর অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

আজ এই বিংশ শতাব্দীর সপ্তম ও অষ্টম দশকে আমরা প্রায়শই সামাজিক ন্যায়-বিচারের কথা উচ্চারণ করি। এক শতাব্দীরও এক দশকাধিক কাল পূর্বে এই নাটক যখন লেখা হয়েছিল তখন এই বোধ কোথায় ছিল? আদৌ ছিল কি? অথচ যে বিশ্ব-বিবেক সনাতন কালে সনাতন মূর্তিতে মানব-অন্তরে অবস্থিত সে তো সেদিনও ছিল। সে নিশ্চয় একে দেখেছে, লক্ষ্য করে নি; সে হয়তো সেদিন শুধু ব্যথিত হয়েছে, বিচার দাবী করে নি।

সে সেদিন হয়তো মূর্চ্ছাতুর বা মোহান্ধ হয়ে ছিল সাময়িকভাবে; অথবা তার ন্যায়বোধ এদিক দিয়ে একান্ত অস্ফুট ছিল। যারা সেদিন অহরহ নির্যাতনের বেদনা ভোগ করেছে তারাও একে ভাগ্য বা বিধিলিপি বলে মেনে নিয়েছে, প্রতিবাদ করে নি। নব যুগের অভ্যুত্থানে, আজ একশো দশ বৎসর ধরে নিরন্তর ধারাবাহিক কর্ষণে সে ন্যায়বোধ তীব্র থেকে তীব্রতর মূর্তি নিয়েছে আমাদের অন্তরলোকে। কিন্তু ন্যায়বোধের সেই অস্ফুট চেতনা বা মোহাচ্ছন্নতার দিনে এমন তীব্র, তীক্ষ্ম ন্যায়বোধের মূর্তি আমরা সাহিত্যের ইতিহাসে খুব বেশী দেখি নি। খাজনার জন্য রাইয়তের উপর নির্যাতন, দরিদ্র রাইয়তকে মানুষ জ্ঞান না করা, বৃদ্ধ, সম্পন্ন, ভণ্ড, লম্পট জমিদারের গ্রামের তাবৎ যুবতী কন্যা ও বধূর উপর লালসার দৃষ্টি এবং তাদের হস্তগত করার জন্য অকাতরে অর্থব্যয়, অথচ গ্রামের দরিদ্র ব্রাহ্মণকে সাহায্য-প্রার্থনার উত্তরে সুকৌশল প্রত্যাখ্যান—সব কিছু মিলিয়ে বৃদ্ধ, সম্পন্ন, লম্পট, চতুর গ্রাম্য জমিদারটিকে ঘিরে যে কৌতুকের জাল বোনা হয়েছে তাতে জালবন্ধ হয়েছে সেই দুষ্ট বৃদ্ধই। অথচ সেই ভণ্ডের হিন্দুত্ব সম্পর্কে মিথ্যা সতর্কতার শেষ নাই। কলকাতায় পাঠরত সন্তানকে হিন্দুত্বের আচারভ্রষ্টতার জন্য লেখাপড়া ছাড়িয়ে দেবার দম্ভোক্তি করতেও তার আটকায় না। সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের চরিত্রে যত ভ্রষ্টতা এবং যত গোঁজামিল তার সবটাই তিনি আভাসে প্রকাশ করেছেন। ন্যায়বোধের দৃষ্টি কতখানি স্বচ্ছ হলে সমস্ত ত্রুটি, সমস্ত ভণ্ডামি, সমস্ত নষ্টামি, সমস্ত অনাচার, সমস্ত অত্যাচার এমন স্পষ্টভাবে প্রকাশের শক্তি জন্মায় তা কল্পনা করে দেখার উপযুক্ত বিষয় বলেই মনে করি।

বিষয়বস্তু ও দৃষ্টির কথা বাদ দিয়ে এবার এর রচনা-সৌকর্য সম্পর্কে কিছু উল্লেখের প্রয়োজন আছে। নাটক দুটি পড়লে এমনভাবে তা আমাদের চিত্তে এবং বুদ্ধিতে একই সঙ্গে আঘাত করে যে এদের বাস্তবতার সম্পর্কে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ থাকে না। সত্যের রূপই এমনি। তা প্রতিভাত হলে তাকে সত্য বলে চোখে আঙুল দিয়ে চিনিয়ে দেবার প্রয়োজন ঘটে না। তৎকালীন কলকাতার 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর মূর্তি এবং পল্লী অঞ্চলের গ্রাম্য রাইয়ত ও জমিদার এই দুইয়েরই মূর্তি অতি বাস্তব, অতি স্পষ্ট হয়ে নাটক দুখানিতে ধরা পড়েছে।

এর প্রমাণ নাটক দুখানির ছত্রে ছত্রে, নাটকের ভাষায়। প্রতিটি পাত্র-পাত্রীর ভাষা এত সজীব, এত সতেজ, এত বৈচিত্র্যময় অথচ এত সহজ ও বাস্তব। একশো বছরেরও বেশী সময় আগের ভাষা, অথচ পড়লে এখনও তা আজকের কথ্যভাষা মনে হয়। এ ভাষায় কোথাও এমন কিছু আছে যা

একে চিরনবীন করে রেখেছে। বোধ হয় দেশের মৃত্তিকা ও সংস্কৃতিগত কোন ধাতুর সঙ্গে ভাষার এমন কোন কিছু প্রগাঢ় সম্পর্ক ঘটে ক্ষেত্রবিশেষে, যার ফলে ভাষা এক চিরনবীন অম্লানতা ধারণ করে চিরকাল উজ্জ্বল থাকে। দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভাষায় এই নবীনতা আছে, কিন্তু বিদ্যাপতিতে নাই; রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীতে এর স্পর্শ আছে, কিন্তু পরিশীলিত ভারতচন্দ্রে নাই; মধুসূদনের এই নাটক দুটির ভাষাতে তা আছে, অন্য নাটকে তা নাই।

অথচ অনুমান করতে পারি মধুসূদন অত্যন্ত অবলীলাক্রমে এই নাটক দুটি লিখেছিলেন। অন্য নাটকগুলি লিখবার সময় যে শ্রম, যে কল্পনা, যে চিন্তা করতে হয়েছিল, এ দুটির বেলায় সে সবের কোন কিছুর বিন্দুমাত্র ব্যবহার করার প্রয়োজন ঘটে নি। যা ব্যবহার করেছিলেন তা দুই-চোখ-দিয়ে-দেখা অভিজ্ঞতার সামান্য অংশ, এবং তাকে প্রকাশ করতে যে ভাষা ব্যবহার করেছিলেন তা তাঁর সংস্কৃত মনের ও মননের দ্বারা সৃষ্ট ভাষা নয়, দুই-কানে-শোনা ভাষা, যা তাঁর স্মৃতিতে অবস্থান করছিল। তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সামান্য অংশ এই একবার মাত্র তিনি এই নাটক দুটিতে ব্যবহার করেছিলেন। এবং তারই ফলে এই সার্থকতা অর্জন করেছিলেন। নবীন কালের বাস্তব-ভিত্তিক সাহিত্যের ভিত্তিটি যেন এইখানেই রচিত হয়েছে।

(৭)

বহু মানুষ বহু গুণ নিয়ে, শক্তি ও সামর্থ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, সে শক্তি ও সামর্থ্যের চর্চা করে তাকে বাড়িয়ে তোলে। মানুষ বলি মানুষ, পৃথিবী অথবা স্বদেশ বলি তো পৃথিবী এবং স্বদেশ অথবা দেবতা বলি দেবতা, সকলের কাছ থেকে সে শক্তির ও সামর্থ্যের অর্ঘ্য গ্রহণ করেন না। এই দিক দিয়ে মধুসূদন মহাভাগ্যবান্। তাঁর জীবনে যা কিছু উপকরণ ও সামগ্রী ছিল সবই জাতির গ্রহণযোগ্য হয়েছিল।

মধুসূদন জীবনের অধিকাংশ ভাগ বিদেশী ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনে ব্যয় করেছিলেন। তা পরোক্ষভাবে অবশ্যই বাঙালীর কাজে লেগেছে, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে কখনও কোন কাজে লাগে নি। তিনি প্রথম জীবনে, মাদ্রাজে বাসকালে, 'Captive Ladie' বলে একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সে কাব্যগ্রন্থখানি সম্পর্কে সাধারণভাবে বাঙালীর কোন ঔৎসুক্য নেই। কিন্তু তাঁর ইংরেজী ভাষা, তাঁর অনুশীলিত ইংরেজী ভাষা অন্তত একবার বাঙালীর চরম প্রয়োজনের সময় চরম কাজে লেগেছিল।

নীলকরদের প্রতিকারহীন অত্যাচারে যখন বাংলার পল্লী-অঞ্চল জর্জর সেই সময়েই দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হয়। তা বাংলাভাষাভাষী জনসমাজের গ্রহণযোগ্য হলেও, 'নীলদর্পণে'র মধ্যে বর্ণিত অত্যাচারের তীব্র স্বরূপ শাসক ইংরাজের কানে ও চোখে তুলে ধরবার জন্য 'নীলদর্পণে'র ইংরেজী অনুবাদ জাতীয় প্রয়োজন স্বরূপ হয়েছিল। সে কাজ 'A Native' নামের আড়ালে মধুসূদনই পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্পন্ন করেছিলেন।

আমাদের দেশে বিবিধ সামাজিক ও ব্যক্তিগত ঋণের মধ্যে ঋষিঋণের উল্লেখ আছে। 'নীলদর্পণে'র অনুবাদ সম্পন্ন করে মধুসূদন আমাদের সমগ্র জাতিকে সেই ঋণে বংশানুক্রমিকভাবে আবদ্ধ করে গিয়েছেন। এ ঋণ শোধ হবার নয়, শুধু সকৃতজ্ঞ ও সশ্রদ্ধ নমস্কার নিবেদন করে সেই ঋষিঋণ এখানে শুধু স্বীকার করলাম মাত্র।

আমার বক্তব্য শেষ হয়েছে।

এ সম্পর্কে শেষ কথা এই উচ্চারণ করি যে মধুসূদন আমাদের নবজাগ্রত জাতির প্রথম জাতীয় মহাকবি এ কথা তাঁর সম্পর্কে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক সত্য। কিন্তু মধুসূদনের সম্পূর্ণ পরিচয়লিপ্সু কেউ তাঁর নাটকগুলি বাদ দিয়ে শুধুমাত্র তাঁর কাব্য পাঠ করেই তা পাবেন না। তাঁকে তাঁর সব নাটক-গুলিও পড়তে হবে।

নাটকে মধুসূদন দীর্ঘদিন মনোনিবেশ করতে পারেন নি। এই আশ্চর্য প্রতিভাময় পুরুষটির সত্যকারের সাহিত্য-কর্মের কাল মাত্র চার-সাড়ে চার বৎসরের। প্রথমেই নাটক রচনা দিয়ে তাঁর সাহিত্য-জীবন আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু তাঁর আর নাটক রচনার সময় ছিল না। তাঁর সম্পূর্ণ চিত্তাকাশ তখন কল্পনার ঘনকৃষ্ণ মেঘে মেঘমেদুর হয়ে উঠেছে। সেই মেঘমেদুর কল্পনার আকাশে তখন বিদ্যুচ্চমকের মত স্বর্ণলঙ্কা নামক এক অমরাবতীর সৌধশীর্ষ ও দেবদেউল আর সেই সঙ্গে রাবণ নামক এক পুরুষের ট্র্যাজিক মহিমায় মহিমান্বিত, বিষণ্ণ মুখ বার বার উদ্ভাসিত হয়ে উঠে তাঁকে ক্ষণে ক্ষণে বিচলিত করছে। সেই বিদ্যুচ্চকিত, মেঘমেদুর আকাশের কোণে কোণে, কোলে কোলে অমিত্রাক্ষর ছন্দের মেঘমন্দ্র মৃদঙ্গধ্বনি ক্ষণে ক্ষণে গুরু গুরু করে ধ্বনিত হয়ে চলেছে। কবির কল্পনা-স্বর্গ থেকে 'মেঘনাদবধ' নামক মহাকাব্যের আধারে মর্ত্যলোকে শ্লোকে শ্লোকে সেই আকাশ-গঙ্গার ধারা-বর্ষণ তখন আসন্ন।

কিন্তু মধুসূদনের সম্পূর্ণ পরিচয় লাভ করতে পদক্ষেপ করে কোন পথিক যদি তাঁর নাটকগুলিকে পাশ কাটিয়ে একেবারে তাঁর মহাকাব্যের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে অগ্রসর হন তবে শতাব্দী-পারের সত্তর-অতিক্রান্ত

এক সামান্য সাহিত্যসেবী হিসাবে একান্ত নম্রভাবে তর্জনী উত্তোলন করে, সেই মহাকবিরই বাক্য উদ্ধৃত করে তাঁকে শোনাব—

দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব বঙ্গে,—
তিষ্ঠ ক্ষণকাল।

দ্বিতীয় বক্তৃতা

(২) দীনবন্ধু মিত্র

(১)

নিজের সমসাময়িক কালে শিল্পীর যে সজীব, পরিপূর্ণ মূর্তি থাকে সে সমসাময়িক কাল গত হলে, পরবর্তীকালে যখন তাঁর সাহিত্য-মূল্যের বিচার হয় তখন হিসাবের অঙ্কে তাঁর শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাওনা চুকিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁর আসল সজীব মূর্তিটি কেমন ছিল তার আর হিসাব পাওয়া যায় না। কাল আরও অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শ্রদ্ধা ও সম্মান লোক-শ্রুতিতে পরিণত হয়। তখন শিল্পীর পরিচয় হয়ে দাঁড়ায় ঘষা মুদ্রার মত, তাতে অবয়বের সামান্য চিহ্নই বর্তমান থাকে। সেইটিই তখন শিল্পীর তাৎকালিক বা চিরকালের পরিচয় হয়ে দাঁড়ায়।

দীনবন্ধুর পরিচয়ও আমাদের কাছে, যাঁরা পণ্ডিত নন অথচ যাঁরা সাধারণ-ভাবে সাহিত্য-শিল্পের কাজ করেন, অনেকটা সেই রকম হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রথম আবির্ভাবের একশো দশ বছর পরে আজ আমাদের কাছে দীনবন্ধুর একমাত্র পরিচয় 'নীল-দর্পণ' নাটকের রচয়িতা বলে। সৌভাগ্যক্রমে তিনি 'নীল-দর্পণ'-এর মত একখানি নাটক রচনা করেছিলেন, তাই তাঁর পরিচয় তবু একটি স্পষ্ট কিছুর সঙ্গে জড়িত হয়ে লোকস্মৃতি ও লোকশ্রুতিতে বর্তমান রয়েছে। তা না হলে তা কেমন ধরণের মূর্তি ধারণ করত তা বলা কঠিন।

আমি তাঁর সেই কাল-চলিত বর্তমান মূর্তি দিয়েই আমার বক্তব্যের সূচনা করছি। বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের আবির্ভাবের সময় থেকে আজ পর্যন্ত কম সাহিত্য-কীর্তি বিভিন্ন সাহিত্য-সাধকের দ্বারা সৃষ্ট হয় নি। এই কালের মধ্যেই সাহিত্য-সৃষ্টির তুঙ্গ শীর্ষের মত মহাকবি রবীন্দ্রনাথেরও অবস্থান। তা সত্ত্বেও বলব বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত বা অতি ইদানীংকালে রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি'—এই দুখানি সঙ্গীত ছাড়া আর এমন কিছু নেই যা 'নীল-দর্পণে'র মত সমাজকে, মানুষকে বা বিশেষ একটি কালকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করেছে। 'নীল-দর্পণ' প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের তাৎকালিক সমাজ ও মানুষকে এমন প্রচণ্ডভাবে আন্দোলিত

ও আলোড়িত করেছিল যে তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়ে তাৎকালিক সমাজের নীলকরদের প্রতাপ ও শাসনকে সংযত ও দমিত হতে বাধ্য করেছিল। এর তুলনা সাহিত্যের ও মনুষ্য-সমাজের ইতিহাসে পাওয়া যাবে, একাধিক পাওয়া যাবে। তবে এর সর্বোত্তম তুলনা বোধ হয় আমেরিকার 'টম কাকার কুটিরে'র সঙ্গে।

১৮৬০ সাল। বাংলা নাটক তখনও তার সূতিকাগৃহে। তার জাতকর্ম তখনও সম্পন্ন হয়েছে কি হয় নি। সেই সময় 'নীল-দর্পণে'র আবির্ভাব। বাংলা নাটক তখনও একটি বিশিষ্ট মূর্তি বা কালিক ধারাবাহিকতা লাভ করে নি। এর পূর্বে যে সব নাটক, যাদের সংখ্যাও খুব বেশী হবে না, রচিত হয়েছে, আজকের দিনে সেগুলি নাট্য-সাহিত্যের স্থায়ী এবং মূল্যবান্ অংশ কি না এ নিয়েও সন্দেহ ও তর্কের অবকাশ আছে। সেই কালে একটি সাহিত্য-কর্মের এমন প্রভাবের কথা ভাবলেও আশ্চর্য লাগে। উপমা দিতে গেলে বলতে পারি, সূতিকাগৃহে সদ্যোজাত শিশুর কণ্ঠেই এমন প্রবল প্রতিবাদ ও গর্জন ধ্বনিত হয়েছিল যার নজীর পুরাণে থাকলেও, মানুষের ইতিহাসে নেই। সেই আশ্চর্য শক্তিধর পুরুষ আমাদের সমগ্র জাতিরই প্রণম্য এবং অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন। তাঁকে সর্বাগ্রে সেই প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

(২)

দীনবন্ধু মাত্র তেতাল্লিশ বৎসর জীবিত ছিলেন। এদিক দিয়ে এই সংক্ষিপ্ত জীবনের ব্যাপারে তাঁর সমসাময়িক পুরুষ মধুসূদনের সঙ্গে তাঁর বিশেষ মিল আছে। মধুসূদনের মতই তাঁর সাহিত্য-জীবনের কালও সংক্ষিপ্ত। মধুসূদন অবশ্য বলতে গেলে চার কি পাঁচ বছরের বেশী সত্যিকার সাহিত্য-সেবা করতে পারেন নি। সেখানে দীনবন্ধুর সাহিত্য-সেবার কাল মাত্র তেরো বৎসর। মধুসূদনের মত তিনিও কাব্য এবং নাটক দুইই রচনা করে গিয়েছেন। কিন্তু মধুসূদন যেখানে প্রধানত কবিখ্যাতিতে মহিমান্বিত, দীনবন্ধু সেখানে প্রতিষ্ঠিত ও উজ্জ্বল নাট্যকার হিসাবে। এখানে দুজনে প্রায় তাঁদের সৃষ্টি-রুচি ও সৃষ্টিকর্মের দুই প্রান্তে নিজ নিজ স্বকীয়তায় প্রতিষ্ঠিত।

দুজনের আরও যে পার্থক্য আছে তা গভীরতর। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, দীনবন্ধুর মৃত্যুর পর বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে যা উচ্চারণ করে গিয়েছেন, ঋষিবাক্যের মত তা-ই আজও পর্যন্ত সত্য ও অমোঘ হয়ে আছে। তাকে অতিক্রম করে কিছু বলা বা ভিন্ন কোন কথা দীনবন্ধু

সম্পর্কে উচ্চারণ করা প্রায় অসম্ভব। যে গভীর পার্থক্যের কথা বলছি, বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই তার উল্লেখ করে গিয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধু সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, "ঈশ্বরচন্দ্র (গুপ্ত) খাঁটি বাঙালী, মধুসূদন ডাহা ইংরেজ। দীনবন্ধু ইহাদের সন্ধিস্থল।" দীনবন্ধু নবীন কালের শিক্ষায় কৃতবিদ্য ব্যক্তি এবং কৃতী ছাত্র ছিলেন। অন্য দিকে গুপ্ত কবির সম্পাদনায় প্রকাশিত 'সংবাদ প্রভাকরে' ছাত্রাবস্থা থেকেই কবিতা লিখতেন। নবীন কালের ইংরেজী শিক্ষা এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রভাব এই দুইয়ে মিলে এক দিকে প্রাচীন ধারা এবং অতি-আধুনিক ধারা—দুই ধারার মাঝখানে তাঁকে স্থাপন করেছিল। কাজেই আবহমান কালের বাঙালী নূতন কালে নবীন কালের শিক্ষা-দীক্ষায় যে মূর্তি গ্রহণ করবার কথা, সেই অনিবার্য স্বাভাবিক মূর্তিই তিনি লাভ করেছিলেন।

তিনি সাহিত্য-জীবন আরম্ভ করেছিলেন কবিতা দিয়ে, কিন্তু তাঁর আসল পরিচয় নাট্যকার হিসাবে। তাঁর সমগ্র জীবনের সাহিত্য-ফল নয়খানি গ্রন্থের মধ্যে তিনখানি কবিতা, বাকী ছয়খানি নাটক। কবি কেন নাট্যকার হলেন, এ কথা জানতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তথ্যের অভাবে জানার কোন উপায় নেই। তবে মনে হয় কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য যিনি সাহিত্য-কর্ম আরম্ভ করেছিলেন, পরবর্তী কালে অভিজ্ঞতা এবং নিজের মধ্যেকার আবিষ্কৃত শক্তি তাঁকে শিল্পের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রান্তরের পথ চিনিয়ে দিয়েছিল। ডাক-বিভাগের কর্মে তাঁকে স্থান থেকে স্থানান্তরে অবিরাম ঘুরে বেড়াতে হত। এবং তিনি যেখানেই যেতেন তাঁর মধুর, অমায়িক স্বভাবের জন্য সেখানেই তাঁর বন্ধুর অভাব হত না। আর এই চারিত্রিক সরসতা ও মাধুর্যের জন্য তাঁর পরিচিত অসংখ্য মানুষ দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল। এ ছাড়াও তিনি নিজে মানুষের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে ভালবাসতেন। এর ফলে বহু ধরণের মানুষের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে তিনি এসেছেন। মনে হয়, এই অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যে প্রকাশ করবার উপযুক্ত বাহন কাব্য হতে পারে না বলেই তাঁকে এমন এক শিল্প-পদ্ধতি বেছে নিতে হয়েছিল যেখানে শিল্পের উপাস্য ও সাধ্যভাব নয়, মানব-চরিত্র। কৌলীন্য-শাসিত সমাজের পরিপূর্ণ মূর্তিও তিনি পরিষ্কার-ভাবে জানতেন, সেই সঙ্গে বহু-ভ্রমণের ফলে দেশের বর্ণভেদজনিত নিম্ন-বর্ণের অবর্ণনীয় দারিদ্র্য ও সামাজিক অসম্মানের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। কৌলীন্য-শাসিত সমাজের অশিক্ষা, কুশিক্ষা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ কোন কিছুকেই নবীন কালের শিক্ষার উজ্জ্বল ও নিরাসক্ত দৃষ্টি দিয়ে দেখতে ও চিনতে তাঁর অসুবিধা হয় নি। দেশ ও সমাজ সম্পর্কে এবং মানব-চরিত্র

সম্পর্কে তাঁর গভীর ও ব্যাপক অভিজ্ঞতার জন্যই তিনি নাটক রচনার পথ গ্রহণ করেছিলেন।

এ ছাড়া তাঁর শিল্প-অভিজ্ঞতাকে প্রকাশের আর কোন পথ ছিল না। অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য আরও যে একটি শিল্প-রীতি ছিল, যে পথে পরবর্তী কালে বাংলা সাহিত্যের বৃহৎ ও ব্যাপক আত্মপ্রকাশ ঘটেছে, যে রীতির নাম উপন্যাস, সে তখনও বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হয় নি। এক নিদাঘ-সায়াহ্নে দ্রুত অশ্বক্ষুরধ্বনির চকিত শব্দমালার মধ্য দিয়ে যার প্রথম আবির্ভাব, তার আবির্ভূত হতে তখনও বছর পাঁচেক বিলম্ব ছিল। আর যাঁর হাত দিয়ে সে আবির্ভূত হবে, ভবিতব্যবশে তিনিও দীনবন্ধুর এক অভিন্নহৃদয় বন্ধু, নাম বঙ্কিমচন্দ্র।

কাজেই নিজের অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করবার উপযুক্ত যে একটি মাত্র শিল্প-রীতি ছিল তা নাট্যরচনা। তাকেই তিনি অনিবার্যভাবে গ্রহণ করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা মনে হয়। তাও এই প্রসঙ্গে নিবেদন করি। দীনবন্ধুর প্রথম নাটক 'নীলদর্পণ'। নীলকরের অত্যাচারের কাহিনী প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশের মানুষের দৃষ্টিপথে যাতে পড়তে পারে, সেই কারণেও হয়তো তিনি এই অত্যাচারের কাহিনীটি প্রকাশের তীক্ষ্ণতম ও প্রত্যক্ষতম পন্থা হিসাবে নাটক-রচনার পথ বেছে নিয়েছিলেন। তাৎক্ষণিক প্রয়োজন কালানুযায়ী অনিবার্যতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে দীনবন্ধুকে নাট্যকার হিসাবে প্রকটিত করেছিল।

(৩)

'নীলদর্পণ' নাট্যকার দীনবন্ধুর প্রথম নাটক। প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬০ সালে।

নাট্যকার দীনবন্ধু তাঁর জীবনের মোট তেরো-চৌদ্দ বৎসরের সাহিত্য-সাধনায় সবসমেত সাতখানি নাটক রচনা করেছিলেন। কিন্তু 'নীলদর্পণে'র সমগোত্র কোন রচনা আর তিনি করেন নাই। 'নীলদর্পণ' বাংলা সাহিত্যের একখানি অতি-খ্যাত ঐতিহাসিক কীর্তি এবং অতি-খ্যাত শিল্প-কীর্তি। কিন্তু আমি সেই কারণেই 'নীলদর্পণ' সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচনা করছি না। দীনবন্ধুর সাহিত্য-কর্মের পটভূমিতে 'নীলদর্পণে'র স্থান অনন্য সেই কথাই এখানে আলোচ্য বিষয়।

দীনবন্ধুর শিল্প-স্বভাব তাঁর ব্যক্তি-স্বভাবের পরিপূর্ণ ছায়া ও স্পর্শ

বহন করত। ব্যক্তি-জীবনে দীনবন্ধু মধুর-স্বভাব ও পরিহাস-রসিক মানুষ ছিলেন। নাটকে তাঁর রচিত চরিত্রগুলির মধ্যেও সর্বত্রই এই সকৌতুক, সরস স্পর্শ আছে। প্রত্যক্ষ জীবনে অন্য মানুষের জীবনকে যে সরসতা ও যে কৌতুক দিয়ে স্পর্শ করেছেন শিল্পের মধ্যেও তাদের উপস্থাপন করবার সময় সেই একই সরসতা ও কৌতুকের স্পর্শ দিয়ে তাদের সৃষ্টি করেছেন। কোথাও কটু কিছু নাই, বিস্বাদ কিছু নাই, বক্রোক্তি কি শ্লেষের নাম নাই: শুধু কৌতুক আর পরিহাস—বিষহীন শুভ্রতায় মধুর, প্রসন্ন ও সরস।

বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুসরণ করেই তার কথা অনায়াসে বলতে পারি। নিজের নিজের বালককালের স্মৃতি স্মরণ করলেই এর হদিশ মিলবে। স্কুলের নীচের শ্রেণীতে পাঠ্য ইতিহাসের বইয়ে আমরা অনেক মহামান্য সম্রাটের ও রাজ্যেশ্বরের এবং অনেক লাবণ্যবতী রাজ্ঞী ও ইতিহাসখ্যাতা রূপসীর ছবি অবশ্যই দেখেছি। ক্ষেত্র বিশেষে সেই সব গ্রন্থে সেই সম্রাট্ ও রাজ্যেশ্বরেরা তাঁদের রাজ-উষ্ণীষের অবকাশে দীর্ঘ শিখায় ভূষিত হয়েছেন এবং রাজ্ঞী ও রূপসীরা শ্মশ্রুগুম্ফে সুশোভিতা হয়ে বিচিত্র মূর্তি ধারণ করেছেন। কোন অর্বাচীন ছাত্রের হাতের পেন্সিল কি কলমের অকারণ কৌতুকময় অবলেপে এই অতি বিচিত্র রূপান্তব ঘটেছে। দীনবন্ধুর বেলাতেও কতকটা এমনি ঘটেছে, তবে সবটা অবশ্যই নয়। অর্বাচীন বোধহীন ছাত্রের বেলা যা শুধু অকারণ অর্থহীন কৌতুক-বোধ, দীনবন্ধুর বেলা তা অর্থযুক্ত, সজ্ঞান, সুপরিকল্পিত কৌতুক। কোতরা গুড়ের উপর তুলোর প্রলেপ-মাখা মানুষটিকে কিম্বা ওই যে মাতাল হয়ে অচেতন হয়ে শয্যাগ্রহণ করবার পূর্ব মুহূর্তেও লোকটি অবিরাম বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তা ও সেক্‌স্‌পীয়র আবৃত্তি করে যাচ্ছে নির্ভুলভাবে ওদের চিনতে পারছেন না? চেনা চেনা মনে হচ্ছে, কিন্তু চেনা যাচ্ছে না? একজন 'হোঁদল কুতকুত' জলধর যিনি 'নবীন তপস্বিনী' নাটকখানি আলোকিত করে আছেন, আর একজন 'সধবার একাদশী'র অতি-খ্যাত পুরুষ নিমচাঁদ। এ'দের দেখে আরও কিছু কিছু কথা মনে আসছে আপনার! হয়তো মনে হচ্ছে এদের যেন আপনি আপনার ব্যক্তিগত জীবনে কোথাও যেন দেখেছেন। আমিই আপনার হয়ে বলছি—এদের আপনি অবশ্যই দেখেছেন। কিন্তু চিনতে অসুবিধার কারণ হল এই যে, এ'দের চারিত্রিক ত্রুটিগুলি একটু অতিরঞ্জন করেই দীনবন্ধু এ'কেছেন। কিন্তু কোথাও কৌতুক-সরসতা ছাড়া কোন শ্লেষ বা বিষাক্ত কিছু দিয়ে এদের বিষাক্ত কি কটু করে আঁকেন নি। আপনি শুধু সকৌতুক অতিরঞ্জনের অংশটুকু বাদ দিয়ে দেখুন, এবার আপনার চেনা মানুষের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন, পুরোপুরি মিলে যাবে।

এই হল দীনবন্ধুর আসল শিল্প-চারিত্র। মানব-চরিত্রের অসঙ্গতিটুকু

তাঁর তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে ঠিক ধরা পড়ে। কিন্তু তাঁর সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয় তাঁকে আঘাত করতে দেয় না কাউকে। তাই আঘাত করার বদলে অন্তরের সকৌতুক সরসতা দিয়ে সেই অসঙ্গতির জায়গাটুকুতে একটু বেশী রঙ চাপিয়ে দেন। তাই চেনা মানুষকে চেনা চেনা লাগে অথচ আপনি চিনতে পারেন না। একেবারে সঠিক মানুষটিকে চিনতে না পারাই তো সব দিক দিয়ে ভাল। ওইখানেই ওদের চেনা চেনা রেখেই ছেড়ে দিন। তবে যদি চিনতেই চান তা হলে দীনবন্ধু ওর যে অসঙ্গতির উপর রঙ চড়িয়েছেন অসংগতিটুকুকে স্ফীততর ও তীব্রতর করে তুলবার জন্য, সেখানকার রঙটুকু মনে মনে খানিকটা কমিয়ে নিন। এইবার চেয়ে দেখুন চরিত্রটির দিকে। আর চিনতে ভুল হবে না। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠবেন—আরে বাঃ, এ যে আমাদের অমুক!

এই যেখানে শিল্পীর আসল শিল্প-চারিত্র সেখানে 'নীলদর্পণ' আবির্ভূত হল কি করে? 'নীলদর্পণ'-ই দীনবন্ধুর একমাত্র রচনা যেখানে পরিহাস কেন, সরসতারও বিন্দুমাত্র বাষ্প নাই। এ কেমন করে ঘটল?

এর উত্তর পাবার জন্য দীনবন্ধুর ব্যক্তিগত জীবন সন্ধান করতে হবে। বঙ্কিমচন্দ্রের অপরূপ বন্ধুকৃত্য, দীনবন্ধুর যে সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা আমাদের সকলের সহজ আয়ত্তের মধ্যে তার মধ্যেই এর সন্ধান মিলবে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করি দীনবন্ধুর সম্পূর্ণ নাম দীনবন্ধু মিত্র; এবং তাঁর সমসাময়িক কালে তিনি ডাক-বিভাগে যে সরকারী কর্ম করতেন তার দক্ষতার স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁর নামের পূর্বে ইংরেজ সরকার প্রদত্ত 'রায় বাহাদুর' উপাধি যুক্ত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "বোধ হয় ১৮৫৫ সালে দীনবন্ধু কালেজ পরিত্যাগ করিয়া, ১৫০, বেতনে পাটনায় পোষ্ট-মাষ্টারের পদ গ্রহণ করেন। ঐ কর্মে তিনি ছয় মাস নিযুক্ত থাকিয়া সুখ্যাতি লাভ করেন। দেড় বৎসর পরেই তাঁহার পদ বৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি উড়িষ্যা বিভাগের ইন্‌স্‌পেক্টিং পোষ্ট-মাষ্টার হইয়া যান।......উড়িষ্যা বিভাগ হইতে দীনবন্ধু নদীয়া বিভাগে প্রেরিত হয়েন, এবং তথা হইতে ঢাকা বিভাগে গমন করেন। এই সময় নীলবিষয়ক গোলযোগ উপস্থিত হয়। দীনবন্ধু নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া নীলকর-দিগের দৌরাত্ম্য বিশেষরূপে অবগত হইয়াছিলেন।"

দীনবন্ধু একান্ত সহৃদয় ও পরদুঃখকাতর চরিত্রের মানুষ ছিলেন এ কথা বঙ্কিমচন্দ্র বার বার নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অধিকারে উচ্চারণ করেছেন তাঁর বন্ধু দীনবন্ধু সম্পর্কে। এই পরদুঃখকাতর মানুষটি, তরুণ বয়স তখন তাঁর, সেই বয়সে কর্মোপলক্ষ্যে যেখানে যেখানে গিয়েছেন সেইখানেই নীল-করদের পরিমাণহীন অত্যাচার প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি দেখেছেন, সমস্ত

অত্যাচার ঠাণ্ডা মাথায় সুপরিকল্পিত, সর্বব্যাপী, প্রতিকারহীন এবং নিশ্ছিদ্র; তার থেকে পরিত্রাণের ছিদ্রপথ কোথাও রাখা হত না। সেই রন্ধ্রহীন অত্যাচারের বেড়াজালে অত্যাচারিতরা মাথা খুঁড়ে নিয়ত অধিক থেকে অধিকতর নির্যাতনের মধ্যে ধীরে ধীরে ক্লিষ্ট, অবশ হয়ে শেষ পর্যন্ত জীবনান্ত হয়ে পরিত্রাণ পেত। বিধাতার দরবারে পরলোকে তাদের পরিত্রাণ মিলত কি না তা বিধাতাই জানেন, কিন্তু মর্ত্যলোকে এই বর্বর অত্যাচার থেকে কারও পরিত্রাণের পথ ছিল না। সে অত্যাচার এত বর্বর এবং এত মূঢ় যে অত্যাচারী সেই অত্যাচার করে সগর্বে, সহর্ষে সে সম্পর্কে সদর্প আস্ফালন করত।

আজ কল্পনা করতে পারি, কর্মজীবনের প্রারম্ভেই, একান্ত তরুণ যৌবনে, কর্মোপলক্ষ্যে এই সহৃদয়, পরদুঃখকাতর মানুষটি যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই এই অত্যাচারকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাতে তাঁর পরদুঃখকাতর হৃদয় প্রথমে বিচলিত ও বিমূঢ় হয়েছে: তারপর ক্রমাগত এই অত্যাচারকে প্রত্যক্ষ করে সেই অত্যাচারের আগুনে হৃদয়ের সব সরসতা বাষ্প হয়ে উড়ে গিয়েছে, তার স্থলে স্থান গ্রহণ করেছে এক বিজাতীয় ক্রোধ। সেই ক্রোধকে তিনি একান্ত সংগোপনে পবিত্র অগ্নির মত ধারণ করে রেখেছিলেন আপনার হৃদয়ে। সেই ক্রোধে ক্রমাগত নিজে পুড়েছেন এবং জ্বলেছেন। তারপর একদা সেই ভীষণ ক্রোধকে 'নীল-দর্পণ' নাটকখানির মধ্যে সম্পূর্ণ প্রকাশ করে তবে শান্ত হয়েছেন। তাঁর হৃদয়ের সমস্ত আবেগ ওই একবার তরল, অগ্নিগর্ভ লাভা-স্রোতের আকার ধারণ করেছিল, ওই একবারই তরল অগ্নিস্রোত উদ্‌গিরণ করেছিল। 'নীল-দর্পণ' তাঁর জীবনের মাত্র একবার অগ্নি-উদ্‌গিরণের ইতিহাস।

নাটকখানির দৃশ্যে দৃশ্যে, ছত্রে ছত্রে এর পরিচয় আছে। এ নাটকে এক অতি তীব্র ও প্রচণ্ড ট্র্যাজেডি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। কিন্তু সে ট্র্যাজেডি কোন আধ্যাত্মিক বা আত্মিক সংকটের বিয়োগান্ত পরিণতি নয় কিম্বা কোন অদৃশ্য বিরোধী শক্তির ক্রিয়া-ঘটিত নয়। এ ট্র্যাজেডি এই পৃথিবীরই, মানুষের নিকট প্রতিবেশীর একান্ত স্থূল হস্তাবলেপের নিষ্ঠুরতার পরিণাম। যে স্থূল, পরুষ হাত দিনে দিনে রাশি রাশি যন্ত্রণা নানা আকারে পাশের নিরীহ, প্রতিবেশী মানুষের উপর চাপিয়েছে, তারই প্রচণ্ড পেষণে এ দেশের সরল, নিরীহ, দরিদ্র ও সম্ভ্রান্ত উভয়বিধ মানুষই পিষ্ট হয়ে মরেছে। একেবারে এক মুহূর্তে মরে যায় নি। নিত্য নিয়মিত যন্ত্রণায় দিনে দিনে পার্থিব অধোগতির পথে চলতে চলতে, সহ্য করতে করতে, শেষ ভগ্নপ্রাণ, ভগ্ন-আশা হয়ে তাদের জীবনান্ত হয়েছে। কেউ সসম্মানে মৃত্যুলাভ করতে পারে নি,

প্রত্যেকে অপমানিত হয়েছে, যন্ত্রণা পেয়েছে; প্রথম প্রথম সে যন্ত্রণা তারা সহ্য করেছে, অবশেষে কেউ কেউ আর যন্ত্রণা সহ্য করতে পারে নি; মৃত্যুর মধ্যে, আত্মহত্যার মধ্যে, হত্যার মধ্যে সব আঘাতের অবসান হয়েছে।

ভূমিনির্ভর এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবার। তার কর্তা, গৃহিণী মাথার উপরে। জ্যেষ্ঠ পুত্র সংসার দেখেন, গ্রামের দশজনকে বিপদে-আপদে রক্ষা করেন। ঘরে প্রীতির আধার সুশীলা পত্নী, একটি সন্তান, আর কনিষ্ঠ সহোদরের সরলা বালিকা বধূ। কনিষ্ঠ সহোদর কলেজে পড়েন। তাঁরা গ্রামের মানুষকে সাহায্য করেন, বিপদে-আপদে রক্ষা করেন। সেই বিপদ থেকে কয়েকজন চাষীকে রক্ষা করতে গিয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনলেন গোলোকচন্দ্র। নীলকরের রোষদৃষ্টি পড়ল তাঁর ও তাঁর পরিবারের উপর। ধীরে ধীরে সেই সুপরিকল্পিত বহ্নিদাহে গোটা বসু-পরিবারটি ধ্বংস হয়ে গেল। নাটকের প্রথম অর্ধাংশের শেষের দিকে বেগুণবেড়ের কুঠির দেওয়ান গোপীনাথ কুঠির বড় সাহেব উড সাহেবকে বলছে, "ধর্মাবতার, নবীন বসের চক্ষে এইবার জল বাহির হইয়াছে। বেটার এমন শাসন কিছুতেই হয় নাই। বেটার বাগান বাহির করিয়া লওয়া গিয়াছে, গাঁতি গদাই পোদকে পাটা করিয়া দেওয়া গিয়াছে, আবাদ একপ্রকার রহিত করা গিয়াছে, বেটার গোলা সব খালি পড়ে রহিয়াছে, বেটাকে দুইবার ফৌজদারিতে সোপর্দ করা গিয়াছে, এত ক্লেশেও বেটা খাড়া ছিল এইবারে একেবারে পতন হইয়াছে।"

অত্যাচারের এই আরম্ভ মাত্র। অত্যাচারী দুজন নীলকর, প্রবীণ উড সাহেব আর নবীন রোগ সাহেব। এঁরা দুজনে অত্যাচারের যে ক্ষেত্র, যেখানে নীলের উৎপাদন, সেখানে একজোট। এর সঙ্গে রোগ সাহেবের আর এক রোগ—নারীবিলাস। এই দুই শ্বেতাঙ্গ পুঙ্গবের দৃষ্টির সামনে যত উৎকৃষ্ট ভূমি তাতে নীল বোনার ব্যবস্থা করা চাই; আর যত নারী, যারা গৃহের কন্যা, বধূ হয়ে গৃহাঙ্গন আলো করে সংসারকে প্রীতি, স্নেহ ও মমতার সাগর করে রেখেছে, সেই সংসারের সব আনন্দ ধ্বংস করে সেই কন্যা আর বধূদের নারী-রূপে ভোগের জন্য হাত বাড়ানো চাই।

নাটকের প্রারম্ভে বোসেদের আনন্দের ও শান্তির সংসারের প্রসন্ন, হাস্যোজ্জ্বল ছবি, কেবল দূরস্থ মেঘের মত নীলকরের অত্যাচারের আশঙ্কা উঁকি দিচ্ছে। তারপর সেই ভয়াল মেঘ বোসেদের সংসারের উপর শকুনের মত তার কৃষ্ণপক্ষের ছায়া বিস্তার করেই ক্ষান্ত থাকল না, চঞ্চু দিয়ে আঘাত করতে লাগল, আঘাতের পর আঘাত। সুপরিকল্পিত আঘাত।

নবীন বোসের অধিকাংশ উৎকৃষ্ট জমিকে নীলের চাষে লাগানো হল, তাঁর বাসগৃহের সংলগ্ন পুষ্করিণীর চারি পাড়ে নীল চাষের ব্যবস্থা হল, তারপর

নবীন বোসের বৃদ্ধ পিতা গোলোক বোসকে ফৌজদারী সোপর্দ করে জেলে চালান দেওয়া হল। সেখানে ধার্মিক, ইংরাজ-ভীরু বৃদ্ধ ধর্মভয়ে অনাহারে থেকে শেষ পর্যন্ত গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করলেন। দীনবন্ধু এ কথা বলতেও কুণ্ঠা করেন নাই যে, দেশের শাসন ও আইন যাদের হাতে ছিল তারাও দ্বিধাহীনভাবে, অসংকোচে এই শ্বেতাঙ্গ পাষণ্ড নীলকরদের সমস্ত অপকর্মে শাসন ও আইনের অপব্যবহার করে, সহায়তা করেছে।

অত্যাচারের দ্বিতীয় পর্ব অধিকতর ভয়াবহ। গোলোক বোসের আত্মহত্যা দিয়ে যে পর্বের আরম্ভ সেই পর্বে পরে প্রচণ্ড প্রহারের ফলে 'নীল-দর্পণে'র বীর নায়ক নবীন বোসের মৃত্যু, তার ফলে জননী সাবিত্রীর উন্মাদ অবস্থা। স্বামী ও জ্যেষ্ঠ সন্তানকে অপমৃত্যুর কবলে হারিয়ে সাবিত্রীর মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গেল। সেই উন্মাদ অবস্থায় কনিষ্ঠা পুত্রবধূকে সে গলা টিপে হত্যা করলে। শেষ পর্যন্ত সেই মর্মান্তিক যন্ত্রণার পরিণামে সাবিত্রীর মৃত্যুতে নাটকের পরিসমাপ্তি।

এরই সঙ্গে নিরীহ রায়তদের কুঠির গুদামে পুরে রেখে প্রচণ্ড প্রহার করে নির্যাতন এবং বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের গুম করে ক্রমাগত এক কুঠি থেকে অন্য কুঠিতে স্থানান্তরিত করার নিখুঁত ছবি নাটকটির অঙ্গে চিরস্থায়ী দীপ্তিতে দীপ্তিমান্। সেই সঙ্গে গৃহস্থের কন্যাকে ধরে এনে কুঠির ভিতরে তার ধর্ষণ ও ধর্মনাশের চেষ্টা, যা রোগ সাহেব, ক্ষেত্রমণি, তোরাপ ও নবীন বোসের বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে একটি দৃশ্যে বর্ণিত হয়েছে, তা আমাদের সাহিত্যের একটি অত্যুজ্জ্বল রত্ন।

নাটকটির সঙ্গে পরিচয় হলে মনে হয় এখানে দুটি পক্ষ। তৃতীয় পক্ষ, যা ন্যায়, বিবেক, নীতি ও আইন-শৃংখলার দণ্ড ধারণ করে এই অত্যাচারকে সহজেই নিবৃত্ত করতে পারত, তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। যদি তৃতীয় পক্ষ এখানে কেউ থাকে তা এই বর্বর ও অমানুষিক অবস্থার দর্শক মাত্র। এই নাটকের দুটি পক্ষের মধ্যে এক পক্ষ নির্যাতিত, অপর পক্ষ অত্যাচারী। মনে হয়, সেই অত্যাচারী পক্ষ নির্যাতনের এক বিশাল কটাহ স্থাপন করে তার তলায় অতি কুটিল, সুপরিকল্পিত এক ক্রোধের জ্বাল দিয়ে সেই কটাহকে উত্তপ্ত করে তার মধ্যে অত্যাচারিত নিরীহ মানুষদের উৎক্ষেপ করে দগ্ধ করে হত্যা করবার ব্যবস্থা করেছে।

নাটকটির সর্বাঙ্গে, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, সত্যের এক আশ্চর্য দীপ্তি ঝলমল করছে। মনে হয়, এর সব ঘটনাই নাট্যকার জীবনের কোন না কোন প্রত্যক্ষ ঘটনা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। কোন কোন ঘটনা যদি তা নাও হয়, যদি কাল্পনিকও হয়, তা হলেও নাটকের সমস্ত কল্পনাটি তাঁর অন্তরে এমন

পরিপূর্ণ মূর্তি লাভ করে রচনার মধ্যে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল যে তার মধ্যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সত্যের অনন্য দীপ্তি বিদ্যমান। সেই দীপ্তির মধ্যে শুধু শিল্প-কৃতিত্বের আলোই ছিল না, তার মধ্যে সত্যের আশ্চর্য দাহ ছিল বলেই তা দেশের অত্যাচারিত ও অত্যাচারী উভয় পক্ষকেই আপনার দাহিকাশক্তি দিয়ে আঘাত করেছিল। সত্যের এ দীপ্তি ও দাহ সাহিত্যে কদাচিৎ আস্বাদ করা যায়।

এই সত্যের মূল বাহন প্রধানত নাটকটির ঘটনা-বিন্যাস নয়, মূল বাহন হল তার ভাষা। ভাষার এমন আশ্চর্য, তীক্ষ্ন সহজ প্রয়োগ, একেবারে কথ্য ভাষার যাবতীয় গ্রাম্যতাযুক্ত প্রয়োগ বাংলা সাহিত্যে বোধ হয় আর ঘটেনি। সাধারণ মানুষের মুখের অতি অসংস্কৃত, অপকৃষ্ট, একেবারে পরিপূর্ণভাবে আঞ্চলিক এক কথ্য ভাষা প্রয়োগ কৌশলে একেবারে অতি উৎকৃষ্ট সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠেছে।

গভীরতম পরদুঃখকাতরতা ও নিবিড়তম সহানুভূতি এবং প্রতিকারহীন বেদনাবোধ থেকে শিল্পের জন্ম হলে তার বোধ হয় এমনিই মূর্তি হয়। অথচ 'নীল-দর্পণে'র আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত কোথাও শিল্পীর সহানুভূতিকে প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ করবার বিন্দুমাত্র স্থান নেই। অবশ্য শেষ দৃশ্যে বিন্দু-মাধবের শেষ সংলাপ এ আলোচনা থেকে বাদ দিতে হবে। নাটকটি সম্পূর্ণ-ভবে নৈর্ব্যক্তিক ও নাট্যকারের ব্যক্তিত্বস্পর্শশূন্য এবং সম্পূর্ণ সত্যভিত্তিক ঘটনা-পরম্পরার বিবৃতির উপরে দাঁড়িয়ে আছে। আজ এক শতাব্দীর উপর কাল পার হয়ে গিয়েছে, ইতিহাসের অমোঘ অগস্ত্যযাত্রা-পথে নীলকরদের ও তাদের অত্যাচারের কাহিনী বহু অবস্থান্তরের মধ্যে আমরা আজ বিস্মৃত; তারা আজ দূর ইতিহাসের এক অতি ক্ষুদ্র ও নিষ্প্রভ অংশমাত্র জুড়ে আছে। তবু সহানুভূতি ও সত্যনিষ্ঠার যে অনুপম শিল্প-সামগ্রীটি 'নীল-দর্পণে'র মূর্তিতে আমাদের হাতে এসেছে, তা বঙ্গ-সরস্বতীর কণ্ঠহারে অম্লান হীরক-খণ্ডের মতই বিধৃত। নাটক রচনার জন্য নাট্যকার যখন প্রেরণা পাবেন না, পথ খুঁজে পাবেন না, তখন কালে কালে পথহারা নাট্যকার এই নাটকের সহানুভূতি ও সত্যনিষ্ঠার হীরক-দ্যুতির আলোকে আপনার পথ খুঁজে পাবেন।

(৪)

দীনবন্ধুর প্রথম নাটক 'নীল-দর্পণ'ই তাঁকে যেন কাব্য-সাধনার পথ থেকে হাতে ধরে নাট্য-রচনার পথে টেনে এনেছিল। ১৮৬০ থেকে ১৮৭৩ সাল

পর্যন্ত তেরো বৎসরের নাট্যকারের জীবনে দীনবন্ধু 'নীল-দর্পণ' বাদে আর ছয়খানি নাটক রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে তার শেষতমখানি, 'কমলে কামিনী নাটক' ছাড়া আর পাঁচখানি নাটক কম-বেশী হাস্যরসাশ্রিত। দীনবন্ধুর স্বভাবের ও সহৃদয়তার সুমধুর সরসতা ও রস-রসিকতার স্পর্শে এই নাটকগুলির প্রতিটিই বড় উজ্জ্বল, বড় কোমল, বড় স্বাদু। তাঁর স্বভাবধর্ম তাঁর শিল্পকর্মের উপরে আপনার পরিপূর্ণ ছায়ার স্নিগ্ধতা ও শুভ্রতা বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল।

তাঁর এই পাঁচখানি নাটক হল—'নবীন তপস্বিনী নাটক', 'বিয়েপাগলা বুড়ো', 'সধবার একাদশী', 'লীলাবতী' ও 'জামাই বারিক'। এর মধ্যে কয়েকটি প্রহসন; আর যেগুলি প্রহসন নয় সেগুলি হাস্যরসপ্রধান। কোথাও তা শুধুমাত্র মানব-চরিত্রের অসঙ্গতি দেখানোর জন্যই মূলত রচিত হয়েছে, কোথাও বা কোন সমসাময়িক সামাজিক সমস্যার পটভূমিতে স্থাপন করে রচনা করা হয়েছে। আমি এই পাঁচখানি নাটক দুটি পৃথক ভাগে ভাগ করে আলোচনা করছি। যেগুলি প্রধানত সামাজিক সমস্যার পটভূমিতে রচিত নয় সেগুলির আলোচনাই প্রথম করছি।

'নবীন তপস্বিনী নাটক' এবং 'বিয়েপাগ্‌লা বুড়ো', বলা যেতে পারে, বিশুদ্ধ প্রহসন বা বিশুদ্ধ প্রহসনের গুণান্বিত নাটক। 'নবীন তপস্বিনী নাটকে'র গল্পের মূল ভাগে একজন রাজা আছেন, আর এক রাণী আছেন নেপথ্যে তপস্বিনীর বেশে। রাজপুত্রও আছেন কাহিনীর মধ্যে, তিনি যে রাজপুত্র তা না জেনেই। রাজা, রাণী, রাজপুত্রকে নিয়ে যে কাহিনী সে কাহিনীতে স্বভাবতই রাজার পাত্র-মিত্র সকলেই আছেন; আছেন মন্ত্রী, সহকারী মন্ত্রী, রাজবয়স্য, সভাপণ্ডিত, সওদাগর। সকলের উপরে রাজপুত্র আপনার প্রেমের পাত্রী ও অন্বিষ্ট কন্যাটির কাছে প্রণয়ের প্রতিদান খুঁজছেন। সবটা মিলে একটি রূপকথার ছোঁয়াচ মূল গল্পটিকে একান্ত পরিমাণে রোমান্স-ধর্মী করে তুলেছে।

এমন রোমান্স-ধর্মী রচনা নাটকের আকারে রচনা করা কোন দ্বিতীয় শ্রেণীর শিল্পীর পক্ষেও খুব একটা কঠিন কাজ নয়। এমন রচনায় স্থান ও কালের চিহ্নিত মূর্তি থাকে না যার পটভূমিতে বিশেষ কালের ও বিশেষ ভূমির সামগ্রী হয়ে মানুষ একটি বিশিষ্ট মূর্তি পায়। মানুষের কল্পনায় সনাতন ইচ্ছাপূরণের যে দিবাস্বপ্ন নিয়ে মানুষ মিথ্যা জেনেও তাই নিয়ে খেলা করে, তাই দিয়ে মূর্তি ও কাহিনী রচনা করে, এ কাহিনী তারই কাহিনী। এর মধ্যে কোন উজ্জ্বলতা নাই, কোন ঐশ্বর্য নাই, কোন বৈচিত্র্য নাই।

তবে দীনবন্ধুর নাম এই নাটকটির সঙ্গে সংযুক্ত আছে এই জন্যই কি এর গৌরব? না, অবশ্যই নয়, এর গৌরব অন্যত্র। মূল কাহিনী চিরকালের দিবাস্বপ্নের অনন্তকালে বিস্তৃত বলে কোন বিশেষ কালের চিহ্নে চিহ্নিত নয়, সেই কারণে তা শুধু অস্পষ্ট নয়, অবাস্তবও। কিন্তু মূল কাহিনীর নায়ক-নায়িকা রাজা ও তপস্বিনী-বেশিনী রাণীর চারিপাশে যে সব পাত্র-মিত্র, মন্ত্রী, সহকারী মন্ত্রী, রাজবয়স্য, সভাপণ্ডিত, গুরুপুত্র প্রভৃতির মূর্তিতে সমাবৃত তারা সকলেই, হয়তো শিল্পীর অগোচরেই, বিশেষ স্থান ও কালের লাঞ্ছন নিজেদের সর্বাঙ্গে বহন করছে। সেই কারণে তারা স্পষ্ট মূর্তিতে জীবন্ত মানুষ হয়ে দর্শক ও পাঠকের সামনে আবির্ভূত হয়ে তাদের প্রসন্ন, হৃদ্য ও সরস সঙ্গদানে আমাদের একান্ত ভাবে পরিতৃপ্ত করে। শুধু তাই নয়, তাদের জীবন্ত অস্তিত্বের সাহচর্যে মূল কাল্পনিক কাহিনীও এক ধরণের বাস্তবতার স্পর্শলাভ করে গৌরবান্বিত হয়।

মূল আখ্যানের পাশে পাশে নাট্যকার কুৎসিতদর্শন, লম্পট, স্থূলস্বভাব মন্ত্রী জলধর, তার উপযুক্ত ও যোগ্য সহধর্মিণী জগদম্বা এবং লজ্জাশীলা সুন্দরী মালতীর কাহিনী বুনে গিয়েছেন। মন্ত্রী জলধর, মন্ত্রী-গৃহিণী জগদম্বা, সহকারী মন্ত্রী বিনায়ক, রাজবয়স্য মাধব, সভাপণ্ডিত বিদ্যাভূষণ, সদাগর রতিকান্ত, সদাগর-পত্নী মালতী, সহকারী মন্ত্রী-পত্নী মল্লিকা তাদের রূপকথার চিরকালীন অভিধাসত্ত্বেও স্পষ্ট, একান্তভাবে স্পষ্ট ও জীবন্ত। এইসব পার্শ্বচরিত্রের নামের আগে আগে যে অভিধা আছে তা মুছে ফেললেই একটি বিশেষ কালের, বিশেষ সমাজের মানুষ বলে চিনতে তাদের বিন্দুমাত্র ক্লেশ বা অসুবিধা হবে না। এবং এ সমাজ ও এ কাল দীনবন্ধুরই সম-সাময়িক কাল ও সমাজ।

এই পার্শ্ব কাহিনীটি জলধরকে কেন্দ্র করে রচিত। কুরূপ জলধর বিত্তবান্ ও প্রতিষ্ঠাবান্ মানুষ, তার লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে পরস্ত্রী মালতীর উপর। সেই অসামাজিক অন্যায় বাসনা চরিতার্থ করবার জন্য পা বাড়িয়ে, এসব ক্ষেত্রে আগ্রহাতিশয্যে যে বুদ্ধিনাশের সম্ভাবনা, সেই বুদ্ধিনাশের ফলে অপর পক্ষের ফাঁদে পড়ে নষ্টবুদ্ধি জলধর নিজের দুষ্কৃতির শাস্তি পেলে। সমস্ত ব্যাপারটাই হাস্যরসের।

কিন্তু তার প্রতিষ্ঠা সত্যের উপর। দীনবন্ধুর সমসাময়িক কালে বিত্তবান্ ও প্রতিষ্ঠাবান্ মানুষের এই ধরণের অসামাজিক বাসনা ও আচরণ আজকের থেকে অনেক বেশী পরিমাণে অকুণ্ঠভাবে ও অসঙ্কোচে প্রকাশিত হত। সে কালকে যাঁরা কিছু পরিমাণে জানেন তাঁরা বলবেন সেকালে এ ধরণের আচরণ খুব দুর্লভ ছিল না। এ দোষে দুষ্ট বহু মানুষকেই

সমাজে দেখা যেত। এই ধরণের ব্যবহার ও এই ধরণের মানুষ শিক্ষার প্রসার ও সমাজ-ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে পরিবর্তনের ফলে আজ বিলুপ্ত হয়েছে। বিলুপ্ত হয়েছে বললে কেউ যদি আপত্তি করেন তা হলে বলব তার অন্য রূপান্তর ঘটেছে। তার পটভূমি ও নায়ক-নায়িকা ভিন্ন শ্রেণীর।

তাই যদি বলি 'নবীন তপস্বিনী নাটকে' এক কাল্পনিক দিবাস্বপ্নের কাহিনী রচনা করতে গিয়ে তিনি সত্যকারের মানুষদের নিয়ে এক সকৌতুক সরস কাহিনী নাটকের মাধ্যমে রচনা করে আমাদের উপহার দিয়েছেন তা হলে বোধ হয় খুব অসত্য কথা উচ্চারণ করা হবে না।

তাঁর 'নবীন তপস্বিনী নাটকে'র জলধর, রতিকান্ত ও বিনায়ক দীন-বন্ধুরই সমসাময়িক সমাজের বিত্তশালী, উচ্চ কোটীর মানুষ, তাঁর সভাপণ্ডিত বিদ্যাভূষণ সে কালেরই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, তাঁর রাজবয়স্য মাধব সে কালেরই অল্প শিক্ষিত ব্রাহ্মণ-সন্তান, যে ধনীর মনোরঞ্জন করে আপনার দিন যাপন ও জীবিকা অর্জন করেছে। তাঁর জগদম্বা, মল্লিকা অথবা মালতী তাঁর নিজেরই কালের মুখরা, প্রবলা অথবা প্রগল্‌ভা, রসবণিকা অথবা শান্তস্বভাবা গৃহিণী। রূপকথা বলতে গিয়ে তিনি নিজের কালকেই এঁকেছেন এই নাটকে।

এইটুকু বলেই এ নাটক সম্পর্কে আমার বক্তব্য শেষ করতে পারছি না। আরও একটি কথা এই সঙ্গে যোগ করব। আধুনিক কালের শিক্ষায় শিক্ষিত, পরিচ্ছন্নদৃষ্টি দীনবন্ধু তৎকালিক সমাজে বিত্তবান্ ও প্রতিষ্ঠাশালীদের এই অকুণ্ঠ ও অসঙ্কোচ নারী-লোলুপতাকে অবশ্যই প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখেন নাই। দেখার কথা নয় বলেই দেখেন নাই। সেই অবাঞ্ছিত অথচ অতি ব্যাপক একটি কুৎসিত সামাজিক আচারকে তিরস্কার করা তিনি প্রয়োজন মনে করেছিলেন। সেই কারণেই তিরস্কার করবার জন্য সরস, সকৌতুক শ্লেষের পথ গ্রহণ করেছেন তিনি নিজের স্বভাবধর্ম ও শিল্পধর্ম অনুযায়ী। সেই পথেই জলধরকে তিনি গুড়ে ও তুলোয় মণ্ডিত করে হোঁদল কুতকুতের মূর্তিতে আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করেছেন। উপস্থাপিত করে তিনিও হেসেছেন, দেখে আমরাও হেসেছি। হয়তো হোঁদল কুতকুত জলধরও সলজ্জভাবে হেসেছে।

এর পর 'বিয়েপাগ্‌লা বুড়ো'। এটি একেবারে একটি পরিপূর্ণ প্রহসন। মৃতদার বৃদ্ধ রাজীব মুখুজ্জে ঘরে বিধবা যুবতী কন্যা এবং নাতি-নাতনী থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিবাহের জন্য পাগল। তার এই দুর্বলতাই প্রহসনটির রঙ্গস্থল। বৃদ্ধের এই প্রায়-উন্মত্ততার সুযোগ নিয়ে গ্রামের ছোকরাদের দিয়ে কাল্পনিক ঘটক লাগিয়ে একটি কাল্পনিক কন্যা খাড়া করে তার সঙ্গে বৃদ্ধের বিবাহের অভিনয় করে তার বৃদ্ধ বয়সে বিবাহের অসঙ্গত ও হাস্যকর ইচ্ছাকে লজ্জা ও ধিক্কার দেওয়া হয়েছে।

এই নাটক রচনার এক শতাব্দী কাল পরে আজ এই কাহিনীকে অবাস্তব ও কাল্পনিক মনে হবে। কিন্তু নাটকে নাটকেরই প্রয়োজনে কিছু পরিমাণ সকৌতুক অতিরঞ্জন থাকলেও এ কাহিনীর অনেকখানি বাস্তব সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তখনকার সমাজের মূর্তি অনেকটা এই রকমই ছিল। কৌলীন্যই যেখানে প্রধান বিবেচ্য বিষয়. সেখানে মৃত্যুপথযাত্রী কুলীনের সঙ্গে অনূঢ়া কন্যার বিবাহ হত, সীমিত কয়েক দণ্ডের পরই বৈধব্য নিশ্চিত জেনেও বিবাহ দিয়ে কুলরক্ষা করতে তখন বাধত না। তাই ঘরে যুবতী বিধবা কন্যার অবস্থিতি একান্ত সহজ ও স্বাভাবিক বলেই ধরে নেওয়া হত। এ সত্ত্বেও পরিণত-বয়স্ক পিতার দ্বিতীয় বার, তৃতীয় বার কি চতুর্থ বার দারপরিগ্রহে লজ্জা ছিল না। কাজেই এক শতাব্দী পূর্বে যে কাল নিজের রুচি, সংস্কার, আচার ও অভ্যাস নিয়ে বর্তমান ছিল তাকেই দীনবন্ধু মূর্তি দিয়েছেন। মূর্তি দিতে গিয়ে নাটকের প্রয়োজনে তিনি কিছু পরিমাণে হাস্যের শুভ্র রঞ্জন অতিরঞ্জনের রূপে ব্যবহার করেছেন এই মাত্র।

নিজের কালের সত্য মূর্তির পটভূমিকায় যে মানুষগুলিকে তিনি এখানে স্থাপন করেছেন তারা সকলেই নিজের কালের পটভূমিতে একান্ত সত্য ও স্পষ্ট; বাস্তবতায় উজ্জ্বল ও মানবিক উত্তাপে উত্তপ্ত। রাজীব মুখুজ্জে, রামমণি. নসিরাম, রতা নাপিত থেকে আরম্ভ করে পেঁচোর মা পর্যন্ত সকলেই একান্তভাবে বাস্তব ও মানবিক স্বাভাবিকতায় স্বাভাবিক। তবে সে মানুষগুলি ভিন্ন কালের. তাদের রুচি ও সংস্কার আমাদের থেকে অনেক পৃথক।

(৫)

তাঁর অন্য তিনখানি নাটক 'সধবার একাদশী', 'লীলাবতী' এবং 'জামাই বারিক' নাটক হিসাবেও শ্রেষ্ঠতর এবং আজও পর্যন্ত তাদের খ্যাতি ম্লান হয় নি। এই নাটকগুলি অল্পবিস্তর নাগরিক স্পর্শযুক্ত এবং এই তিনখানি নাটকেই সামাজিক সমস্যাকে তিনি স্পষ্টতর এবং গভীরতর ভাবে ব্যবহার করতে পেরেছেন। 'সধবার একাদশী'র পটভূমি খাস কলকাতা শহর. 'লীলাবতী'র কলকাতার উপকণ্ঠ শ্রীরামপুর এবং 'জামাই বারিকে'র পটভূমিরও সন্ধান মিলবে কলকাতার উপকণ্ঠেই বা সংলগ্ন কোন স্থানে।

'লীলাবতী' ও 'জামাই বারিকে'র সামাজিক সমস্যা ভিন্ন ভিন্ন মূর্তিতে দেখানো হলেও, আপাতদৃষ্টিতে দুই সমস্যাকে পৃথক মনে হলেও তারা একই মূল সমস্যার ভিন্ন দুই শাখা মাত্র। 'লীলাবতী'তে জমিদার হরবিলাস চট্টোপাধ্যায় কন্যা লীলাবতীর জন্য হাতের কাছে শিক্ষিত ও বাঞ্ছিত পাত্র

ললিতমোহন থাকা সত্ত্বেও কন্যার বিবাহ দেবার জন্য ছুটে ফিরছেন স্থূলচরিত্র, মূর্খ নদের চাঁদের পিছনে পিছনে। কারণ সে এক মহাকুলীনের সন্তান। 'জামাই বারিকে'ও জমিদার বিজয়বল্লভ নিজের কন্যাদের পাত্র সন্ধানের সময় একমাত্র বিবেচ্য বিষয় গণনা করেন কৌলীন্য। সেই অনুসারে বিবাহ দিয়ে জামাতাগুলিকে গৃহে এনে পালন করেন। সংখ্যাতীত জামাতারা শ্বশুরের ও শ্বশুরবাড়ীর পোষ্যরূপে শ্বশুরালয়ে অবস্থান করেন, স্ত্রীর তিরস্কার পরিপাক করেন, কারণ স্ত্রীই সেখানে সত্যকারের ভর্তা।

দীনবন্ধুর যে কালে জন্ম, এবং যখন তিনি নাটক দুটি রচনা করেছিলেন তখন কাল এমনিই ছিল। বহু শতাব্দীর প্রাচীন কৌলীন্য প্রথা তখন অতি প্রাচীন বৃদ্ধের মত জীর্ণ এক জরদ্গবে পরিণত হয়েছে। সেই কালজীর্ণ মৃত্যুপথযাত্রী প্রাচীনের গাত্রগন্ধে তখন পরিবেশ অসহ্য। তার উপর নবযুগের নবীন কাল তার নূতন শিক্ষার অস্ত্র হাতে আবির্ভূত হয়ে তাকে বার বার খোঁচা দিয়ে, আঘাত করে জানিয়ে দিচ্ছে—হে জীর্ণ, প্রাচীন, তুমি মৃত্যুর অপেক্ষা করে আর কেন রয়েছ। তোমার মৃত্যু হোক, তুমি বিগত হও। কিন্তু নবীন কালের প্রতিভূ দীনবন্ধু তাকে নিজের হাতের অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেন নি, শুধু তর্জনী তুলে অসুস্থ বৃদ্ধকে চিহ্নিত করে উচ্চারণ করেছেন— এ প্রাচীন একান্ত জীর্ণ, এর জীর্ণতায় নবীনের ক্ষতি হচ্ছে। এই জীর্ণ বিগত হোক।

এই প্রাচীন কৌলীন্য প্রথার ফলেই যে তখন সমাজের বহু বিবিধ বিকৃত মূর্তি দিকে দিকে প্রকটিত হয়ে নবীন কালের দৃষ্টিতে এক অবাঞ্ছিত বিরূপ অস্তিত্বের মত অবস্থান করছিল এ কথা আজ ঐতিহাসিক সত্য। কৌলীন্যের আসল স্বরূপ ও সে সম্পর্কে ধারণা তখন বিলুপ্ত। বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, অপরিমিত সংখ্যায় অকাল বৈধব্য, অপাত্রে কন্যাদান, গৃহজামাতাপোষণ প্রভৃতির মত ভ্রান্ত আচারে দেশ ও সমাজ তখন অপরিমেয় বিকৃতির আধার হয়ে উঠেছে। এই বিকৃতিকে আঘাতের তখন প্রয়োজন ছিল। দীনবন্ধু আপনার নাটকের মধ্য দিয়ে আপনার কর্তব্যটুকু পালন করতে বিমুখ হন নি। তিনি প্রসন্ন সরসতার সঙ্গে তা সম্পন্ন করেছিলেন। এবং সে কর্তব্য সম্পাদনে শিল্পী ও নাট্যকার হিসাবে তিনি সার্থক হয়েছেন।

তাঁর এই সজাগ ও তীক্ষ্ন সামাজিক বোধ অবশ্যই একদেশদর্শী ছিল না। তিনি প্রাচীনের ভ্রান্তি ও ত্রুটি যেমন দেখেছেন ও দেখিয়েছেন, নবীনের ঔদ্ধত্য ও উন্মার্গগামিতাকেও তিনি তেমনি সমর্থন করেন নি। 'সধবার একাদশী'র নিমচাঁদ আর অটলবিহারী তাঁর তিরস্কার বহন করে আজও বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে নিজের উজ্জ্বলতায় প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। অটলবিহারী এবং নিমচাঁদ

প্রতি কালেই নব নব রূপে জন্ম নেয়, আত্মপ্রকাশ করে, সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলাকে যুগে যুগে বিঘ্নিত ও আবিল করার চেষ্টা করে। নিজের অজ্ঞাতসারেই করে নিজের নিজের বিচিত্র চরিত্রগত ভ্রান্ত বোধ দিয়ে।

'লীলাবতী' ও 'জামাই বারিক' এই দুই নাটকে কাহিনী অতি দ্রুতগতি, স্তরে স্তরে, পর্যায়ে পর্যায়ে নাটকীয় ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অতি চমৎকারভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। 'লীলাবতী' নাটকের শেষাংশে ঘটনা সবিশেষ নাটকীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু তাতে অবাস্তবতার স্পর্শ লেগেছে। 'জামাই বারিকে'র নাটকীয় কাহিনীর বুননও চমৎকার। বরং 'সধবার একাদশী' নাটকের কাহিনীতে দ্রুত চলিষ্ণুতার কিছু ঘাটতি আছে সে অনুপাতে। অথচ রচনা হিসাবে এই তিনখানি নাটকের মধ্যে 'সধবার একাদশী'ই সর্বাধিক উজ্জ্বল।

নাটকগুলির সর্বোৎকৃষ্ট গুণ একাধিক: বাস্তবমুখিনতা, অতি উজ্জ্বল সংলাপ এবং অতি উজ্জ্বল চরিত্র-চিত্রণ। ব্যক্তি মানুষের বিশেষ বিশেষ চারিত্র এবং সমষ্টিগত মানুষের সমবায়ে গঠিত সমাজ, এই দুইয়েরই স্পষ্ট, সঠিক ও সার্বিক পরিচয় দীনবন্ধুর কাছে করামলকবৎ ছিল। সেই কারণে তাঁর নাটকগুলির, বিশেষ করে এই তিনখানি নাটকের পরিকল্পনা, সব সময়ে কালের মূল বৃত্তিকে স্পর্শ করে থেকেছে, মূল কাল-চরিত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয় নি। এবং সেই পটভূমিকায় যে সব মানুষ পাত্র-পাত্রীর মূর্তিতে নাটকের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছে তাদের প্রায় সকলেই যে নাট্যকারের নিজের চোখে-দেখা মানুষ, সেই চোখে-দেখা মানুষগুলি চিত্রণের গুণে একান্ত জীবন্ত হয়ে নাটকের পাটপীঠে আবির্ভূত হয়েছে—এ বুঝতে ভুল হয় না। যাদের আলোকোজ্জ্বল মঞ্চে, দর্শকের দৃষ্টির সম্মুখে দেখছি, তাদের তেমনি অবস্থায় মহানগরী কলকাতা বা তার উপকণ্ঠে প্রায় সেই রকম মূর্তিতেই দেখা পাওয়া যেতে পারত বা দেখা পাওয়া গিয়েছে—এতে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। চরিত্রগুলির সাহচর্যে এলে সেই কথা ও অনুভবই সবচেয়ে বেশী করে বার বার মনে হবে। নদের চাঁদ, হেমচাঁদ, অটলবিহারী কিম্বা নিমচাঁদ সে কালের সকলেরই একান্ত চেনা-পরিচিত মানুষ। এ কালেও তাদের সাহচর্যে এলে অভ্রান্তভাবে মনে হয় তারা দীনবন্ধুর কালে সশরীরে বিরাজমান ছিল। কুলীন সন্তান, অজমূর্খ, প্রায়-বোধহীন, নেশাখোর নদের চাঁদ; স্ত্রী ও সুহৃদের সাহচর্যে পরিবর্তিত, আত্মমার্জনা ও সংস্কারচেষ্ট হেমচাঁদ; ধনীর দুলাল, জননী ও সম্পদের দোষে স্খলিত-চরিত্র অটলবিহারী, "বিশুষ্ক-জীবন-সুখ বিফলীকৃতবিদ্যা, নৈরাশ্যপীড়িত মদ্যপ" নিমচাঁদ শুধু অতি বাস্তব চরিত্রই নয়, তারা নিজের কালের যুগ-লক্ষণের স্বারা চিহ্নিত ও লক্ষণাক্রান্ত। তাদের চিনতে ভুল করার কোন উপায় নাই।

দীনবন্ধু বহু আশ্চর্য বাস্তব চরিত্র সৃষ্টি করে গিয়েছেন। তার মধ্যে 'সধবার একাদশী'র নিমচাঁদ দত্ত বোধ হয় আশ্চর্যতম সৃষ্টি। কয়েক মুহূর্ত পূর্বেই তার সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি উদ্ধৃত করে তার চরিত্রের মর্মলোকের মূল কথা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষাতেই উদ্ঘাটন করেছি। একই সঙ্গে কোন শিল্পীর হাতে এমন বাস্তব ও এমন কবি-কল্পনা-সমন্বিত চরিত্র সৃষ্টি হওয়ার নজীর আমাদের নাট্য-সাহিত্যে খুব বেশী নাই। চরিত্রটি এমন যে নিমচাঁদ দত্তের মত শিক্ষিত, বিবেচনাহীন, ভ্রান্তবুদ্ধি মদ্যপ কলকাতায় সে দিন বহু সংখ্যায় দেখা যেত 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর কল্যাণে। কিন্তু এই চরিত্রের অন্তরমধ্যে যে বিশুষ্কতা, যে নিষ্ফলতা, যে হাহাকার লুকিয়ে ছিল তা সবই তার ওই নেশার ঘোরে প্রকাশিত বৈদগ্ধের অন্তরে অন্তরে প্রতিধ্বনিত। নিমচাঁদ অটলবিহারীর মত ধনীর অর্ধমূর্খ সন্তানকে একান্ত অবহেলার দৃষ্টিতে দেখলেও তার প্রতি তার ঈর্ষারও বোধ হয় অন্ত ছিল না। নিমচাঁদ ভালবাসে নাই, ভালবাসা পায় নাই, তাকে ভালবাসার মানুষ নাই; শিক্ষা তার জীবনে আলো জ্বেলে উত্তাপ দেয় নাই, গৃহদাহী বহ্নি মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছে। অথচ শিক্ষাহীন অটলের জন্য সে দিক দিয়ে ভালবাসার পাথার অপেক্ষা করে আছে। বাস্তব আধারে কবি-কল্পনার আশ্চর্য এক মূর্তিকে সৃষ্টি করেছিলেন দীনবন্ধু নিমচাঁদের মধ্যে। নিমচাঁদ বাংলা নাটকের এক অনন্যসাধারণ, অতি উজ্জ্বল চরিত্ররূপে তাই আজও সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত।

কায়ার অনুগামিনী ছায়ার মত নাটকগুলির ভাষাও বাস্তবধর্মী চরিত্র-গুলির অনুগামী, এবং উজ্জ্বল। সংলাপে সে কালের বাক্-বিন্যাস, রুচি, বৈদগ্ধ, সবই স্পষ্ট মূর্তিতে প্রকাশিত।

নাটকে তিনি স্থানে স্থানে কবিতা ব্যবহার করেছেন। সে অন্যত্র আলোচ্য।

(৬)

দীনবন্ধুর নাটকগুলি পৃথক পৃথকভাবে আলোচিত হল।

এখন একটি প্রশ্ন রয়ে যায়। বাংলা নাট্য-সাহিত্যে দীনবন্ধুর আসল ও স্থায়ী কৃতিত্ব কোথায়? সে কি শুধুমাত্র 'নীল-দর্পণে'র নাট্যকার হিসাবে?

এর উত্তরে পরিষ্কারভাবে, অসঙ্কোচেই বলব—নিশ্চয় নয়। তবে 'নীল-দর্পণে'র যিনি রচয়িতা তাঁর কাছে সমগ্র জাতির, এবং জাতির উত্তরপুরুষের একটি বিশেষ ঋণ আছে—এ কথা মধুসূদনের সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে একবার উচ্চারণ করেছি। সেই কথাই এখানে আবার উচ্চারণ করব। আমাদের

দেশে, আমাদের শাস্ত্রে পিতৃঋণ, গুরুঋণ, ঋষিঋণ প্রভৃতি বহুবিধ ঋণের উল্লেখ আছে। সেই ধরণের কোন একটি ঋণ আমাদের আছে দীনবন্ধুর কাছে। আমি তাকে ঋষিঋণ বলেই উল্লেখ করছি। 'নীল-দর্পণ' রচনার জন্য আমরা, সমগ্র বাঙালী জাতি, তখনকার দিনের বাঙালী জাতির উত্তরপুরুষ হিসাবে দীনবন্ধুর কাছে সেই ঋষিঋণে ঋণী। ইংরেজের যখন অপ্রতিহত শাসনের কাল, সেই কালে তাদের হাতে যখন শুধুমাত্র অত্যাচারিত হওয়াই আমাদের বিধিলিপি ছিল, সেই কালে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত, চাকুরীজীবী এক ভদ্রসন্তান এই অত্যাচার দেখে চুপ করে না থেকে তার প্রতিকার-কল্পনায় কলম ধরে নাটক লিখে এক অতি-বিচিত্র পন্থায় সে অত্যাচার প্রতিরোধের কল্পনা ও প্রয়াসই শুধু করেন নি, সে অত্যাচারের বেগ রুদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন এ কথা আজ স্মরণ করলেও গৌরব বোধ করি। আজ এক শতাব্দী পরে, বার বার এ ঋণ স্বীকারের পরও, সে ঋণ স্বীকারের প্রয়োজন ম্লান হয় নাই। তাই সে ঋণ আবার স্বীকার করছি একান্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে। সেই অতি-পরিচিত প্রবাদ যে 'কলম তরবারির চেয়ে শক্তিধর' তাকে সামান্য পরিবর্তন করে বলি—হাজারটা 'শ্যামচাঁদে'র চেয়ে দীনবন্ধুর একটি কলম বেশী শক্তিধর।

এসব উল্লেখ করেও বলব—'নীল-দর্পণ' রচনা করে নীলকরের বর্বর অত্যাচার রোধ করাই দীনবন্ধুর সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় নয়। তাঁর শ্রেষ্ঠ গৌরব ও শ্রেয়তর স্থায়িত্ব অন্যত্র। কিন্তু সে গৌরবের কথা উল্লেখ করার পূর্বে তাঁর একটি আপেক্ষিক ত্রুটির কথা উল্লেখ করি।

দীনবন্ধুর প্রথম সাহিত্যারম্ভ কবি হিসাবে। তারপর তিনি নাটকের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। কিন্তু জীবনে কখনও কবিতাকে তিনি সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করেন নি। মধুসূদনের মতই তিনি কাব্য ও নাটক উভয় সৃষ্টির ক্ষেত্রেই বিচরণ করেছেন। কিন্তু তাঁদের দুজনের সার্থকতা বিপরীত পথে। মধুসূদনের বিচিত্র ও শ্রেষ্ঠ প্রকাশ কাব্যের পথে, দীনবন্ধুর শ্রেষ্ঠ প্রকাশ নাটকে। 'নীল-দর্পণ' এবং 'বিয়েপাগ্‌লা বুড়ো' এই দুটি নাটক ছাড়া আর সব নাটকেই স্থানে স্থানে, বিশেষত স্ত্রী-পুরুষের প্রণয়-ঘটিত আবেগ ও মনোভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি কবিতার ব্যবহার করেছেন। সে কবিতা কবিতাই, নাটকীয় বাক্যরীতির থেকে তা বহুদূরে। নাটক রচনার সময় সত্যের, স্বভাবিকতার ও বাস্তবের যে উচ্চ ভূমিতে তিনি সর্বদাই অবস্থান করতেন, লোকের মুখের কথা বাদ দিয়ে অতি সংস্কৃত সুললিত ভাষায় অথবা কবিতা ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সেই উচ্চ ভূমি থেকে স্খলিত হয়েছেন। কি ভাষা ও বাক্‌রীতির দিক থেকে, কি ভাবের দিক থেকে।

তাঁর সমকালীন আর দুজন পুরুষের এইখানে উল্লেখ করি, তাঁর চেয়ে

ছ' বছরের জ্যেষ্ঠ মধুসূদনের, এবং তাঁর আট বছরের কনিষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্রের যে তৃতীয় নয়নের দৃষ্টি ছিল সেই অসামান্য কবিদৃষ্টি তাঁর ছিল না। স্রষ্টার তৃতীয় নয়নের যে দৃষ্টি জাগ্রত অবস্থায় উন্মীলিত হলে বস্তুর ও জীবের সত্তার অন্তস্তল পর্যন্ত দেখতে পেয়ে তার বিশেষ সত্য স্বরূপকে আবিষ্কার করে, যা ধ্যানের মুহূর্তে নিমীলিত থেকে সর্ব বস্তু ও জীবের একীভূত রূপকে এবং সমস্ত রূপের অন্তরালে অরূপকে ও তার অভিপ্রায়কে অনুভব করতে পারে দীনবন্ধুর সে দৃষ্টি ছিল না। তবে দীনবন্ধুর তৃতীয় নয়ন না থাকলেও তাঁর মর্ত্যজীবনের বাস্তব দুটি চোখেই তিনি যা দেখেছেন তা পুরোপুরি দেখেছেন, খুঁটিয়ে দেখেছেন; যা দেখেছেন তার সঙ্গে আরও যা যা দেখা না হলে সেই পার্থিব দেখা সম্পূর্ণ হয় না তাও দেখেছেন। এ দিক দিয়ে তিনি অনন্য, এই দেখাতেই তাঁর গৌরবের প্রতিষ্ঠা।

তাঁর নাটকগুলির গর্ভাংক ও অংকের পথ বেয়ে একবার এগিয়ে চলুন। কলকাতা ছেড়ে কিছু দূরে গিয়ে, আম-কাঁঠালের ছায়ায় ছায়ায় একটু এগিয়ে চলুন। স্বরপুরের গোলোক বোসের মস্ত বড় বাড়ীর ভগ্নাবশেষ, কি সাধুচরণের পল্লীগৃহ আপনি দেখতে পাবেন। সেখানে বাইরের দিকে গোলোক বোস বৃদ্ধ মানুষ, চুপচাপ ম্রিয়মান হয়ে বসে আছেন, তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর বড় ছেলে নবীনমাধব। বীর্যবান্, তেজস্বী, বলশালী কিন্তু ম্রিয়মান। সামনে বসে আছে সাধুচরণ, সেও বাক্যহীন, ভয়ার্ত। এই বিষণ্ণ মানুষদের এড়িয়ে বোসেদের অন্দরমহলে গিয়ে প্রবেশ করুন। এ উদ্বেগ হয়তো তখনও বোসেদের অন্দরমহলকে স্পর্শ করে নি। সেখানে তখনও আনন্দের জোয়ার বইছে। সাবিত্রী, সৈরিন্ধ্রী, সরলতার সামনে শ্বশুরগৃহাগত ক্ষেত্রমণিকে নিয়ে তার মা রেবতী দাঁড়িয়ে আছে হাসিমুখে। আদুরী ঝিকে নিয়ে ক্ষেপানো ও রসিকতা এইমাত্র থেমেছে, সকলের মুখের হাসির রেশ তখনও মিলিয়ে যায় নি। আসুন, বোসেদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসুন; চলুন সকল অত্যাচারের উৎসস্থল কুঠিবাড়ীর দিকে; বেগুণবেড়ের কুঠিবাড়ী। পথে যেতে যেতে যাদের দেখলেন তাদের কি চিনতে পারলেন না? ওদের মধ্যে যে তোরাপ আর রাইচরণও ছিল! বেগুণবেড়ের কুঠিবাড়ীর বারান্দায় উঠবেন না, গাছপালার আড়ালে দাঁড়িয়ে আত্মগোপন করে দেখুন। দেখতে পাচ্ছেন প্রৌঢ় উড সাহেব বাপান্ত করে বাংলা, হিন্দী ও ইংরেজী মিশিয়ে দেওয়ান গোপীনাথকে কেমন গালাগাল দিচ্ছে! গোপীনাথ মাথা হেঁট করে, মুখে হাসি বজায় রেখে তেতো মনে তা হজম করছে। কুঠি-বাড়ীর ভিতরে যাবার চেষ্টা না করাই ভাল। কারণ ওখানে শ্যামচাঁদ সাজানো আছে, আর তরুণ রোগ সাহেব হয়তো ক্ষেত্রমণির উপর অত্যাচারের কল্পনা

আটিতে আটিতে মদ্যপান করছে। ওখানকার যা যেমন আছে তেমনি থাকুক, আপনি ওখান থেকে সরে আসুন। ওখানে মারাত্মক দুর্যোগের এক ভয়াল মেঘ ঘনিয়ে উঠছে, ওখানে বজ্রপাত আসন্ন। ওখান থেকে আসুন। তার চেয়ে জীবনের লঘুতর ক্ষেত্রে সরে আসুন। একটু আড়ালে, নেপথ্যে দাঁড়িয়ে দেখুন, বিয়ে-পাগ্‌লা বুড়ো রাজীব মুখুজ্জেকে পাগল করবার জন্য গ্রামের নসিরাম, রতা নাপিত প্রভৃতিরা কেমন সকৌতুক চক্রান্ত করছে। সেই চক্রান্তের সঙ্গে গ্রামের দরিদ্র, অশিক্ষিত পেঁচোর মাকেও তারা জুড়ে দিয়েছে সমস্ত ব্যাপারটাকে আরও সরস, আরও সকৌতুক করে তুলবার জন্য।

এবার ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পল্লী অঞ্চল থেকে ভিন্নতর ক্ষেত্রে সরে আসুন। এখানে একটু রূপকথার রঙ দেওয়া আছে। সেই রঙ ঝেড়ে ফেলে একবার জলধর, মাধব, বিদ্যাভূষণ, রতিকান্ত, বিনায়ক, জগদম্বা, মল্লিকা ও মালতীর দিকে তাকান। রূপকথার যে চিরকালের যৎসামান্য রঙ তাদের গায়ে দেওয়া আছে তার আড়ালে সেই ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের প্রথমাংশের পল্লীবাসী মানুষের সত্য মূর্তিই দেখতে পাবেন।

এবার সরে এসে শহরাঞ্চলে হরবিলাসবাবুর বৈঠকখানায় বসুন। তাঁর কন্যার বিবাহের কথাকে অনুসরণ করে কুলীন পাত্র নদের চাঁদের মামা ভোলানাথবাবুর বৈঠকখানায় আসুন। সেখানে নদের চাঁদ, হেমচাঁদ, শ্রীনাথ, ললিত-মোহন আর সিদ্ধেশ্বরের সাক্ষাৎ মিলবে। সব ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের মানুষ, কিন্তু সবাই সত্য, সবাই একই কালের লোক।

তারপর আসুন কলকাতার ভিতরে। মদ্যপ অটলবিহারী মদ্যপান করে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েছে, আর তার সঙ্গে সমানে মদ্যপান করে চলেছে অটলের ইয়ার। মদ্যে ও ইংরেজী সাহিত্যে তার সমান প্রবল রুচি। সে মদ খায়, মাতাল হয়, কিন্তু জ্ঞান হারায় না, সমানে ইংরেজী কাব্য আবৃত্তি করে যায়। তার নেশাগ্রস্ত চরিত্রের পরিপূর্ণ ও যথার্থ প্রকাশ ঘটে ইংরেজী ভাষায় আবৃত্তির মাধ্যমে। শেষ পর্যন্ত হয়তো তাকে দেখা যাবে ড্রেনের ধারে গড়াগড়ি যাচ্ছে।

এ সবই দীনবন্ধুর দেখা চরিত্র, তাঁর নিজের সমসাময়িক কালের মানুষ, সত্যকারের মানুষ। তারা তাদের ব্যক্তি-স্বভাবের সঙ্গে সঙ্গে নিজের কালের রুচি, সংস্কার, শিক্ষা-দীক্ষার সমস্ত কিছু নিয়েই দীনবন্ধুর তীক্ষ্ণ দুই চোখের আলোয় ধরা পড়েছিল। এবং সেই সত্য ও সম্পূর্ণ মানুষগুলিকে তিনি তাদের সত্য ও সম্পূর্ণ মূর্তিতেই আপনার নাটকগুলিতে উপস্থাপিত করেছেন, করতে পেরেছেন। এবং আধুনিক কালের সাহিত্যে তিনিই সর্ব-প্রথম নিজের সমকালীন বাস্তব মানুষকে বাস্তব মূর্তিতে সাহিত্যে উপ-

স্থাপিত করেছেন। এইখানেই তাঁর প্রধান কৃতিত্ব। এইখানেই দীনবন্ধু আধুনিক সাহিত্যের অন্যতম প্রধান সার্থক রূপকার, অগ্রনায়ক ও পথপ্রদর্শক হয়ে বিরাজ করছেন।

বাস্তবকে তিনি শুধু ভাবেই প্রতিষ্ঠা করেন নি। বাস্তব ভাষার মাধ্যমেই সেই বাস্তব চরিত্রগুলির সার্থক প্রতিষ্ঠা। সেই কারণেই তাঁর ভাষার মূর্তি কিছু পরিমাণ রূঢ়, অমসৃণ ও অলঙ্কারহীন অথচ সরল ও বাহুল্যবর্জিত। তৎকালিক বাংলার কথ্যরীতির এক সত্য সাহিত্যিক মূর্তিকে তিনি বাংলা ভাষায় স্থাপন করে গিয়েছেন। তাই সে ভাষা আজও উজ্জ্বল ও অম্লান। এবং বাংলা ভাষার কথ্যরীতির মূল ধর্ম তার মধ্যে কোন না কোন ভাবে অব্যাহত আছে বলেই তা আজও শক্তি ও লাবণ্যে উজ্জ্বল ও নবীন। এ এমন এক ধরণের নবীনতা যা বেশ কয়েক শতাব্দী পারের কবি চণ্ডীদাসের পদাবলীতে ও দুই শতক পূর্বের কবি রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীতে কালান্তরের ও কাল-পরিবর্তনের পরও অনুভব করা যায়।

ভাব ও রূপ, চরিত্র ও ভাষা এক অপরের সঙ্গে মিলে পার্বতী-পরমেশ্বরের মত একাত্ম যুগল মূর্তিতে তাঁর রচনায় আবির্ভূত হয়ে পরিপূর্ণ বাস্তবকে বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম স্থাপন ও প্রতিষ্ঠা করেছে।

(৭)

দীনবন্ধুর সাহিত্য-কীর্তি সম্পর্কে আমার বক্তব্য শেষ হয়েছে। কিন্তু এই বক্তব্যের পরিপূরক হিসাবে আর যৎসামান্য না বললে দীনবন্ধু সম্পর্কে আমার বক্তব্য সম্পূর্ণ হবে না। সে তাঁর বঙ্গীয় নাট্যশালার উপর প্রভাব। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে যখন বাংলা নাটকের জন্ম হয়েছিল তখন সাধারণত নাট্যকারের প্রত্যক্ষ সহজ দৃষ্টি কাজ করত না, দৃষ্টি যেন নিমীলিত থাকত, কাজ করত শুধু কল্পনা। তার ফলে সাধারণ তৎকালিক মানুষ চরিত্র হয়ে নাটকে আসত না। নাটকের নায়ক-নায়িকা, পাত্র-পাত্রী সব আসত দেবলোক কিম্বা প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজসভা ও রাজ-অন্তঃপুর অথবা মধ্যযুগের ইতিহাসের দিল্লী কি রাজপুতানার প্রাসাদ থেকে। মুখে তাদের ভিন্নতর বিশুদ্ধ আর্ষ ভাষা, অঙ্গে তাদের দেবতার কি রাজা বা রাজপুরুষের মহার্ঘ বেশভূষা ও আভরণ-ভূষণ।

কিন্তু অভিনয়ের সময় অভিনয়ের আয়োজনে এই মহার্ঘ বেশভূষার জন্য যে অর্থব্যয় করতে হত তা যথেষ্ট। এবং সে ব্যয় বহন করে অভিনয়লিপ্সু সাধারণ মানুষের অভিনয়ের ব্যবস্থা করা অসম্ভব ছিল।

নাটকে দেব-দেবী ও রাজা-রাণীর প্রাধান্যের ও প্রাদুর্ভাবের সেই কালে দীনবন্ধুর সাধারণ মানুষকে নিয়ে রচিত নাটক অভিনয়ের এক সহজ সুযোগ এনে দিয়েছিল। সাধারণ মানুষ নাটকের পাত্র-পাত্রী হয়ে মঞ্চে আবির্ভূত হবার সঙ্গে সঙ্গে অভিনয়ের অঙ্গসজ্জা অনেকখানি কমে এল। এর থেকেই, এই সুযোগেই ধীরে ধীরে বাংলা দেশে সাধারণ নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হল। এরই ফলে সখের থিয়েটার কলকাতার সাধারণ রঙ্গালয় 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামে আবির্ভূত হল।

পরবর্তী কালের বাংলা নাট্যমঞ্চের অদ্বিতীয় পুরুষ গিরিশচন্দ্র দীনবন্ধুকে তাঁর 'শাস্তি কি শান্তি' নাটক উৎসর্গ করতে গিয়ে তাঁকে সম্বোধন করেছেন নাট্যগুরু বলে। উৎসর্গ-প্রশস্তির শেষাংশে উল্লেখ করেছেন— "মহাশয়ের নাটক যদি না থাকিত, এই সকল যুবক মিলিয়া 'ন্যাশনাল থিয়েটার' স্থাপন করিতে সাহসী হইত না। সেই নিমিত্ত আপনাকে রঙ্গালয়-স্রষ্টা বলিয়া নমস্কার করি।"

গিরিশচন্দ্রের নমস্কারের সঙ্গে আমার নমস্কারও যুক্ত করি এবং বলি বাংলা নাটকে দীনবন্ধু শুধুমাত্র বাস্তবের প্রথম স্থাপয়িতা ও প্রতিষ্ঠাতাই নন, তিনি বাংলা দেশের সাধারণ নাট্যালয়েরও স্রষ্ঠা। এই যুগল নমস্কার তাঁর প্রাপ্য।



তৃতীয় বক্তৃতা

(৩) গিরিশচন্দ্র ঘোষ

(১)

নবীন কালের বাংলা দেশে সত্যকারের সাহিত্যগুণসম্পন্ন নাটক মধুসূদনের হাতে প্রথম আবির্ভূত হয়েছে ১৮৫৯ সালে আর বাংলা দেশে সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৮৭২ সালে। অর্থাৎ সাহিত্যগুণসম্পন্ন নাটক আবির্ভূত হয়েছে আজ থেকে একশো তেরো বৎসর পূর্বে আর সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার শতাব্দীকাল এই বৎসরেই পূর্ণ হতে চলেছে। শতাব্দীকালের অচ্ছিন্ন যাত্রায় বাংলার নাট্যশালা আজ যেমন পরিপুষ্ট ও পরিণত, বাংলা নাটকও তেমনি এই একশো তেরো বৎসরে বহু দীর্ঘ, বিচিত্র পথ পরিভ্রমণ করে আজ বহুবিচিত্র পরীক্ষা ও নিরীক্ষার মধ্যে নবীন আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজছে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে বহু বহু নাট্যকার আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁদের সৃষ্টি কর্মের দ্বারা বাংলা নাটককে সমৃদ্ধ করার প্রয়াস করেছেন ও করছেন। এ সব মনে রেখেই, এমন কি মহাকবি রবীন্দ্রনাথের মত অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন নাট্যপ্রতিভার কথাও মনে রেখেই বলছি, গিরিশচন্দ্র এই শতাব্দীকালের নাট্য-সাহিত্য ও নাট্য-সংস্কৃতির উত্তম পুরুষ। এই শতাব্দীকালের দীর্ঘ উজ্জ্বল তালিকায় যদি একটি মাত্র নাম এই প্রসঙ্গে উচ্চারণ করার প্রয়োজন হয় তা হলে সর্বপ্রথম গিরিশচন্দ্রের নামই উচ্চারণ করতে হবে।

এর কারণ মাত্র একটি নয়, বহুবিধ। এই দীর্ঘকালের মধ্যে গিরিশচন্দ্রের পরবর্তী এক-আধজন নাট্যকার ছাড়া নাট্যকার হিসাবে গিরিশচন্দ্রকে বুঝবার পটভূমি সম্পূর্ণ পৃথক। সেই পৃথক পটভূমিতে স্থাপন করে নাট্যকার গিরিশচন্দ্রকে বুঝতে হবে। মধুসূদন, দীনবন্ধু, দ্বিজেন্দ্রলাল বা ক্ষীরোদপ্রসাদের মত নাট্যকারের সঙ্গে তাঁর নাট্যকার হিসাবে অনেক প্রভেদ। মধুসূদন ও দীনবন্ধু নাটক রচনা করেছিলেন শুধুমাত্র নাটক রচনা করবার জন্যই; সে সব নাটকের অধিকাংশেরই অভিনয়ের আশা সুদূর ছিল। অন্তত নাট্যশালার প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে তাঁরা নাটক রচনা করেন নি। দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদ রঙ্গমঞ্চের জন্যই নাটক রচনা করেছিলেন; রঙ্গমঞ্চের কথা ভেবেই তাঁরা নাটক রচনা করেছিলেন। কিন্তু নাটক রচনা করেই তাঁদের

কাজ তাঁরা শেষ করেছেন। তার অতিরিক্ত দায়িত্ব তাঁদের বহন করতে হয় নি। এ'রা সকলেই রঙ্গমঞ্চের বাইরের মানুষ। রঙ্গমঞ্চের বাইরে থেকে রঙ্গমঞ্চের খাদ্য পাক করে বাইরে থেকেই রঙ্গমঞ্চের জন্য সে খাদ্য যুগিয়েছেন।

কিন্তু গিরিশচন্দ্রের নাট্যকার-জীবনের কাহিনী এ থেকে স্বতন্ত্র। নাট্যকার-জীবনের প্রারম্ভ থেকে জীবনের অন্তিম কাল পর্যন্ত চৌত্রিশ বৎসরের অধিক কাল (১৮৭৭-১৯১১) তিনি রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম সম্পর্কে জড়িত ছিলেন। তিনি সেখানে শুধুমাত্র নাট্যকারই ছিলেন না, তিনি মঞ্চের অধ্যক্ষ, শিক্ষক ও অন্যতম প্রধান অভিনেতারূপে মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নাটক রচনা করবার সময় শুধুমাত্র বিশুদ্ধ নাটক রচনাই তাঁর একমাত্র কর্ম ছিল না। নাটক রচনা করবার সময় দর্শকের চাহিদা, লাভালাভ থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনীতব্য অংশ সম্পর্কে, এমন কি বিশেষ বিশেষ অভিনেতা-অভিনেত্রী সম্পর্কেও তাঁকে চিন্তা করতে হত। কাজেই নাটক রচনার একই মাপকাঠিতে বিচার করে তাঁর স্থান নির্ণয় করা অবশ্যই চলে; কিন্তু মনে হয়, তাতে গিরিশচন্দ্রকে সঠিকভাবে বিচার করা সহজ ও সঠিক হবে না। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র নাট্যকার, নাট্যমঞ্চের অধ্যক্ষ ও শিক্ষক এবং মঞ্চের প্রধান অভিনেতা—এই সব কিছুর নিশ্চিত একত্র সমাহার। চৌত্রিশ বৎসরের নাট্যকারের জীবনে কম করেও সাতাত্তরখানি নাটক রচনা করেছেন। এর উপরে আছে মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ'-এর নাট্যরূপ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের বেশ কয়েকখানি উপন্যাসের নাট্যরূপ। অর্ধ শতাব্দীর প্রায় তিন-চতুর্থাংশ কাল তিনি বাংলার সাধারণ নাট্যমঞ্চে সম্রাটের প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, নিজের বহুমুখী কর্মের দ্বারা নাট্যমঞ্চকে উজ্জ্বল ও আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই সমসাময়িক কালেই মহাকবি রবীন্দ্রনাথের মত অসামান্য পুরুষের নাটক রচনার ক্ষেত্রেও আবির্ভাব ঘটেছিল। তা সত্ত্বেও বাংলায় সাধারণ রঙ্গমঞ্চে গিরিশচন্দ্রের অপ্রতিহত প্রভাব অব্যাহত ছিল।

(২)

মধুসূদন ও দীনবন্ধুর আবির্ভাবের কাল থেকে গিরিশচন্দ্রের আত্ম-প্রকাশের ব্যবধান বিশ বৎসরের চেয়েও কম। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি ও রচনায় তাঁদের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের কি বিশাল পার্থক্য! দুই শ্রেণীর রচনা দুই আলাদা জাতের। একের সঙ্গে অন্যের বিন্দুমাত্র মিল নেই। এতে বিস্ময় লাগে বৈকি।

এর উত্তর বোধ হয় তাঁদের জন্মকালের মধ্যে নিহিত আছে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রভাবিত যে নবীন কাল তার ধ্বজা-পতাকা নিয়ে, ইয়ং বেঙ্গলকে তার অগ্রবর্তী করে আবির্ভূত হয়েছিল সেই নবীন কালের ফসল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু। আর গিরিশচন্দ্র যখন উত্তর কলকাতায় পথে-ঘাটে খেলা করে কৈশোর অতিবাহন করছেন এবং নিজের অগোচরে তাঁর মধ্যে বিবিধ প্রভাবে গঠন-পেটনের কাজ চলছে তখন সেই কালের বেগ মন্দীভূত হয়ে এসেছে। কালস্রোতে জোয়ারের বদলে আবার ভাঁটার টান ধরেছে। তখন এক 'উজান স্রোতের কাল' সুরু হয়ে গিয়েছে। তখন আবার যুক্তির চেয়ে ভক্তি কালের আধারে প্রবল হয়ে উঠেছে। বাংলা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক হিন্দু-পুনরুত্থানের স্পষ্ট চিহ্ন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মব্যাখ্যার প্রভাব তখন প্রবলভাবে অনুভূত হচ্ছে। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রও তাঁর শেষ জীবনে, এই কালেই রামকৃষ্ণদেবের একান্ত অনুরাগী হয়ে তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

অন্য দিকে তখন ইংরেজী শিক্ষা কলকাতায় বেশ প্রসারিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধুর মত পাশ্চাত্য শিক্ষার তীব্র সুধা যদি তিনি পান করতেন তা হলে কি হত বলা যায় না। কিন্তু অধিকাংশ মধ্যবিত্ত ভদ্রসন্তানের মতই তিনি তৎকালীন ইংরেজী স্কুলে প্রবেশিকা পর্যন্ত পড়েছিলেন—ঐ পর্যন্তই। ইংরেজী শিক্ষা তাঁকে বেশী প্রভাবিত করে নি। তাঁর অগ্রবর্তী প্রজন্মের বহুজনের যেমন ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে এই দেহেই দ্বিতীয় জন্মান্তর হয়েছিল তাঁর তা হয় নি। তাঁর চিত্ত, তাঁর সংস্কার, তাঁর ভাব ও ভাবনা, সব কিছুই এই দেশের চিরায়ত ধারাবাহিক সংস্কৃতির অশেষ উৎস থেকে আপনার প্রাণরস সংগ্রহ করে নিজেকে পরিপুষ্ট ও বিকশিত করেছিল। সোজা ভাষায় বললে বলতে হয় বিবিধ সংস্কৃতি-আন্দোলনের বাইরে বা তার স্পর্শহীন যে বিরাট জনজীবন তিনি তারই একজন ছিলেন। তাদের ভাব, তাদের সংস্কার, তাদের ভাবনা তাঁরও ভাব, সংস্কার ও ভাবনা ছিল। এ কথা ঠিক যে পরবর্তী জীবনে তিনি ইংরেজী সাহিত্য, বিশেষ করে সেক্‌স্‌পীয়রের রচনাবলী অত্যন্ত যত্ন সহকারে পাঠ করেছিলেন। তাঁর অনূদিত 'ম্যাকবেথ' আজও তার উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করছে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। তার শিল্পরূপ তাঁকে মুগ্ধ করেছে, হয়তো কোথাও কোথাও প্রভাবিতও করেছে। কিন্তু তাঁর ভাব-ভাবনা বা সংস্কারে তার বিন্দুমাত্র দাগ পড়ে নি।

গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর আজ প্রায় ষাট বৎসর পার হতে চলেছে। এই ষাট বৎসরের মধ্যে দুটো মহাযুদ্ধ ও একাধিক যুগান্তকারী পরিবর্তন

আমাদের জাতির উপর দিয়ে পার হয়ে গিয়েছে। আজকের বাংলা দেশের সাধারণ মানুষের ভাব-ভাবনা, সংস্কার দিয়ে সে দিনের সাধারণ বাঙালীর চিত্তকে উপলব্ধি করা, এমন কি অনুভব করাও অত্যন্ত কঠিন। সে দিনের বাঙালীর চিত্ত ও সংস্কার তার প্রায় পাঁচ-ছয় শতাব্দী পূর্বেও যেমন ছিল, প্রায় তেমনটিই ছিল। তার মূল চরিত্রে বিশেষ অদল-বদল হয়নি। কয়েক শতাব্দী পূর্বে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রবর্তিত ভক্তিবাদ যুগের পর যুগ ধরে বাঙালীর চিত্তে স্তরের পর স্তর যে ভক্তিকে পলির মত বিছিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, যা বৈষ্ণব বা শাক্ত দুই ধারাতেই এক, তাই বাঙালীর সাংস্কৃতিক প্রাণরস। একজন সাধারণ বাঙালী হিসাবে গিরিশচন্দ্রও এইখান থেকেই তাঁর সমস্ত প্রাণরস সংগ্রহ করেছেন। পরবর্তী কালে, মধ্য যৌবনে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট সান্নিধ্যে এসে, তাঁর স্নেহ ও কৃপা লাভ করে সেই চিরায়ত উৎসের সঙ্গে তাঁর সজ্ঞান সম্পর্ক দৃঢ়তর হয়েছিল। এই কারণেই আপনার জাতীয় সংস্কারের সঙ্গে, জাতীয় চৈতন্যের সঙ্গে এবং জাতীয় রসচেতনা ও রস-সংস্কারের সঙ্গে তিনি সদা যুক্ত ছিলেন। এ যোগ-সূত্র স্থাপন গিরিশচন্দ্রের পক্ষে কোন সজ্ঞান প্রয়াস নয়। তাঁর এ জন্য কোন সজ্ঞান প্রয়াসের প্রয়োজনই ছিল না। কারণ তিনি নিজেই তার অংশসম্ভূত। সেই ভাব ও ভাবনাকে সম্বল করেই তিনি নাট্যকাররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর আসল মূলধনের ভাণ্ডার এইখানে।

(৩)

যে সময়ে গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাব সে সময় কবিগান, কীর্তন, হাফ-আখড়াই, কৃষ্ণযাত্রা ও যাত্রার যথেষ্ট প্রচলন ছিল। জনচিত্ত তার থেকেই আপনার রসের ও আনন্দের খোরাক খুঁজত। অথচ গিরিশচন্দ্রের পূর্ববর্তী নাটকের ক্ষেত্রের দুই উজ্জ্বল পুরুষ, মধুসূদন ও দীনবন্ধু এগুলি যেন দেখেও দেখেন নি। নাটক রচনার সময় মধুসূদন হয় প্রাচীন সংস্কৃত নাটকে নয় ইংরেজী নাটকে আপনার আদর্শ খুঁজেছেন। দীনবন্ধুও আপনার নাটক রচনা করেছেন ইংরেজী নাটকের ছাঁদে। তাঁরা দেশের তৎকালিক অভিনয়-ধারার বা এই জাতীয় আনন্দ পরিবেশনের যে সব মাধ্যম ছিল তার সাহায্যও নেন নি বা তাদের সাহায্য করার কথাও চিন্তা করেন নি। এগুলি তাঁদের ত্রুটি হিসাবে অবশ্যই উল্লেখ করছি না, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষত্ব হিসাবেই এ কথা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে।

কিন্তু গিরিশচন্দ্রের এই মাধ্যমগুলির সঙ্গে অল্প-বিস্তর পরিচয় ছিল।

তাঁর জীবন-কথা থেকে পাওয়া যায় যে পরিণত বয়সেও তাঁর হাফ-আখড়াইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। ভবানীপুরে গিরিশ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে গিরিশচন্দ্র রাধাতন্ত্রের 'প্রকৃতি পূজা' অবলম্বনে 'চাপান' দিলে অপর পক্ষ 'উতোর' দানে অসমর্থ হন। আর একবার বাগবাজারে নন্দলাল বসুর বাড়ীতেও অনুরূপ এক আসরে গিরিশচন্দ্রের পক্ষের জয় হয়।

এ ছাড়া গিরিশচন্দ্রের যাত্রার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক ছিল। তখনকার পৌরাণিক, আখ্যান-নির্ভর, গীতবহুল, রঙ্গ-রসভরা যাত্রা লোকের কাছে বিশেষ আদৃত হত। অথচ এই অভিনয়ে খরচও কম পড়ত। ১৮৬৭ সালে বাগবাজারে যে সখের যাত্রার দল গঠিত হয় সেখানে মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা নাটক' অভিনয়ের জন্য মনোনীত হয়। এই যাত্রার দলে পরবর্তী কালে গিরিশচন্দ্র, ধর্মদাস সুর প্রভৃতিরা এসে যোগ দেন। 'শর্মিষ্ঠা'য় গিরিশচন্দ্র কোন্ ভূমিকায় অভিনয় করেন ঠিক জানা যায় না। পরে দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' অভিনয় করা স্থির হয়। দীনবন্ধু আপনার 'সধবার একাদশী'তে 'প্রস্তাবনা' না দিয়ে যে আধুনিকতা এনেছিলেন, যাত্রায় অভিনয়ের জন্য নির্বাচন করে এবং এর অভিনয়-শিক্ষক হয়ে গিরিশচন্দ্র তার সঙ্গে স্বরচিত প্রস্তাবনা অংশ ও যাত্রার অনুসরণে কয়েকটি সঙ্গীত যুক্ত করেন।

এই ছোট ছোট কথাগুলি উল্লেখের কারণ এই যে, নিজের সমসাময়িক কালে যে সব আনন্দ পরিবেশনের মাধ্যম ছিল তার সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের সহজ যোগ ছিল এবং হৃদয়ের সহজ সম্পর্ক ছিল এই কথা উপস্থাপন করা।

এই তথ্যগুলি নাট্যকার গিরিশচন্দ্রকে বুঝতে গেলে প্রায় অপরিহার্য। এর সঙ্গে আরও কয়েকটি কথা যোগ করতে হবে। থিয়েটারের অভিনয় প্রবর্তনের পূর্বে আমাদের দেশে যে সব মাধ্যম ছিল সেগুলি প্রধানত ভাব-প্রধান। আমাদের দেশে কীর্তনের আসরে বয়স্ক কীর্তনীয়া আজও কিশোরী রাধার হৃদয়-বেদনা সঙ্গীতে প্রকাশ করেন; সে সংগীতে শ্রোতার চোখ অশ্রু-সজল হয়। এই কিছুকাল পূর্বেও কৃষ্ণযাত্রায় দাড়িগোঁফ-কামানো, বিশালকায় পুরুষ মাথায় স্ত্রীলোকের পরচুলা পরে, নাকে গিল্টির ফাঁদি নথ, হাতে রতনচূড়, মাথায় ঝাপটা দিয়ে অলঙ্কৃত হয়ে যখন দীর্ঘ বিলম্বিত লয়ে ভাবাত্মক গান আরম্ভ করত তখন শ্রোতাদের সমস্ত চঞ্চলতা শান্ত হয়ে আসর স্তব্ধ হয়ে যেত। কিন্তু থিয়েটারের অভিনয় তা নয়; তা রূপ-প্রধান। প্রথম জীবনে আমাদের দেশের এই ভাবপ্রধান প্রকাশ-পদ্ধতি দ্বারা গিরিশচন্দ্রের কবিচিত্ত শুধু প্রভাবিত নয়, একান্ত রসস্থ হয়েছিল বলে মনে হয়। তার প্রমাণ তাঁর পৌরাণিক ও চরিত-নাটকগুলির অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে আছে। সে কথা যথাস্থলে আলোচনার বিষয়।

মোট কথা, গিরিশচন্দ্র নাট্যকার হিসাবে আত্মপ্রকাশের সময় দেশের চিরায়ত রস-সংস্কারকেই সঙ্গে নিয়ে আসেন নি, তিনি তাঁর সমসাময়িক কালের প্রচলিত অনুরূপ শিল্পগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাদের ভাব ও ভাবনাকেও সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন, যা তাঁকে নাটক রচনা করতে পরবর্তী জীবনে বিশেষ প্রভাবিত করেছে।

(৪)

নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের মনোধর্মের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ মূর্তি নাট্যকার গিরিশচন্দ্রকে উপস্থাপনের পটভূমিকা হিসাবে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করেছি। এবার গিরিশচন্দ্রের দর্শক সম্পর্কে কিছু বলার প্রয়োজন আছে।

এ প্রসঙ্গ বোধ হয় আর কোনও নাট্যকারের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রয়োজন হবে না। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে হবে। পূর্বেই বলেছি তাঁর পূর্ববর্তী নাট্যকার মধুসূদন বা দীনবন্ধুকে অথবা তাঁর অনুজ নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল বা ক্ষীরোদপ্রসাদকে কখনও নিজেদের দর্শকদের কথা প্রত্যক্ষভাবে ভাবতে হয় নি। কিন্তু গিরিশচন্দ্রকে নাটক রচনা করবার সময় সারাজীবনই তাঁর দর্শকদের কথা ভাবতে হয়েছে। অন্য নাট্যকাররা যেখানে 'ড্রামাটিস্ট' (Dramatist) ছিলেন সেখানে গিরিশচন্দ্র ছিলেন 'প্লে-রাইট' (Play-wright)। নাটক রচনা করবার সময় তাঁকে নাটকের কাহিনী ও চরিত্র ছাড়াও আরও অনেক কিছু ভাবতে হত; এবং সেই সব ভাবনা তাঁর নাটক রচনায় প্রত্যক্ষভাবে ক্রিয়া করত। তাঁকে মঞ্চের মালিকের নিয়োজিত অর্থের কথা ভাবতে হত, একই সঙ্গে আবার তাঁর দর্শকের পকেটের কথাও চিন্তা করতে হত। সেই কারণে তারা কি পছন্দ করে আর কি পছন্দ করে না তাও ভাবতে হত নাটক রচনার সময়। এর উপরে ছিল থিয়েটারে নিযুক্ত অভিনেতা-অভিনেত্রীর দল। নাটকের ভূমিকা সৃষ্টি করবার সময় তাদের মুখ মনে করে কাকে কোন্ বিশেষ ভূমিকায় স্থাপন করা হবে তাও থাকত তাঁর ভাবনার মধ্যে।

কিন্তু সবচেয়ে তাঁকে বেশী করে স্বাভাবিকভাবেই ভাবতে হত তাঁর দর্শকদের কথা। কারণ তারাই তাঁর স্টেজে নিয়মিত অভিনয় দেখে, তারাই পয়সা দেয়, তারাই অভিনয় দেখে তাঁর মঞ্চকে বাঁচিয়ে রাখে।

তখন সমস্ত নাট্যমঞ্চগুলিই স্থাপিত ছিল উত্তর কলকাতায়। প্রধানত সেখানকার মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীই ছিল তাঁর দর্শক। তাদের মন ও রুচির খবর তিনি ভালভাবেই জানতেন ও রাখতেন। তাঁকে সে খবর

রাখতে হত। তাঁর একটা মস্ত সুবিধা ছিল এই যে, তিনি তাঁর বিপুল-সংখ্যক দর্শকমণ্ডলীরই একজন ছিলেন রুচিতে ও রস-সংস্কারে। সেই কারণে এ খবর তিনি সহজেই পেতেন নিজের মন খোঁজ করলেই।

কলকাতায় তখন ধনী ব্যক্তিরা থাকলেও নূতন একটি শ্রেণী বেশ স্পষ্ট-ভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তার নাম মধ্যবিত্ত শ্রেণী। একদিকে ইংরেজী শিক্ষার সুযোগে শিক্ষালাভ করে একটি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মহা-নগরীতে সৃষ্টি হয়েছে, অন্য দিকে গঙ্গার দুই তীরে কল-কারখানার ব্যাপক প্রসার ঘটে সেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপার্জনের ক্ষেত্র রচিত হয়েছে মহানগরীর কেন্দ্রস্থলে। নূতন শিক্ষায় শিক্ষিত এবং মোটামুটি উপার্জনে সচ্ছল এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ই প্রধানত তাঁর নাটকের দর্শক। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন অর্থ উপার্জন। সেই অর্থ সহজেই অল্প ইংরেজী শিখেই উপার্জন করা চলে। ইংরেজী শিক্ষা অফিসের জামা-কাপড়ের মতই কেবলমাত্র জীবনের বহিরঙ্গকে অলংকৃত ও উজ্জ্বল করার জন্য প্রয়োজন। অন্দরমহলে পরা সনাতন আটপৌরে কাপড়-গামছার মত মনের রুচি সেই আবহমান কালের চিরায়ত সংস্কারের। সে মন নাচগান, কাল্পনিক গল্প, পৌরাণিক কাহিনী বা নিজেদের জীবনের বিভিন্ন সমস্যা ও কাহিনী দেখে পরিতৃপ্ত হতে চায়।

তারা যা চায় গিরিশচন্দ্র তাদের তাই দিয়েই পরিতৃপ্ত করেছেন। তিনি তাদের সম্পূর্ণ চিনতেন, তাদের রুচিকে ভালভাবে জানতেন। তাই তারা যা
তাদের সম্পূর্ণ চিনতেন, তাদের রুচিকে ভালভাবে জানতেন। তাই তারা যা
তাই নয়, সেগুলি তারা যেমন ভাবে পরিবেশিত দেখতে চায় তেমনি ভাবেই তিনি পরিবেশন করেছেন।

নিজের সমসাময়িক কালের রুচিকে তিনি পরিপূর্ণ তৃপ্তি দিয়ে গিয়েছেন। যত রকম ভাবে পারেন দিয়ে গিয়েছেন। পরবর্তীকালে তাঁর নাটকগুলি পরবর্তীকালের পাঠক ও দর্শক কি ভাবে, কি চোখে দেখবে তার কথা তিনি একবারও চিন্তা করেন নি। সমসাময়িক কালের রুচি ও প্রয়োজনকে পরিতৃপ্ত করবার জন্য তাঁকে এমন সম্পূর্ণভাবে ব্যাপৃত থাকতে হয়েছিল যে পরবর্তীকালের পরিতৃপ্তির কথা ভাববার অবকাশ তাঁর হয় নি। পরবর্তী কালকে বা চিরকালকে তিনি কতখানি পরিতৃপ্ত করতে পেরেছেন সে পৃথক কথা। সে আলোচনা যথাযথ স্থানে আসবে। কিন্তু নিজের কালকে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত করার এবং পরিতৃপ্তি দানের স্বীকৃতি লাভ করার যুগল সৌভাগ্যই বা কজন শিল্পীর ভাগ্যে ঘটে? এ দুর্লভ সৌভাগ্য গিরিশচন্দ্র লাভ করেছিলেন পরিপূর্ণভাবে—তাই এই কারণেই তিনি অভি-নন্দনের পাত্র।

(৫)

নাট্যকার হিসাবে গিরিশচন্দ্রের জীবন ১৮৭৭ সাল থেকে ১৯১১ সাল, অর্থাৎ চৌত্রিশ বৎসরের স্বল্পাধিক কাল প্রসারিত। এই সময়ের মধ্যে তিনি সাতাত্তরখানি নাটক রচনা করেছেন। এই নাটকের মধ্যে অন্তত চার-পাঁচ শ্রেণীর নাটক আছে। পৌরাণিক নাটক, চরিত-নাটক, সামাজিক নাটক, ঐতিহাসিক নাটক এবং লঘু রসের হাল্কা নাটক। এর মধ্যে পৌরাণিক নাটকের সংখ্যা তাঁর সমগ্র রচনার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। আমার মনে হয়, তাঁর পৌরাণিক নাটকই তাঁর রচনার মধ্যে শ্রেণী হিসাবে বৃহত্তম অংশ। তিনি নিজে বলেছেন—"যাত্রা-কথকতা ও হাফ-আখড়াইয়ের শ্রোতাদের দেখে দেশে নাটক লিখতে হত। সেই দর্শকদের মনোরঞ্জন করতে গেলে পৌরাণিক নাটক ছাড়া আর উপায় কি?" তিনিই আবার স্থানান্তরে আরও জোরের সঙ্গে বলেছেন—"হিন্দুস্থানের মর্মে মর্মে ধর্ম। মর্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্মাশ্রয় করিতে হইবে।"

তাঁর মনোভাব এই উক্তি দুটির মধ্যে একান্ত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত। তিনি যে সময়ে নাটক রচনায় হাত দিয়েছিলেন সেই কাল 'উজান স্রোতের কাল'-ও যেমন, তেমনি বাঙালীর আত্মস্থ হবার কাল হিসাবেও চিহ্নিত। সাহিত্য ও সমাজের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ও অধ্যাত্ম চিন্তা এবং আচরণের ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ যে প্রভাব বিস্তার করছিলেন তাতে ভাবের ও চিন্তার ক্ষেত্রে দ্রুত-ধাবমান বাঙালী সংবিৎ ফিরে পেয়ে স্থির ও সংযত হতে আরম্ভ করেছে। তা সত্ত্বেও জয়ধ্বজা উড়িয়ে যে নূতন ভাবনা, চিন্তা, ভাব ও শিল্পরীতি আমাদের দেশে মহাসমারোহে আসন পেতে বসেছে তার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করা সহজ ছিল না। অথচ গিরিশচন্দ্রের এ সম্পর্কে মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি একান্ত স্পষ্ট ছিল।

তিনি যখন আবির্ভূত হন তখন তাঁর সামনে দুটি নাট্যধারা দুটি স্পষ্ট রেখায় সমান্তরাল পথে প্রবাহিত হয়ে চলেছিল। যদিও একই দেশে, একই শহরে, পাশাপাশি দুটি ধারাতেই নাট্য-সংস্কৃতি প্রবাহিত হয়ে চলেছিল তবু একের থেকে অন্যটির শত যোজন ব্যবধান। প্রথমটি হল চিরায়ত গীতাভিনয়ের ধারা, দ্বিতীয়টি মধুসূদন-দীনবন্ধু প্রবর্তিত নূতন নাটকের ধারা। গিরিশ-চন্দ্র যখন আবির্ভূত হন তখন গীতাভিনয়ের বহুল প্রচলন সত্ত্বেও তা তখনকার ইংরেজী-শিক্ষিত অভিজাত সম্প্রদায়ের নাট্যরসপিপাসাকে পরিতৃপ্ত করতে পারত না; তাঁদের কাছে ইউরোপীয় পদ্ধতির নাটক অনেক বেশী স্বাদু বিবেচিত হত, সেই কারণেই ইউরোপীয় পদ্ধতি অনুমোদিত নাটকের

জনপ্রিয়তা তাঁদের মধ্যে বেড়েই চলেছিল। সেই কারণে এই ধরণের নাটকের জনপ্রিয়তা শিক্ষিত ও অভিজাত সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অথচ এর সঙ্গে জাতীয় চৈতন্য ও জাতীয় রস-প্রেরণার কোন যোগ ছিল না।

গিরিশচন্দ্র নাট্যকার হয়ে আবির্ভূত হলেন, কিন্তু মধুসূদন-দীনবন্ধুর পথে পা বাড়ালেন না। বাঙালীর যা নিজস্ব জাতীয় রস তাই তিনি সর্বপ্রথম পরিবেশন করলেন আপনার রচিত নাটকের মধ্য দিয়ে। তিনিই সর্বপ্রথম দেশীয় রস ও দেশীয় রুচিকে নব কলেবরে মঞ্চে উপস্থাপন করলেন। আজকের পূর্ণ-পাশ্চাত্ত্য-প্রভাবিত নাটক-বিচারের মাপকাঠিতে সমালোচক তাঁর নাটককে যে ভাবেই চিহ্নিত করুন না কেন, সে দিন তিনিই অকুণ্ঠভাবে দেশীয় রস ও রুচিকে সসম্মানে নব কলেবরে উপস্থাপন করেছিলেন। দেশের যা কিছু শ্লাঘ্য, যা কিছু শ্রদ্ধেয়, যাকে দেশের মানুষ হতাদর করতে ও ভুলতে বসেছিল তিনি তাকেই আবার তার শ্রদ্ধা ও শ্লাঘার আসনে বসিয়েছিলেন। এর ফলে একই সঙ্গে শ্রেষ্ঠ দেশীয় সংস্কার ও আবেগগুলির তারে পুনরায় আঘাত করে দর্শকদের চিত্তে সেই সংস্কার ও আবেগকে পুনঃস্থাপনই শুধু করেন নি, বাঙালীর রস-সংস্কার অনুযায়ী যা শ্রেষ্ঠ ও যা শ্লাঘ্য তাই আপনার নাটকাভিনয়ের মাধ্যমে তাকে ফিরিয়ে দিয়ে সেই কালে বাঙালীকে আত্মস্থ হতেও সহায়তা করেছিলেন। সে সব ভাব, আদর্শ ও আবেগ নূতন কালের প্রবল সংঘাতে বাঙালীর কাছে অশ্রদ্ধেয় ও অপরিচিত হয়ে এসেছিল ও আসছিল; সে সবের মালিন্য মুক্ত করে আবার তাদের বাঙালীর হৃদয়ে উদ্ধার-করা লুপ্ত রত্নের মত তিনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

আরও একটু আছে। এই পথেই তিনি প্রাচীন গীতাভিনয় ও যাত্রাভিনয়ের ধারাকে নবীন কালের নাটকের ধারার সঙ্গে অবলীলাক্রমে মিশিয়ে দিয়েছিলেন, দিতে পেরেছিলেন। যে দুই ধারা সমান্তরালভাবে একের থেকে অন্যে শত যোজন দূরে প্রবাহিত হচ্ছিল সেই দুইকে এক করে তিনি আপনার নাটকের মধ্যে মিশিয়ে দিতে পেরেছিলেন। দুইয়ের কোনটিই তাঁর দ্বারা পরিত্যক্ত হয় নি। দুইকেই গ্রহণ ও মিশ্রিত করে তিনি তাদের আপনার নাটকে গ্রহণ করেছিলেন। তৎকালীন বিবিধ পন্থার সমীকরণের পথে জাতির হৃদয়ের গভীরে যে রস-সংস্কার ও রস-চেতনা প্রবাহিত তাকেই তিনি সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি দিতে পেরেছিলেন। পেরেছিলেন বলেই তিনি আমাদের জাতীয় নাট্যকার হিসাবে সম্মান দাবী করতে পারেন। তাঁর সহস্র ত্রুটি সত্ত্বেও তিনি আমাদের প্রথম জাতীয় নাট্যকার।

(৬)

গিরিশচন্দ্রকে আমাদের প্রথম জাতীয় নাট্যকার বলে যে অভিহিত করলাম তার যথার্থ উত্তর মিলবে তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে। নবীন কালের নাট্যশিল্প ও নাট্যকলা প্রচারের যা উপযুক্ত বাহন তা তখন নাট্যমঞ্চ; নাট্যমঞ্চ তখন যাত্রার স্থান অধিকার করেছে। নাট্যমঞ্চের জন্য নাট্যশিল্পের চলিত পদ্ধতি সম্পূর্ণ গ্রহণ করেও চিরায়ত দেশীয় যাত্রাভিনয়ের কিছু কিছু তার মধ্যে তিনি যত স্বচ্ছন্দে তত অসঙ্কোচে মিশিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর নাটকে, যত্রতত্র না হোক. বহুস্থলে সঙ্গীতের আধিক্য থেকে তা খানিকটা স্পষ্টভাবেই অনুমান করা যায়।

আমার বক্তব্য এই যে. দেশের মানুষ দেশের চলিত যে সংস্কৃতির ধারা থেকে বরাবর পান করে তৃপ্তি পেয়ে আসছে তা কোন কারণেই বর্জনীয় নয়, সর্বথা গ্রহণীয়—এই কথাই তিনি মনে করতেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর একমাত্র তুলনাস্থল মহাকবি রবীন্দ্রনাথ। যখন তাঁদের পূর্ববর্তীরা বা সমসাময়িকরা শিল্পবস্তুর সন্ধানে সমসাময়িক কালের হৃদয়ে পছন্দমত শিল্প-সামগ্রী খুঁজে না পেয়ে সুদূর উজ্জ্বল অতীতে বা ভিন্নতর পটভূমিতে উপাদানের সন্ধান করেছেন তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁর হাতের কাছেই একান্ত অবহেলায় অনাদৃত. উপেক্ষিত সুর ও ভাব নিয়ে অত্যাশ্চর্য সঙ্গীত রচনা করেছেন, তার তুলনা খানিকটা গিরিশচন্দ্রের মধ্যেই পাওয়া যাবে। জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি সুগভীর মমতা ও শ্রদ্ধা থেকেই এই দৃষ্টি ও এই প্রবৃত্তির জন্ম।

অবশ্য গিরিশচন্দ্রের পূর্ণ আবির্ভাবের পূর্বেই মধুসূদনের কবিকল্পনা রামায়ণের চরিত্রে নূতন ব্যাখ্যা সংযোজন করে নূতন রাম ও নূতন রাবণ সৃষ্টি করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কৃষ্ণচরিত্রে এক নূতন শ্রীকৃষ্ণকে উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু সেই ভাব-বিগ্রহগুলির নূতন কল্পনার সঙ্গে বাঙালী-হৃদয়ের চিরাচরিত পোষিত কল্পনার তফাৎ ছিল। বাঙালীর হৃদয়ে পুরাণের পুরুষগুলির যে মূর্তি. যে ব্যঞ্জনা, যে পরিচয়, অত্যন্ত পরিচিত সেই মূর্তি ও সেই পরিচয়কেই গিরিশচন্দ্র আপনার নাটকে উপস্থাপন করেছেন। মূল পৌরাণিক চরিত্রগুলি পরিকল্পনা করার সময় তিনি একান্ত সহজে, একান্ত অকুণ্ঠভাবে চলিত জাতীয় আদর্শকেই গ্রহণ করেছেন। সেই কারণেই তিনি বাল্মীকি বা বেদব্যাসের দ্বারস্থ হন নি। তার পরিবর্তে যাঁরা চিরকাল বাঙালীর হৃদয়ক্ষেত্র সরস রেখে এসেছেন সেই কৃত্তিবাস, সেই কাশীরাম দাস, সেই মুকুন্দরাম-ভারতচন্দ্রেরই দ্বারস্থ হয়েছেন। তিনি নূতনত্বের প্রলোভনে

তাঁর দুই পূর্বসূরী মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের পথ থেকে সরে গিয়ে স্বদেশবাসীর একান্ত পরিচিত, সহজ পথই গ্রহণ করেছিলেন।

চিরাচরিত, অত্যন্ত পরিচিত পথ,—যে পথে বিস্ময় নেই, নূতনত্ব নেই—সেই চেনা, অতি-চেনা পথই গ্রহণ করবার শক্তি তিনি কোথা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন সন্ধান করলেই গিরিশচন্দ্রের শিল্পদৃষ্টির চাবিকাঠিটিরও বোধ হয় সন্ধান পাওয়া যাবে।

একথা অবিসংবাদী সত্য যে গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকে বাংলার সংস্কৃতির ও বাঙালী হৃদয়ের একান্ত গভীরে বহমান প্রাণরসের সদাস্পর্শ লাভ করা যায়। গিরিশচন্দ্র স্বাভাবিক শিল্পশক্তির বলে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, তিনি তাঁর দর্শককে যা পরিবেশন করতে চান, যে আধারে তা পরিবেশন করলে পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গেই দর্শক পরিপূর্ণ হৃদয়ে তা গ্রহণ করবে, সে আধার তাঁর দর্শকের জন্য ব্যাস-বাল্মীকির মহাগ্রন্থে নেই, তা আছে তারই বাংলা সংস্করণ কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, ভারতচন্দ্র ও মুকুন্দরামে। কারণ ভারতীয় পুরাণ ও বাঙালীর পুরাণে পার্থক্য আছে। বাংলার পুরাণ বাংলার নিজের মাটিতে নিজের প্রাণরসে সঞ্জীবিত, তার বিশেষ এক বাঙালী মূর্তি আছে। বাঙালী দর্শককে আকর্ষণ করতে হলে বাঙালীর সেই একান্ত পরিচিত পথেরই আশ্রয় নিতে হবে।

তাঁর সমস্ত পৌরাণিক নাটকগুলি অন্বেষণ করলে দেখা যাবে, পরিবেশনের মূল বিষয় হল ভক্তি। বাংলা সংস্কৃতির ও বাংলার সাধনার শ্রেষ্ঠ সামগ্রী এই ভক্তি। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কাল থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীতে গিরিশচন্দ্রের সমসাময়িক কালে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যেও এই ভক্তির সাধনা, ভক্তির চর্চা। গিরিশচন্দ্র উপলব্ধি করেছিলেন বাংলা সংস্কৃতির একান্ত বিশিষ্ট এবং একান্ত সহজ সাধনার ধন এই ভক্তির আস্বাদকেই তাঁর নাটকের মূল আরাধ্য বিষয় করে বাঙালীর একান্ত পরিচিত পুরাণকথার মাধ্যমে দর্শকের হৃদয়ের অন্তঃপুরে তাকে পাঠালে সে একান্ত বড় পরিচিত কন্যার মতই অনিবার্যভাবে পরম সমাদরের সঙ্গে গৃহীত হবে।

সেখানে তাঁর ভুল হয় নি। তাঁর স্থির লক্ষ্য অভ্রান্তভাবে সার্থক হয়েছিল। তাঁর বিশখানির উপর পৌরাণিক নাটক তার উজ্জ্বল প্রমাণ বহন করছে। তাঁর ভাগ্যগুণেই—তাকে ভাগ্য ছাড়া আর কি বলব—সেই ভাগ্যগুণেই তাঁর লক্ষ্য আরও প্রবলতর হয়ে উঠেছিল তাঁর জীবনে, শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্য পেয়ে। বাঙালীর পুরাণকথার মাধ্যমে ভক্তির প্রচার করে তিনি যা করছিলেন তা যে ঠিকই করছিলেন এই সান্নিধ্য লাভের ফলে লব্ধ প্রত্যয় থেকে তাতে তিনি আরও জোর পেয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ

ঘটে ১৮৮৪ সালে। ততদিনে তিনি কম-বেশী পঁচিশ-ছাব্বিশখানি নাটক রচনা করেছেন, সেগুলির অভিনয়ও সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে অন্তত পনেরো-ষোলখানি নাটকে পুরাণকথা অথবা মহাজীবনের কথা বিবৃত হয়েছে, যার মূলে আছে ওই ভক্তি। পরবর্তী জীবনেও তাঁর কর্মের এক বিশিষ্ট অংশ জুড়ে ওই একই পবিত্র কর্তব্যের দায়িত্ব-পালন লিপিবদ্ধ রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে তাঁর দুখানি নাটকের আলোচনা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 'জনা' অথবা 'পাণ্ডব-গৌরবে'র কথাই ধরুন। দুটি নাটকই নাট্যকারের সৃষ্টি-শক্তির উজ্জ্বল স্বাক্ষরে ভাস্বর। দুই নাটকেই শ্রীকৃষ্ণ নাটকের পাত্র হিসাবে উপস্থিত। ইনি বেদব্যাসের শ্রীকৃষ্ণ নন, ইনি বাঙালীর অতি পরিচিত, বাঙালীর দ্বারা বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে চর্চিত ও অর্চিত শ্রীকৃষ্ণ, যিনি ভক্তাধীন, যিনি ভক্তের দুয়ারে ভক্তির ডোরে বন্ধ। তাঁর পরম ভক্ত পাণ্ডবদের বিঘ্ন দূর করতে এবং মান বাড়াতে সর্বদা তিনি উদ্‌গ্রীব। এই কারণেই তিনি 'জনা'য় দেবমায়া সৃষ্টি করেছেন প্রবীরের পতনের জন্য, এই কারণেই তিনি 'পাণ্ডব গৌরবে' ভীমের বৈরিতা পরমানন্দে আস্বাদ করে সকৌতুক গাম্ভীর্যে ও কপট ক্রোধে কপট যুদ্ধের জাল পেতেছেন। এখানে 'জনা'র নীলধ্বজ বা বিদূষক চরিত্র দুটির মধ্যে আমাদের দেশের একান্ত পরিচিত ভক্ত-মূর্তির সাক্ষাৎ মেলে। তাকে চিনতে, আজ বিলম্ব হবে কি না জানি না, অন্তত সেদিন দর্শকের বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় নি। সাক্ষাৎমাত্র তাদের মধ্যে স্পষ্টভাবে বাঙালী নিজের হৃদয় ও চরিত্রের মূর্তি দেখতে পেয়েছিল। 'পাণ্ডব গৌরবে' ভীমের চরিত্র আরও প্রগাঢ় ভক্তির রঙে রঙীন, রসে রসসিক্ত। সেখানে ভীম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে নিজের অচলা ভক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত ধর্মকে অবলম্বন করেই শ্রীকৃষ্ণের বিরোধী হয়েছেন এইটিই নাট্যকার দেখাতে চেয়েছেন। কৃষ্ণভক্তিই তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের বিরোধিতা করতে পরামর্শ দিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিরোধে ভীম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিকেই আশ্রয় করেছেন। এইখানেই গিরিশচন্দ্র ঈশ্বরভক্তির চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। এই কারণেই 'পাণ্ডব গৌরবে' ভীম চরিত্রটির পরিকল্পনা অভিনব এবং অত্যন্ত কবিকল্পনাসম্মত। 'জনা'য় বিদূষকের চরিত্রটিতেও অনুরূপ কবিকল্পনার সৌন্দর্য আছে। সেখানে বিদূষক মুখে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবহেলা ও ভয় প্রকাশের মাধ্যমে অর্ধ-কৌতুকের মধ্যে তার ভক্তিকে পরম হৃদ্য ও উপভোগ্য করে প্রকাশ করেছেন।

এই প্রসঙ্গে তাঁর চরিত্র চিত্রণের, বিশেষ করে পৌরাণিক নাটকে চরিত্র চিত্রণ সম্পর্কে কিছু বলার প্রয়োজন আছে। বাঙালীর পরিচিত, চেনা-জানা ও তার সহজ-আবেগগ্রাহ্য কাহিনী তিনি পুরাণ থেকে বেছে নিতেন। তারপর যে যে রস বাঙালী ভালবাসে সেই সেই রসের সঙ্গে ভক্তির মধুর রস মিশিয়ে

পাক করে নাটকের কাহিনী ও চরিত্র বিন্যাস করতেন। তার ফলে পরিচিত কাহিনীর মধ্যে যে সব চরিত্র খেলা করত তারা বাঙালীর কল্পনার চেনা-জানা চরিত্রই শুধু নয়, তারা বাঙালীর পছন্দসই চরিত্রও। আবার কখনও কখনও তাদের কারও কারও অন্তরে মহৎ কবিত্বের স্পর্শ লাগত। তার ফলে সেই পরিচিত কাহিনীর আবেষ্টনীর মধ্যেই আশ্চর্য ঐশ্বর্য নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে কোন কোন চরিত্র। 'জনা' এবং 'পান্ডব গৌরবে'র কথা উল্লেখ করেছি। তাদের কথাই বলি। 'জনা'য় জনা এবং 'পান্ডব গৌরবে' ভীম এমনি আশ্চর্য বৈচিত্র্য নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। নাটকের সৌন্দর্যকে তারা অনেক বাড়িয়েছে এ কথা বলাই বাহুল্য।

(৭)

যদিও পৃথকভাবে চিহ্নিত করে উল্লেখ করছি, তবু প্রথমেই এ কথা স্বীকার করে নিতে হবে যে তাঁর চরিত-নাটকগুলি তাঁর পৌরাণিক নাটক-গুলির সমশ্রেণীর। সমশ্রেণীর চেয়ে এক শ্রেণীর বললেই তাদের সম্পর্কে সঠিক বলা হয়। তাঁর চরিত-নাটকগুলিও তাঁর পৌরাণিক নাটকের সঙ্গে একশ্রেণীভুক্ত। তবে তফাৎ এই যে পৌরাণিক নাটকগুলি বাঙালীর মানসচারী পুরাণ-কাহিনী থেকে সংগৃহীত, আর চরিত-নাটকগুলির কাহিনী ইতিহাসের বাস্তব মানুষের জীবনের অনুসরণে রচিত। তিনি যে সব মানুষকে নায়ক করে চরিত-নাটক রচনা করেছেন তাঁরা বাস্তবে কেমন ছিলেন, তাঁদের বাস্তব ঐতিহাসিক মূর্তি ও চরিত্র কেমন ছিল তা নিয়ে তাঁর কোন মাথাব্যথাও ছিল না, তিনি তাঁদের সে ভাবে আঁকতেও চান নি, আঁকেনও নি। তিনি যে সব ঐতিহাসিক চরিত্রকে নায়ক করে নাটক রচনা করেছেন তাঁরা প্রায় সকলেই অবতার-কল্প পুরুষ এবং সকলেরই চরিত্র ভগবদ্‌ভক্তির সুপবিত্র ও সুউচ্চ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। গিরিশচন্দ্র তাঁদের চরিত্রের সেই লক্ষণটিকেই মূল বলে ধরে নিয়ে তাঁর নাটকের কাহিনী রচনা করেছেন। এবং কাহিনী রচনা করবার সময় পৌরাণিক নাটকের ছাঁচে ফেলেই নাটকগুলি রচনা করেছেন। তাঁর পৌরাণিক নাটকে ও চরিত-নাটকে তফাৎ খুব বেশী কিছু নেই। কেবল পৌরাণিক নাটকে পাত্রপাত্রীগুলির নাম যেখানে সর্বৈব কাল্পনিক, চরিত-নাটকে অধিকাংশ পাত্রপাত্রীর নাম বাস্তব ইতিহাসের। কিন্তু ঐ পর্যন্তই।

অন্যভাবে বললে বলতে হয় তিনি তাঁর চরিত-নাটকগুলিকে পৌরাণিক নাটক হিসাবেই রচনা করেছেন। অবতার বা অবতারকল্প পুরুষগুলিকে

নিয়ে নাটক রচনার সময় পৌরাণিক নাটক রচনার রীতিই প্রয়োগ করেছেন। সে জগৎ বাস্তব ঘটনা বা ইতিহাসের জগৎ নয়; তার সম্পূর্ণটাই ভাবের জগৎ। তাই সেখানে পুরাণের স্বর্গ আর ভাবের পৃথিবীতে এক মুহূর্তে সেতু রচনা করে দেওয়া হয়েছে। স্বর্গের দেবতা মর্ত্যের ভার ও বেদনা লাঘব করবার জন্য পৃথিবীর মানুষ হয়ে নেমে আসছেন। সেই ভাবের ও কল্পনার পথ বেয়ে দেবতা নেমে এলেন মর্ত্যে মানুষের মূর্তি ধরে। মানুষের স্বভাবের পথে মানুষের সব দুঃখ, সব ক্লেশ বরণ করে, মানুষ যা হতে চায়, ছুঁতে চায় অথচ হতে পারে না, ছুঁতে পারে না, এই মানুষের দেহ নিয়েই তাঁরা সেই দেবত্বে উপনীত হন। তারপর মানুষের দেহে-মনে মানুষের হাত দিয়েই সেই দেবত্বের সর্বদুঃখহর স্পর্শ দান করেন। মানুষের পার্থিব দুঃখ দূর হয়, মনের বেদনা ও গ্লানি অপনোদিত হয়, মানুষ তার বাঞ্ছিত দিব্য জীবন লাভ করে।

উদাহরণ স্বরূপ তাঁর রচিত 'বুদ্ধদেব চরিত' নাটকখানিই ধরুন। স্বর্গে বিষ্ণুর বুদ্ধরূপে জন্মের প্রতিশ্রুতি দিয়ে কাহিনীর আরম্ভ, তার সমাপ্তি বুদ্ধত্ব লাভের পর সন্ন্যাসের মাধ্যমে বোধি বিতরণের বাঞ্ছিত কর্মে।

পৌরাণিক নাটকে কাল্পনিক কাহিনী কাল্পনিক বলে মেনে নিতে দর্শক আপত্তি করে নি; আপত্তি করবে না তা ধরা কথা। কিন্তু বাস্তব ইতিহাসের কাহিনীকে কাল্পনিক ভাবের মূর্তিতে পরিবেশন করতেও তিনি দ্বিধা করেন নি। এই সব মহাজীবনের কাহিনী নাটকের মারফৎ পরিবেশন তিনি যে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে করছেন সে উদ্দেশ্যকে গোপন করার বিন্দুমাত্র মনোভাব তাঁর ছিল না। সেই সেই মহাজীবনগুলিতে যে মহৎ ভাব, যে মহৎ আদর্শ, যে মহৎ প্রয়াস উদ্ভাসিত হয়েছে তাকেই প্রকাশ করা তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল বলেই তিনি মহাপুরুষদের বাস্তব জীবনের চেয়ে, বাস্তব জীবনের অন্তরালে প্রবহমান ভাবজীবনকেই তিনি অধিকতর প্রকাশযোগ্য বলে বিবেচনা করেছেন। তাঁর এ সহজ সরল অকপট প্রয়াস সত্যই প্রশংসার ও শ্রদ্ধার যোগ্য।

তিনি প্রথম জীবনে যেমন বহুল পরিমাণে পৌরাণিক নাটক রচনা করেছেন পরিণত জীবনে তেমনি অধিক পরিমাণে চরিত-নাটক লিখেছেন। সমগ্র নাট্যকার-জীবনে তিনি কম-বেশী দশখানি চরিত-নাটক রচনা করেছেন। এবং জীবনের শেষ লগ্নেও যা রচনা করেছেন তার একটি প্রধান অংশ চরিত-নাটক। 'শঙ্করাচার্য' ও 'অশোক' তাঁর একেবারে প্রায় সর্বশেষ রচনা। চরিত-নাটকের সামাজিক উপযোগিতা সম্পর্কে তাঁর অসংশয় প্রত্যয়ের কথা এই তথ্য থেকেই অনুমান করা যায়।

(৮)

সামাজিক নাটকেও গিরিশচন্দ্রের কৃতিত্ব কম নয়।

বলতে গেলে প্রতিষ্ঠিত ও খ্যাতিমান্ নাট্যকারদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম তাঁর যারা দর্শক তাদেরই কাউকে কাউকে নায়ক-নায়িকা করে মঞ্চে উপস্থাপিত করেছেন। 'প্রফুল্ল' নাটকের যোগেশ, সুরেশ অথবা প্রফুল্ল কিম্বা 'বলিদান' নাটকের করুণাময় যে তাঁর দর্শকদের মধ্যে একাধিক থাকত এ কথা হলপ করে বলা চলে।

কিন্তু সামাজিক নাটকের নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকগুলির যথার্থ মূল্য বুঝতে গেলে আর একবার তাঁর মানস-চরিত্র ও পটভূমির দিকে ফিরে তাকাতে হবে। আমরা আজ যাকে বাস্তবতা বলে শিল্পে সাহিত্যে গ্রহণ করেছি গিরিশচন্দ্রের কাছে বাস্তবতার সে অর্থ ছিল না। শুধু গিরিশ-চন্দ্র কেন, হয়তো তৎকালিক ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত উজ্জ্বল শিক্ষিত সমাজের পাশে, দেশের সনাতন সংস্কৃতিধারায় পুষ্ট, দেশের অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল অতি বৃহৎ অংশও তা মনে করত না। তারা এবং সেই সঙ্গে তাদের নাট্যকার গিরিশচন্দ্রও বস্তুর, ঘটনার ও চরিত্রের দৃশ্যমান প্রত্যক্ষ স্বরূপের বাস্তবতার চেয়ে তাদের যা অন্তরবস্তু সেই ভাবরূপকেই বাস্তব বলে গ্রহণ করতেন। তদুপরি তাঁর সমস্ত নাটকেই কম-বেশী কিছু বক্তব্য প্রচ্ছন্ন থাকত। সে তাঁর পৌরাণিক নাটক, চরিত-নাটক, সামাজিক নাটক বা ঐতিহাসিক নাটক,—সব নাটক সম্পর্কেই অল্প-বিস্তর খাটে। কেবলমাত্র প্রহসন ও পঞ্চরঙগুলি এর পরিধির বাইরে।

আর তাঁর সামাজিক নাটকের চরিত্র ও ঘটনা তিনি, অন্য আর পাঁচজন শিল্পীর মতই, নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে, দেখা চরিত্র ও ঘটনা থেকেই সংগ্রহ করেছেন স্বাভাবিকভাবেই। অথচ গিরিশচন্দ্রের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র ছিল, অত্যন্ত সবিনয়েই বলছি, বড় সংকীর্ণ। উত্তর কলকাতার সদ্য-উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণী, যারা জীবনের দু নৌকোয় পা দিয়ে চলে, চলতে হয়, এবং সেই সঙ্গে কিছু শিক্ষাহীন, সংস্কৃতিহীন অর্থবান্‌কে দেখেছিলেন। তাদের নিয়েই তাঁর সামাজিক নাটকগুলির পাদপীঠ তিনি সজ্জিত করেছেন। চিরায়ত সংস্কৃতির প্রাচীন মূল্যবোধ তখন তাদের মধ্য থেকে অপসৃত, আত্মপরতন্ত্রতায় সমাজের বৃহৎ অংশ তখন আচ্ছন্ন। কালের আঘাতে অর্থহীন অথচ স্থাণু আচারের ও সংস্কারের প্রহারে সমাজদেহ তখন জর্জর। তার ফলে চারিপাশে তিনি বিপুল এক অবক্ষয়, জীর্ণতা ও বেদনাকেই লক্ষ্য করেছেন। এরই প্রকাশ ঘটেছে নাটকীয় চরিত্র ও ঘটনাগুলির মধ্যে। এর প্রকাশ ঘটেছে বিবিধ

নাটকীয় চরিত্রগুলির কদাচারের মধ্যে। জাল-জালিয়াতি, খুন-জখম, মিথ্যা-অসততা, পীড়ন-আত্মহত্যায় তাঁর বিয়োগান্ত নাটকগুলি ভারাক্রান্ত।

কিন্তু, যে সত্যদৃষ্টি ও কবিদৃষ্টি থাকলে বস্তু, ঘটনা বা মানব-চরিত্র ও মানব-নিয়তি সম্পর্কে প্রায়-নির্ভুল সিদ্ধান্ত করামলকবৎ শিল্পীর সহজ আয়ত্তে থাকে তা গিরিশচন্দ্রের নাট্যকার হিসাবে বহুবিধ গুণ সত্ত্বেও বোধ হয় আয়ত্তে ছিল না। এর জন্য তাঁকে অভিযোগ করে লাভ নেই। তবে ছিল না বলেই চরিত্রগুলির গায়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেশী রঙ পড়েছে; অথচ অনেক চড়া রঙে রঙীন হয়েও তারা সত্যমূর্তি লাভ করতে পারে নি।

এ সবের উপরে আবার তিনি তাঁর সামাজিক নাটকে প্রায়শ সমস্যা উপস্থাপন করেছেন। তার ফলে তারা আরও ভারাক্রান্ত হয়েছে। তাঁর 'বলিদান', 'শাস্তি কি শান্তি' প্রভৃতি নাটক সমস্যার পটভূমিতেই রচিত। বরং সে দিক দিয়ে তাঁর অতি-পরিচিত নাটক 'প্রফুল্ল' কম ভারাক্রান্ত। তৎকালীন কলকাতার একান্নবর্তী, মধ্যবিত্ত পরিবারের একটি স্পষ্ট ছবি এ থেকে অনুমান করা যায়।

কিন্তু চরিত্রের গায়ে রঙ বেশী পড়ত বলে করুণ অতি সকরুণ হয়েছে, সাধারণ দুষ্টবুদ্ধি ও স্বার্থপর মানুষ পাষণ্ডে রূপান্তরিত হয়েছে, ছোট অন্যায়কে নাটকের প্রয়োজনে মহাপাতকে পরিণত করতে হয়েছে। সসংকোচে বলি, মানব-চরিত্র সম্পর্কে গভীরতর কবিদৃষ্টির অধিকার থাকলে হয়তো এমনটি ঘটত না। মানুষ দোষে-গুণে, ন্যায়ে-অন্যায়ে মানুষ হয়েই দেখা দিত।

এ সব সত্ত্বেও একটি আশ্চর্য অভিজ্ঞতা লাভ হয় তাঁর সামাজিক নাটক-গুলি থেকে। এটি হয়তো সজ্ঞানকৃত কর্ম নয়। তাঁর মধ্যে মহৎ শিল্পীর ধাতু ছিল বলেই তা বোধ হয় সম্ভব হয়েছে। তাঁর সামাজিক নাটকগুলিতে দেখা যাবে কিছু মানুষ পারিপার্শ্বিক ঘটনা অথবা সামাজিক সংস্কার অথবা ব্যক্তিবিশেষের প্রতারণা কি পীড়নে মারাত্মকভাবে পীড়িত হয়েছে। তারা হয়তো বিলাপ করেছে, হয়তো প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করেছে; কিন্তু তারা কখনও মানবধর্মবিরোধী কাজ করে তার থেকে পরিত্রাণের পথ খোঁজে নি। সাধারণ মানুষের মধ্যে এই আশ্চর্য সহনশক্তিকে এবং সাধারণ মানবিক গুণ-গুলিকে রক্ষা করবার শক্তিকে প্রকাশিত করে গিরিশচন্দ্র সাধারণ মানুষের মধ্যে এক আশ্চর্য মহিমাকে আবিষ্কার করে সাধারণ নিরীহ মানুষকে এক মহৎ গৌরবে গৌরবান্বিত করেছেন। একান্ত সাধারণ মানুষের মধ্যে নারায়ণ যে কূর্মরূপে অবস্থান করেন আমরা এই মানুষগুলির আচরণের মধ্যে সেই কূর্মরূপী নারায়ণকে প্রত্যক্ষ করবার মহৎ সৌভাগ্য লাভ করি।

(৯)

বাংলায় সামাজিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে যেমন গিরিশচন্দ্র অগ্রণী, ঐতিহাসিক নাটক রচনার ক্ষেত্রেও তিনি অন্যতম প্রধান অগ্রণী। আবার গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটক ও চরিত-নাটকের অন্য নাম যেমন ভক্তিমূলক নাটক, তেমনি তাঁর ঐতিহাসিক নাটকের আর এক নাম স্বদেশী নাটক—এ কথা অসঙ্কোচেই বলা চলে।

তিনি একান্ত পরিণত বয়সে, বলতে গেলে তাঁর জীবনের প্রায় শেষ অংশে ঐতিহাসিক নাটক রচনায় হাত দেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, তাঁর নাট্যকারের সুদীর্ঘ জীবনে তিনি সত্যকারের ইতিহাস থেকে বিষয় নিয়ে নাটক রচনা করেন নি। পৌরাণিক ও চরিত-নাটকে যেমন ধর্ম, ভক্তি ও আদর্শ প্রভৃতি প্রচারের উদ্দেশ্যে নাটকের বিষয় নির্বাচন করতেন, শেষ বয়সে তেমনি স্বাদেশিকতা প্রচারের জন্যই তিনি আবার ইতিহাসকে অবলম্বন করলেন।

এবার কিন্তু পদ্ধতি এবং দৃষ্টিভঙ্গি কিঞ্চিৎ পৃথক। চরিত-নাটকগুলি রচনা করবার সময় ইতিহাসের সঙ্গে চলিত জনশ্রুতিকেও তিনি সমান মর্যাদা দিয়ে নাটকের অঙ্গে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু শেষ জীবনে ঐতিহাসিক নাটক রচনা করবার সময় তিনি আর ইতিহাস-গ্রন্থ ছাড়া কোন জনশ্রুতির দ্বারস্থ হন নি।

ঐতিহাসিক নাটক রচনার মূল উদ্দেশ্যটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে রচনার কালটি উল্লেখ করলেই। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে বাংলা দেশে যে আশ্চর্য স্বদেশী আন্দোলন গড়ে ওঠে, দেশপ্রেমের সেই প্রবল জোয়ারের দিনেই গিরিশচন্দ্র তাঁর 'সিরাজদ্দোলা' নাটক রচনা করেছিলেন। ১৯০৫ সালে সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে 'সিরাজদ্দোলা' প্রথম অভিনীত হয়। নাটকটি রচনার কালের যে পটভূমি তার রক্তোজ্জ্বল পটভূমিতে নাটকটিকে স্থাপন করলেই নাটক-রচনার উদ্দেশ্যটি সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে উঠবে। পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত স্বাধীন তরুণ নবাব সম্পর্কে তখনও বহু বিরূপ ধারণা বাঙালীর পরবর্তী প্রজন্মের মনে, যে কোন কারণেই হোক, প্রচলিত এবং কোথাও কোথাও বদ্ধমূল ছিল। গিরিশচন্দ্র যত্নসহকারে আয়ত্তাধীন সমস্ত ইতিহাস পাঠ করে, এই নাটক রচনা করে হৃতমুকুট এই তরুণ নবাবের মস্তকে আবার জাতির শ্রদ্ধার গৌরব-মুকুট স্থাপন করে তরুণ নবাবকে সেই দেশাত্মবোধের দিনে পুনর্জীবিত করে তাঁর সম্মানের মুকুট তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন। তারই মধ্য দিয়ে স্বদেশের প্রতি তাঁর কৃত্য তিনি সম্পন্ন করলেন।

এইখানেই তিনি থামেন নি। সিরাজের পর আরও একজন স্বাধীনচেতা পুরুষ বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সিংহাসন অলঙ্কৃত করেছিলেন। তাঁকে নিয়েও সেই একই পন্থায় তিনি অতি যত্নসহকারে আবার 'মীরকাশিম' নাটক রচনা করলেন। এ নাটক সর্ববিধ সম্মান ও সমাদর লাভ করেছিল। এক দিকে দর্শক অর্থ, শ্রদ্ধা ও সম্মান দিয়েছিল, অন্য দিকে রাজকোষ দণ্ড দিয়েছিল নাটকখানির প্রকাশ বাজেয়াপ্ত করে।

আমরা বিদেশের বিবিধ রচনার কথা শুনেছি, শুনি—সাহিত্য জনচিত্তের বেদনা ও বিক্ষোভকে ভাষা দিয়ে সে বেদনা ও বিক্ষোভকে এক শাশ্বত সারস্বত মূর্তিই শুধু দান করে না, সেই বেদনা ও বিক্ষোভকে নবতর বেগে প্রবাহিত হবার পথ রচনা করে দেয়। আমাদের পরম গৌরব যে রবীন্দ্রনাথের মত গিরিশচন্দ্রও তাঁর সমসাময়িক কালের বেদনাবিদ্ধ জাতির বেদনা ও বিক্ষোভকে রূপ দিয়ে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৃত্য ও কর্তব্য পালন করেছেন।

(১০)

তাঁর সঙ্গীত-নৃত্য-প্রধান, হাল্কা নাটকগুলির সম্পর্কেও কিছু বলার প্রয়োজন। আমরা তাঁর সমসাময়িক কালের অনেক পরের মানুষ। এই নাটকগুলি পড়ে বার বার মনে হয়, আহা, আমরা কেন সেই কালে জন্মাই নি! সে কাল কোথায় গেল!

নাটকগুলি পড়ে মনে হয় সে কাল অনেক তৃপ্ত ছিল, অনেক শান্ত ছিল, অনেক সমস্যাহীন ছিল। তখনও দারিদ্র্য ছিল, অভাব ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে অভাব-বোধ অনেক কম ছিল। তা না হলে অমন অর্ধস্বপ্ন-অর্ধসত্য এক কল্পলোক দিনান্তের কর্মসমাপনের পর রঙ্গমঞ্চের উপর দর্শকের চোখের সামনে নেমে আসত কি করে? নাট্যমঞ্চ তখন সত্য সত্যই রঙ্গমঞ্চ হয়ে উঠত।

তখনকার বড়দিনের দিনগুলি একবার কল্পনা করুন। কলকাতার বিশেষ বিশেষ উজ্জ্বল অংশ উৎসব-সজ্জায় উজ্জ্বলতর হয়ে উঠত। বাইরের স্ফূর্তির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রঙ্গমঞ্চের উপরও স্ফূর্তি-আমোদ, রঙ্গরসের আসর বসত। স্বল্পে তুষ্ট, পরিতৃপ্ত দর্শক সেই স্ফূর্তির আসরে অবগাহন করত। চাই নূতন নাটক, নূতন গান, নূতন নাচ, নূতন কাহিনী—সব মিলিয়ে এক পঞ্চ-রঙ। দেলদার আর আবু হোসেনিতে এক দিকে রঙ্গমঞ্চ অন্য দিকে দর্শকের চিত্ত উথলে উঠত। কোথায় গেল সেই দেলদারি আর আবু হোসেনির কাল! তে হি নো দিবসা গতাঃ।

(১১)

নাটকের ক্ষেত্রে বহুতর দানের মত আরও একটি দান আছে গিরিশচন্দ্রের। সে দানটিও অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। সেটি 'গৈরিশ ছন্দ'।

মধুসূদন প্রথম তাঁর 'পদ্মাবতী নাটকে' কয়েকটি গর্ভাঙ্কে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রথম ব্যবহার করেন। তারপর তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত মহৎ রচনা 'মেঘনাদ বধ' রচিত হয়। সে ছন্দ কাব্যরচনার পক্ষে আশ্চর্য উপযুক্ত হয়েছিল, কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে তার সে উপযুক্ততা ছিল না, এ কথা বলাই বাহুল্য। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর রচনা কাব্যের পাঠ ও আবৃত্তি হিসাবে আশ্চর্য সুন্দর ও ভাবগম্ভীর; কিন্তু নাটকে যেখানে কথ্য বাক্যরীতিকে অনুসরণ করে চলতে হবে কবিতাকে, সেখানে কথ্যরীতির সঙ্গে খানিকটা আপোষ করতেই হবে। সেখানে কিছু রূপান্তর অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রয়োজন।

কাব্যের প্রয়োজনে মধুসূদন যাকে সৃষ্টি করেছিলেন নাটকের প্রয়োজনে গিরিশচন্দ্র যখন তাকে ব্যবহার করলেন তখন সে ছন্দ তাঁর হাতে একটি নাটকীয় মূর্তি লাভ করলে। সে মূর্তি এক সার্থক নাট্যকাব্য ছন্দের মূর্তি। নাটকে অমিত্রাক্ষর সাধারণভাবে কথারীতির প্রয়োজনে অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব এবং অসমান হয়ে এল। এক এক ছত্রে অভিনেতার সুবিধামত যতি দ্বারা চিহ্নিত করার সুবিধাও করে দিলেন নাট্যকার।

এর ফলে মহাকাব্যের মন্থরগমনা কবিতা নাটকে এক বিদ্যুৎচকিত তড়িৎ-গতি লাভ করলে। শুধু তাই নয়, তার চলায় কত বৈচিত্র্য, কত অকল্পিত চটুলতা ও আকস্মিক গাম্ভীর্য। কখনও গদ্যের অনুগামিনী হয়ে দ্রুতগতি, আবার কখনও মিলবন্ধ পয়ার ও ত্রিপদীর অনুসরণে মন্দগতি, ছন্দমুখরা।

এই গৈরিশ ছন্দের মাধ্যমে গিরিশচন্দ্র তাঁর নাটকে এক আশ্চর্য স্বকীয়তার পরিমণ্ডল রচনা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়। পরবর্তীকালে, পরবর্তীকালের নাট্যকাররা গিরিশচন্দ্রের কাছ থেকে সবচেয়ে যা বেশী করে গ্রহণ করেছেন তা তাঁর এই ছন্দ। এই গৈরিশ ছন্দ তাঁর পরবর্তী প্রায় প্রতিটি নাট্যকার নিজেদের নাটকে কোন না কোন ভাবে গ্রহণ করে নাট্যবস্তুতে অভিনব মর্যাদা যুক্ত করেছেন।

বাংলা নাটকে এই ছন্দের মাধ্যমে কবিতার প্রয়োগ গিরিশচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এবং তার প্রয়োগ বিভিন্ন রীতিতে বাংলা নাটকে আজও অব্যাহত রয়েছে। বাংলা নাটকে এই কাব্যরীতি প্রয়োগের দ্বারা আধুনিক কালের নাট্যকাররা প্রতিদিন পূর্বসূরী হিসাবে গিরিশচন্দ্রকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দিয়ে চলেছেন।

(১২)

গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে আমার বক্তব্য শেষ হয়ে এসেছে। তাঁর দীর্ঘ ও বিচিত্র নাট্যকার-জীবনের যে বিশাল ও বিচিত্র নাট্যকর্ম তার সম্পর্কে এই স্বল্প পরিসরে কতটুকুই বা বলতে পেরেছি! তাঁর দীর্ঘপ্রসারী, বিচিত্র কীর্তির যে সব বিশিষ্টতা আছে সেইগুলি স্পর্শ করে গিয়েছি মাত্র।

আমি আমার আলোচনায় সেই বিশিষ্টতাগুলি সম্পর্কে মাত্র ইঙ্গিত করে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছি; সমালোচনা করি নি। সমালোচনার কাজ আমার নয়, সে পাণ্ডিত্যও আমার নেই; সে কাজ পণ্ডিত সমালোচকদের। তাঁদের বিচরণের পরিধি আমি স্পর্শ করি নি।

তবু এ কথা পরিশেষে বলব, সব প্রতিভারই শক্তির সীমা আছে। প্রত্যেক প্রতিভাই যেমন নিজের নিজের অভিজ্ঞতার দ্বারা বিশিষ্ট, তেমনি শক্তিতেও কোথাও না কোথাও সমাপ্তির যতি চিহ্ন থাকে। গিরিশচন্দ্রের শক্তির বিশিষ্টতাও যেমন আজ আমাদের কাছে উজ্জ্বল, তেমনি তাঁর শক্তির সীমাও আজ আমাদের কাছে স্পষ্ট।

গিরিশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্র কি রবীন্দ্রনাথের শক্তি ও প্রতিভা নিয়ে আসেন নি। এর জন্য অনুযোগ করে কোন লাভ নেই। তা ছাড়া তাঁর শক্তির চরিত্র-ধর্ম বিচার করলে দেখা যায় যে নাট্যকার হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে তিনি অবিসংবাদী সার্থকতা ও উজ্জ্বলতা লাভ করেছিলেন কিন্তু তাঁর নাট্যকারের শক্তির মধ্যেও কোথায় যেন স্ববিরোধিতা ছিল। শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বিধাতার এই সৃষ্টিশালায় বিধাতার সৃষ্টিলীলার উদ্দেশ্য যথাশক্তি উপলব্ধি করে, নিজে দ্রষ্টার মত দূরে অবস্থান করে সেই সৃষ্টির একটি অংশকে দর্শকের চোখের সামনে তুলে ধরেন। দ্রষ্টার দৃষ্টিশক্তির তারতম্য হেতু সেই ভগ্নাংশতে সম্পূর্ণের কম-বেশী ছায়া পড়ে, পূর্ণের ব্যঞ্জনা যুক্ত হয়। কিন্তু গিরিশ-চন্দ্রের শিল্পী হিসাবে মনোধর্ম প্রায় যেন এর বিপরীত ছিল। তিনি দূরে থেকে বিধাতার সৃষ্টিকে দেখতেন না, দেখতে পারতেন না। সৃষ্টির যে অর্থ তাঁর কাছে প্রতিভাত ছিল সেই অর্থকেই, সেই ভাবকেই নিজের মনের বাঞ্ছিত মূর্তিতে প্রকাশ করতেন। শ্রেষ্ঠ নাট্যকার যেখানে বিধাতার বাঞ্ছাকে দেখাবার ভার নেন সেখানে নাট্যকারের নিজের বাঞ্ছা থাকলে চলে কি করে?

আরও একটি মোটা কথা আছে। গিরিশচন্দ্র আমাদের দেশের চিরায়ত সৃষ্টি-প্রকরণকেই মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। অথচ পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে সে দৃষ্টিভঙ্গি, সে মাধ্যম, ও সে পদ্ধতি সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়েছে আমাদের সাহিত্যে। আজ আমরা যে শিল্পদৃষ্টি ও শিল্প-পদ্ধতির সাধনা

করি তার সবটাই পাশ্চাত্ত্য দেশ থেকে আমদানি। আমরা আজ তাকে আমাদের বলেই মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছি। এর মধ্যে অগৌরবের কিছু নেই। আর যদি থাকেই তাকে অস্বীকারেরও উপায় নেই। সে তো ঐতিহাসিক সত্য! সে আজ দীর্ঘ ও নিয়মিত ব্যবহারে আমাদেরই হয়ে গিয়েছে। এর ফলে গিরিশ-চন্দ্রের রচনা আজ অপরিচিত হয়ে উঠেছে।

সেই সঙ্গে আরও একটি সাদামাটা কথা আছে। গিরিশচন্দ্রের রচনা আজ তো প্রাচীন হয়েছে। অন্য শ্রেষ্ঠতর রচনার মত প্রাচীন হয়ে তার উত্তাপও তো স্বাভাবিক নিয়মেই হ্রাস পাবার কথা।

এ সব সত্ত্বেও তিনি আমাদের নাট্য-সাহিত্যের উত্তম পুরুষ এবং প্রথম জাতীয় নাট্যকার।

এ কথা বলেও, এ সসম্মান অভিনন্দন তাঁকে জানিয়েও আরও একটি কথা এখানে বলতে হবে। তাঁর রচিত যে নাটকগুলি তাঁর নিজের সমসাময়িক কালে সজীব ছিল, যা কলকাতার ও মফস্বলের বিভিন্ন মঞ্চে অভিনীত হয়ে দর্শকের হৃদয়কে ক্ষণে ক্ষণে দুলিয়ে যেত, দর্শককে হাসাত কাঁদাত, আজ তারা আর সে সজীবতা নিয়ে বেঁচে নেই। কালধর্মে সেই রচনারাজির চরিত্র ও ঘটনাগুলি আজ আর মঞ্চের পাদপ্রদীপের সম্মুখে জীবন্ত মূর্তিতে সজ্জিত হয়ে দেখা দেয় না, আজ তারা মাত্র অলংকৃত গ্রন্থের মূর্তিতে শ্রদ্ধাশীল পাঠকের সম্মুখের গ্রন্থসারিতে সজ্জিত হয়ে চিরস্থায়ী মর্মর মূর্তির মত স্থির হয়ে অপেক্ষা করে থাকে। আজ গিরিশচন্দ্রের রচনা ক্লাসিকে পরিণত হয়েছে। তাঁর সমসাময়িক আরও দুজন নাট্যকারের রচনা আজও অভিনীত হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের এক-আধখানি নাটকের অভিনয় দেখে দর্শক আজও পরিতৃপ্ত হয়। আর মহাকবি রবীন্দ্রনাথের বহু নাটক আজ সমসাময়িক কালের অবহেলার ধুলো মুক্ত হয়ে ধীরে ধীরে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে। বিশেষ করে তাঁর কয়েকটি রূপক-নাটকের আধুনিক জনপ্রিয়তা এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উপায় নেই, কালের পরিবর্তন ঘটেছে। কালের সঙ্গে বাঙালীর রুচির, চিত্তধর্মের বহিরঙ্গের, দৃষ্টিভঙ্গির, মনোভাবের, সেই সঙ্গে বিশ্বাসের পরি-বর্তন ঘটেছে। গিরিশচন্দ্র যে মন ও যে বিশ্বাস নিয়ে নাটক রচনা করেছিলেন প্রায়-শতাব্দীপারের বাঙালী তার থেকে আজ অনেক দূর সরে এসেছে। তাই তাঁর নাটক তখনকার মূর্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়ে আর দর্শককে তৃপ্তি দিতে পারবে না।

কিন্তু নূতন ব্যাখ্যা পেলে যে সে নাটক দর্শককে নবীন আস্বাদ ও নবতর তৃপ্তি দিতে পারে তাও তো আমাদের অভিজ্ঞতায় আছে। তাঁর তিরোভাবের

বহুকাল পর শিশিরকুমার আবার 'জনা' মঞ্চস্থ করেছিলেন। যাঁরা গিরিশচন্দ্রের রচিত ও শিশিরকুমারের প্রযুক্ত 'জনা' নাটকের অভিনয় দেখেছেন তাঁরা সে কথা ভাল করেই জানেন। কাজেই এই মহৎ নাট্যকারের রচনা আবার যদি উপযুক্ত প্রয়োগশিল্পীর হাতে পড়ে তা হলে তা অবশ্যম্ভাবীরূপে নবতর মূর্তি লাভ করে দর্শককে পরিতৃপ্ত করতে পারবে বলেই বিশ্বাস করি। উপযুক্ত প্রয়োগ-কর্তার হাতে পড়লে সেই প্রস্তরীভূত মূর্তি আবার নিজের নব আবির্ভাবের কালের কালোচিত ভঙ্গিতে কথা কয়ে উঠবে; শতাব্দীর ওপারের কথায় সমসাময়িক কালের সুর ধ্বনিত হয়ে উঠবে। সে গুণ গিরিশচন্দ্রের রচনার শ্রেষ্ঠতম অংশে অবশ্যই নিহিত আছে।

পরিশিষে একটি ঘরোয়া উপমা দিয়ে বক্তব্য সমাপ্ত করি।

আজ আমরা যারা বিংশ শতাব্দীর অষ্টম পাদে বাংলা দেশে বিচরণ করছি তারা মোলায়েম বাটা ছানার সন্দেশ ছাড়া ক্ষীরের সন্দেশের সংবাদ রাখি না। অথচ একদিন আমাদের দেশে ক্ষীরের সন্দেশের খাসা রেওয়াজ ছিল; বিবাহে উৎসবে ক্ষীরের পুতুলের আদর ছিল। কিন্তু পুরোপুরি ছানার সন্দেশের যুগে আমরা আর বিগত দিনের ক্ষীরের পুতুলের সংবাদ রাখি না।

গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলিরও আজ প্রায় সেই দশা। কালের অভিপ্রায়ে আজ তাঁর নাটকগুলির গায়ে বাসী ক্ষীরের পুতুলের গায়ের শক্ত একটা পরতের মত অপরিচয়ের কাঠিন্য জমেছে। আমরা অপেক্ষা করে আছি কবে আবার শিশিরকুমারের মত এক নূতন জন গিরিশচন্দ্রের ক্ষীরের পুতুলগুলিকে পসারী করে নূতন থালায় সাজিয়ে আমাদের সামনে ধরে বলবেন— আবার একবার পরখ করে দেখুন। ক্ষীরের পুতুলগুলির গড়ন যদিও সাবেক কালের ছাঁদে তবু জানবেন এ এক পাকা কারিগরের হাতের পাক। যদিও ওদের গায়ে শক্ত পরত পড়েছিল, আমি তার গায়ের শক্ত খোলা ছাড়িয়ে টাটকা করে নতুন থালায় সাজিয়ে এনেছি; একটু ভেঙে মুখে দিন, দেখবেন শুধু জিভ কেন, মনও জুড়িয়ে যাবে।

আমরা গিরিশচন্দ্রের সেই নবীন কালের অনাগত প্রয়োগ-কর্তার পথ চেয়ে আছি।

চতুর্থ বক্তৃতা

(৪) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

(১)

আজ সাধারণ নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠার আসন্ন শতবার্ষিকীর কালে, যে সব স্মরণীয় পুরুষ বাংলা নাটক ও নাট্যমঞ্চ সৃষ্টি ও লালন করে আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন তাঁরা সকলেই যদি বিধাতার কোন সকৌতুক অভিপ্রায়ে আবার একবার স্বর্গলোক থেকে নেমে এসে আমাদের সামনে দাঁড়াতেন, তা হলে আজকের বাঙালী, চলিত তিন প্রজন্ম নিয়ে আজকের যে বাঙালী জাতি, সবচেয়ে চেনা মানুষ বলে যাঁকে এক মুহূর্তে চিনে নিত তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

এর কারণ দ্বিজেন্দ্রলালের রুচির সঙ্গে বর্তমান বাঙালীর রুচির সাযুজ্য। আপনার শিল্পসৃষ্টির দ্বারা দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর পরবর্তীকালের সাহিত্য-সংস্কৃতিকে কতখানি প্রভাবিত করেছেন তার আলোচনা না করেই এ কথা অসঙ্কোচে বলা চলে যে, দ্বিজেন্দ্রলালের ধারাবাহিক মূল ভারতীয় ঐতিহ্যে বিশ্বাসী চরিত্র, বুদ্ধিদীপ্ত মেধা, বিদেশী সাহিত্যের দ্বারা সবিশেষ পরিশীলিত চিত্ত—এই সব মিলে যে দ্বিজেন্দ্রলালকে সৃষ্টি করেছিল, তাঁর রচিত কাব্য ও নাটকের দ্বারা পরবর্তীকালের নাট্য-সাহিত্য সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত স্পষ্টতা। তাঁর মেধার ও শিল্প-শক্তির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গুণ এই স্পষ্টতা। এর সঙ্গে শিল্প সম্পর্কে তাঁর ধারণা ও মনোভাবটি যুক্ত করলেই তাঁর শিল্পসৃষ্টির মূল স্বরূপটি ধরা যাবে। ভাব তাঁর কাছে কেবলমাত্র বিশুদ্ধ রসচর্চার বিষয় ছিল না। ভাবকে শুধুমাত্র বিশুদ্ধ রসচর্চার বিষয় করে নিলে সে ভাব জীবনকে সমৃদ্ধ ও মহিমান্বিত করে না, বরং জীবনকে এক ধরণের বিমুখতা দ্বারা বীর্যহীন ও পঙ্গু করে তোলে। অন্যপক্ষে দ্বিজেন্দ্রলাল ভাবকে জীবনেরই প্রয়োজনে প্রত্যক্ষভাবে শিল্পের মধ্যে ব্যবহার করেছেন যার ফলে তাঁর সৃষ্টিতে ভাবের জীবনোদ্যম-সুলভ উষ্ণ প্রকাশ ঘটেছে। এবং এই প্রকাশের সময় কল্পনার চেয়ে বেশী পরিমাণে প্রযুক্ত হয়েছে তাঁর উজ্জ্বল ও

প্রদীপ্ত বুদ্ধি। এর ফলে তিনি এক দিকে দুর্নীতি-মধুর, লঘু চপলতাকে জীবনের মহিমান্বিত, গম্ভীর ও উত্তপ্ত প্রকাশের দ্বারা প্রতিহত করেছেন, অন্য দিকে জীবনাবেগবর্জিত, কালজীর্ণ ভক্তি-বিহ্বলতা ও অর্থহীন পাপ-পুণ্যবোধ ও সংস্কারের প্রাচীন অন্ধ আদর্শের স্থবির, অনড় দেহে বুদ্ধি-দীপ্ত, ক্ষুরধার হাস্যের অস্ত্রাঘাত করেছেন।

আজ কালের বিবর্তনে, কালেরই অভিপ্রায়ে, যা যা তাঁর আক্রমণের স্থল ছিল তা সবই অপসৃত। জীবনের প্রয়োজনেই জীবন সেই সব প্রাচীন লোভনীয় চপলতা ও দুর্নীতিকে, কালজীর্ণ ভক্তি-বিহ্বলতাকে, অর্থহীন পাপ-পুণ্যবোধকে পরিত্যাগ করে সরে এসে ভিন্নতর ক্ষেত্রে আপনার সমস্যা সৃষ্টি করে তার সমাধান খুঁজছে। তিনি যা যা অপসারণ ও পরিবর্তন চেয়েছিলেন সেই সব অপসারণের ও পরিবর্তনের মধ্যেই এ কালের বাঙালী জন্মলাভ করেছে। সেই কারণেই তিনি এ কালের বাঙালীর একান্ত চেনা মানুষ।

তা ছাড়া তাঁর সমগ্র শিল্পকর্ম এই পথেই মানুষের সামগ্রিক পৌরুষ ও মনুষ্যত্ব সাধনার পথে প্রযুক্ত হয়েছিল। নিজের সমসাময়িক কালের ধ্যান-ধারণা ও প্রয়োজনের পথেই তার বিকাশ লাভ ঘটেছিল। তাই সে কালের মানুষ যেমন তাঁর শিল্পকর্ম থেকে সমসাময়িক কালের মানুষ হিসাবে জীবনের উত্তাপ ও আনন্দ সংগ্রহ করেছিল, এ কালেও তাঁর নাটকের অভিনয় বা পঠন-পাঠন থেকে সে উত্তাপ ও আনন্দ আমরা অবশেষ হিসাবে কিছু কিছু নিঃসংশয়েই পাব।

'নিঃসংশয়ে' কথাটি আমি অসংশয়েই ব্যবহার করেছি। রুচি ও মনোধর্মের ব্যাপারে এ কালের বাঙালীর যেমন সবচেয়ে কাছের নাট্যকার তিনি, তেমনি নাটকের গঠন ও মূর্তির ব্যাপারে আমাদের এ কালের নাট্য-মঞ্চের নাটক তাঁকে এখনও বোধ হয় একেবারে ভুলতে পারে নি।

একটি উপমার আশ্রয় নিলে বক্তব্যটি প্রকাশ করা সহজতর হবে। আমাদের দেশে যে ছাঁদে বাসগৃহ তৈরী হত ইংরেজ আমলে বাসগৃহের ও ইমারতের ছাঁদ যেমন তার থেকে স্বতন্ত্র জাতের, তেমনি সংস্কৃত নাটকের ও আমাদের দেশ-প্রচলিত লোকায়ত যাত্রাগানের ছাঁদ ও গঠনপ্রণালী একেবারে ভিন্ন শ্রেণীর। মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে এর স্পষ্ট প্রমাণ ও চিহ্ন আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলা নাটক দ্বিজেন্দ্রলালের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত যেন তার সম্পূর্ণ সুচারু গঠনটি লাভ করতে পারে নি। দ্বিজেন্দ্র-লালের হাতেই বাংলা পঞ্চাঙ্ক নাটক সর্বপ্রথম তার সম্পূর্ণ, সুঠাম ও পরিচ্ছন্ন মূর্তি লাভ করেছে। এ দিক দিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ

স্থপতি এ কথা অনায়াসে বলা চলে। এবং এ প্রসঙ্গে এ কথাও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য যে পরবর্তীকাল থেকে আজ পর্যন্ত বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে তাঁর প্রবর্তিত গঠনরীতিই আজও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চলে আসছে। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যেও সে গঠনরীতি এখনও সম্পূর্ণরূপে বর্জিত হয় নি। অতি দীর্ঘ পঞ্চাংক নাটক কালের প্রয়োজনে ও কালের রুচিতে চার কি তিন অঙ্কে এসে দাঁড়িয়েছে; তার দীর্ঘ সংলাপ সংক্ষিপ্ততর মূর্তি লাভ করেছে। তা সত্ত্বেও তার স্থাপত্য-প্রণালী কম-বেশী তাঁর প্রবর্তিত রীতি অনুসারী হয়েই আজও বিরাজ করছে। এই কারণেই তাঁর নাটকে আমরা আজও নাটকের পরিচিত ও সমকালিক রীতির স্পর্শ পাই; তার সান্নিধ্য আমাদের কাছে একান্ত অপরিচিতের সান্নিধ্য মনে হয় না।

(২)

দ্বিজেন্দ্রলাল দীর্ঘ জীবন এবং সেই কারণেই দীর্ঘকাল সাহিত্য সেবা করার প্রসাদ ও সৌভাগ্য তাঁর ভাগ্যদেবতার কাছ থেকে লাভ করেন নি। তাঁর জীবনকাল মাত্র পঞ্চাশ বছরের, এবং সাহিত্য সেবার পরিমাণ কাল কম-বেশী পঁচিশ বছরের। এ দিক দিয়ে তাঁর পূর্বসূরী মধুসূদন ও দীনবন্ধুর সঙ্গে কিছু মিল আছে। মাত্র চল্লিশ বৎসর বয়সে তাঁর বিবাহিত জীবন শেষ হয় পত্নীর মৃত্যুতে। তার পরের জীবন গৃহিণীহীন গৃহে একাকী জনের জীবন, দুঃখদহনের তাপে ক্লিষ্ট। পতিগতপ্রাণা স্ত্রীর স্মৃতির আশ্রয়-ছায়ায় বাকী দশ বৎসরের শূন্য জীবন তিনি অতিবাহন করেছেন।

অথচ এই দশ বৎসরই তাঁর জীবনে সাহিত্য-সাধনার শ্রেষ্ঠতম এবং উজ্জ্বলতম কাল। ১৮৮৬ থেকে ১৯০২ সাল পর্যন্ত এই সতেরো বছর তিনি কবিতা, প্রহসন অথবা সামাজিক নাটক রচনা করেছেন। তারপর ১৯০৩ সাল, যখন তাঁর বয়স চল্লিশ, তখন যেন তাঁর জীবনে, সেই সঙ্গে তাঁর সাহিত্য-সাধনায় এক ক্রান্তিকাল আবির্ভূত হল। এতদিন, তাঁর চল্লিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি বিরোধিতা কম সহ্য করেন নি। তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে একদিকে সামাজিক জীবনে বিরোধিতা সহ্য করতে হয়েছে, অন্য দিকে তাঁর অনন্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও চরিত্রবত্তা তাঁর কর্মজীবনে ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের রোষ ও উত্তাপ আহ্বান নিয়ে এসেছে। তা সত্ত্বেও তিনি নত হন নি, বিপর্যস্ত কি বিভ্রান্ত হন নি; দুই হাতে সব্যসাচীর মত দুই বিরোধীকে প্রতিহত করে বিজয়ীর অট্টহাস্য হেসেছেন। যৌবনের ও জীবনের আনন্দ তাতে বিন্দুমাত্র স্তিমিত হয় নি, বরং এই যুগল বিরোধের সংঘাতে তাঁর উজ্জ্বল মেধা ও

তেজস্বী চরিত্র বক্রহাস্যে সামাজিক নাটক ও প্রহসন, গান ও কবিতার মধ্যে হাস্যের, রসের, ব্যঙ্গের বহুবর্ণ ফুলঝুরি ছড়িয়েছে ক্ষণে ক্ষণে।

কিন্তু তখনও তিনি যেন জীবনের বহিরঙ্গনে বিচরণ করছিলেন। লঘু হাস্য, পরিহাস, ব্যঙ্গ তখনও তাঁর প্রধান আয়ুধ। জীবনের গূঢ়তর ও গভীরতর ক্ষেত্রে পদপাত তখনও তাঁর জীবনে যেন অপেক্ষায় ছিল। তাঁর পরিণত জীবন সেই অনাবিষ্কৃত ক্ষেত্র আবিষ্কারের জন্য যেন উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছিল। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত 'তারাবাই' নাটকে সেই পদক্ষেপের ইঙ্গিত মেলে। মনে হয়, যে পথ তিনি খুঁজছিলেন সেই পথের অস্পষ্ট আভাস যেন তিনি পেয়েছিলেন এই নাটকখানি রচনা করবার সময় কিন্তু সে পথ তখনও অস্পষ্ট, নিজেও যেন তার সম্পর্কে স্থিরনিশ্চয় নন।

'তারাবাই'য়ের প্রকাশ-কাল আর তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু দুই-ই তাঁর জীবনে যুগপৎ ঘটনা। দুঃখ ও বেদনা এসে আবির্ভূত হল তাঁর জীবনে। বাইরের লৌকিক জীবনের উজ্জ্বলতায় বেদনার ছায়াপাত হল ঠিকই; কিন্তু সেই দুঃখই যেন সহমর্মী বিষণ্ণ বন্ধুর মত তাঁর হাতখানি সস্নেহে ধরে তাঁকে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিল জীবনের অন্তঃপুরে, যেখানে মানব-জীবন বীর্যবত্তায়, ত্যাগে ও প্রেমে সমুজ্জ্বল, অন্যায়ের ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্বর্গীয় ক্রোধে বর্ণাঢ্য এবং স্বদেশের জন্য বৃহত্তর প্রেমে রঞ্জিত। শিল্প তখন আর শুধু রসের পরিবেশক মাত্র নয়, সে তখন স্বর্গলোকের অগ্নি মর্ত্যলোকের মাটির জীবনে মিশিয়ে আর এক অগ্নিময় ও অগ্নিশুদ্ধ জীবনের গঠনকর্তা।

সত্য কথা বলতে কি দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনে সাহিত্য-সাধনার স্বর্ণযুগের আরম্ভ এই দুঃখতপ্ত ও বেদনাবিদ্ধ জীবনের দ্বারপ্রান্তেই। সাহিত্য-সাধনার প্রথম চৌদ্দ বৎসর পরিপূর্ণতা ও এক নবীন গভীরতা লাভ করেছে শেষ সাত বৎসরে। ১৮৮৯ সালে যে সাহিত্য-জীবনের আরম্ভ তাই গিয়ে প্রথম পর্ব শেষ করেছে ১৯০২ সালে। তারপর সে জীবন 'তারাবাই' রচনার মাধ্যমে এক নূতনতর জীবনের সন্ধানে ব্যাপৃত ও তৃষিত দেখা যায়। এই সময়েই স্ত্রীর মৃত্যু। তারপর ১৯০৫ সাল থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত তাঁর জীবনের সাহিত্য-সাধনার শ্রেষ্ঠ কাল। অন্য পক্ষে ১৮৮৯ থেকে ১৯০২ পর্যন্ত চৌদ্দ বৎসরে যেখানে তিনি মাত্র পাঁচখানি নাটক রচনা করেছেন সেখানে তার মাত্র অর্ধেক সময়ে, সাত বৎসরে অন্তত এগারোখানি নাটক প্রকাশিত হয়েছে এবং এর উপরে তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত অন্তত দুখানি নাটকও সম্ভবত এই কালেই রচিত হয়েছিল। তাঁর যে সৃষ্টিশক্তি ও প্রতিভাকে আমরা প্রধানত সম্মান জানিয়ে থাকি তার অধিকাংশই এই সাত বৎসরের সৃষ্টি।

তখনকার দিনে নাট্যরস পরিবেশনের যতগুলি মাধ্যম ছিল তার প্রায়

সবগুলিতেই তিনি করস্পর্শ করেছিলেন। প্রহসন, সামাজিক ও পৌরাণিক নাটক, ঐতিহাসিক নাটক, গীতিনাট্য, নাট্যকাব্য, প্যারডি প্রভৃতি বহু ধরণের নাটক রচনার দ্বারা তিনি নিজের কালকে পরিতৃপ্ত করেছেন ও পরবর্তী-কালকে সেগুলি উত্তরাধিকার স্বরূপ দিয়ে গিয়েছেন।

আজ কাল-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যম্ভাবীরূপে অধিকাংশ প্রাচীন রচনার মত তাঁর রচনাও নিজের কালে যে সমকালীন উত্তাপে উত্তপ্ত ছিল সেই তাৎক্ষণিক উত্তাপ হারিয়েছে, তার অনেক তাৎক্ষণিক তাৎপর্যও হারিয়েছে। সমকালীন যে সব সমস্যার পটভূমিতে তাদের সৃষ্টি, সেই সব সমস্যা আজ কালের স্রোতে হারিয়ে মিলিয়ে গিয়েছে শুধুমাত্র নিজের নামটুকু চিহ্নিত রেখে। কাজেই তাদের সম্পূর্ণভাবে বুঝতে গেলে তাদেব পট-ভূমিকেও বুঝবার প্রয়োজন আছে। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও, তাঁর রচনার একাংশ, বহু পরিবর্তন সত্ত্বেও, আজও রসের ও আনন্দের আধার এবং উজ্জ্বলতার মূর্তি হয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। তাঁর কীর্তি প্রধানত এই রচনা-গুলির উপরই নির্ভরশীল। আমি এইগুলিই আমার আলোচনায় স্পর্শ করব মাত্র।

(৩)

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল কম-বেশী পঁচিশ বছরে কুড়িখানি নাটক রচনা করেছিলেন। তাদের অধিকাংশই অভিনীত হয়ে নিজের সমসাময়িক কালের দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে। নাটকগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় নাট্যকার বহু সময় নাটকের নামের সঙ্গে নাটকের শ্রেণী বিন্যাসের ইঙ্গিত দেবার জন্য, আরও একটি করে নাম যুক্ত করেছেন। কোথাও প্রহসন, কোথাও গীতিনাট্য, কোথাও নাট্যকাব্য, কোথাও নাট্যরঙ্গ, কোথাও বা প্যারডি মূল নাটকের নামের গায়ে লাগিয়ে তার বিশেষ চরিত্রটি চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও আজকের দিনের হিসাবে তাঁর নাটকগুলিকে মোটামুটি কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি। যদি তাঁর নাটকগুলিকে প্রহসন, সামাজিক, ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক বা অর্ধ-পৌরাণিক এই চার ভাগে ভাগ করি তা হলে বলতে পারি, প্রহসন ছয়খানি, সামাজিক দুখানি, পৌরাণিক বা অর্ধ-পৌরাণিক ছয় খানি এবং ঐতিহাসিক নাটকের সংখ্যা ছয়খানি। তাঁর নাটকের এই শ্রেণীগত বিভাগ ধরে নিলে বলতে পারি প্রতিটি বিভাগেই অতি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি দ্বারা তিনি স্থায়ী শিল্পকীর্তি আমাদের জন্য এবং আমাদের পরবর্তীকালের জন্য রেখে গিয়েছেন।

তাঁর প্রহসনগুলির কথাই প্রথমে ধরা যাক। কোন কোন ক্ষেত্রে অসম্ভব কল্পনার আশ্রয় গ্রহণের ফলে তাদের স্বচ্ছন্দশ্রী থেকে তারা ভ্রষ্ট হয়েছে যার ফলে অতি সরল-সরস হাস্যরস পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হবার অবকাশ পায় নি, এ কথা আলোচনায় অগ্রসর হবার পূর্বেই বলে রাখি। কিন্তু তাঁর প্রহসন-গুলিতে এমন এক ধরণের স্বচ্ছ সহজের, একান্ত পরিচিতের সাক্ষাৎ মেলে যার সাক্ষাৎকার দুর্লভ, আমাদের বিগত নাট্য-সাহিত্যে যাকে কদাচিৎ প্রত্যক্ষ করা যায়। এই প্রহসনগুলিতে জীবনের কোন তত্ত্বমূলক অথবা ভাবময় প্রকাশের চেষ্টা, আয়োজন বা কল্পনা নাই। সহজ সাধারণ মানব-জীবন শিল্পীর তৃতীয় নয়নের দৃষ্টিপাতে যে বিচিত্র-আস্বাদপূর্ণ বিস্ময়কে আপনার মধ্য থেকে উদ্‌ঘাটন করে দেখায়—মানব-জীবনের সে আলেখ্য অবশ্যই পরম শ্রদ্ধেয়; শিল্পের রাজ্যে সে সৃষ্টি একান্ত দুর্লভ সামগ্রী। কিন্তু তার সাক্ষাৎ শিল্পের দীর্ঘ ইতিহাসে কতটুকু মেলে? আর প্রহসন রচনার ক্ষেত্রে শিল্পী কদাচিৎ তার সন্ধানে কল্পনাকে চালনা করেন। দ্বিজেন্দ্রলালও করেন নি। কিন্তু শিল্পের ইতিহাসে বার বার দেখা যায়, দেখা-পরিচিত মানব-জীবনকে তার সেই পরিচিত মূর্তিতেই আঁকতে যেন শিল্পীর কুণ্ঠা আসে; তিনি পরিচিত মানব-জীবন ছাড়া আরও কিছুর, অন্তরের কোন মাধুরীর সন্ধান করে তার দ্বারা শিল্পবস্তুর সর্বাঙ্গে, ভিতরে বাহিরে প্রলিপ্ত করতে চান। কিন্তু প্রায়শই সে প্রচেষ্টা সার্থক হয় না। তার ফলে পরিচিত, চেনা-জানা মানব-জীবন তার সহজ সরসতা হারায়, আবার শিল্পের মধ্যে কোন দিব্য স্পর্শ বা আস্বাদও অনুভব করা যায় না।

কিন্তু প্রতিদিনের পরিচিত, চারি পাশের চলমান মানব-জীবনে সে সহজ সৌন্দর্য, সহজ ও স্বাভাবিক প্রাণবত্তা ও প্রাণোচ্ছলতা বিশ্ববিধাতার সূর্য-করোজ্জ্বল, নির্মল হাস্যরাশির মত সদাসর্বদা আছড়ে আছড়ে পড়ছে আমাদের সম্মুখে, তাকেই শিল্পে ধরে রাখা কি সহজ কথা? সহজ সাধারণ জীবন, যা একান্ত পরিচিত, একান্ত বৈচিত্র্যহীন, অথচ যা প্রতিটি মানব-অস্তিত্বের, শুধুমাত্র অস্তিত্বের কারণেই, আনন্দ-উদ্বেল ও স্বতঃস্ফূর্ত তৃপ্তিতে ডগমগ, যাকে শিল্পীর ভাবময় দৃষ্টিতে দর্শন করতে হয় না, যা সহজ সাধারণ মানুষের সহজ দৃষ্টিতে এক নজরেই ধরা পড়ে, দ্বিজেন্দ্রলাল সেই সাধারণ পরিচিত জীবনকেই তাঁর প্রহসনগুলির অঙ্গীভূত করেছিলেন। এই জীবনের হাসি, ত্রুটি, ভ্রান্তি সবই সাদা সহজ চোখে দেখা। এ জীবন তিনি জন্মগত-ভাবে শিল্পী হয়েও সাধারণ মানুষের মতই দেখতে পেরেছিলেন। ভাবের চশমা চোখে দিয়েই যাঁর জন্ম, সে চশমা খুলে রেখে দেখা ও দেখতে পারা কারও পক্ষে সহজ কথা নয়। সহজ কথা কইতে বললেই কওয়া যায় না;

সহজে সহজে দেখতে বা দেখাতে চাইলেই সহজে দেখা বা দেখানো যায় না। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর প্রহসনগুলিতে সেই সহজকে দেখতে পেরেছেন। এবং তার মধ্যে যেগুলি শ্রেষ্ঠ তাতে সেই সহজকে সহজে দেখাতেও পেরেছেন।

তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রহসনগুলি তাঁর পূর্বসূরী দীনবন্ধুর শ্রেষ্ঠ প্রহসনগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এ কথার অর্থ এই নয় যে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রহসন রচনার ক্ষেত্রে দীনবন্ধুকে অনুকরণ করেছেন। বলার উদ্দেশ্য মাত্র এই যে, তাঁদের মধ্যে চরিত্রগত সাদৃশ্য আছে। দীনবন্ধুর মতই দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর সমসাময়িক মানুষকে ও সমাজকে খুব ভালভাবে জানতেন ও চিনতেন। প্রথম জীবনে সমাজের অন্ধ সংস্কারের আঘাত তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে, তার বিরুদ্ধে তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়েছে। তারই মধ্য দিয়ে তাঁর চেনা সম্পূর্ণ ও গভীর হয়েছে।

কিন্তু তাঁর স্বভাবে ও চরিত্রে যে তেজস্বিতা ও অকুতোভয়তা ছিল তার রীতিটি ছিল বড় বিচিত্র। অন্যায়কে, অনাচারকে কোন ভাবেই সহ্য করবার বা পরিপাক করার স্বভাব ছিল না তাঁর। অন্যায়, অবিচার ও অনাচারের সঙ্গে সাক্ষাৎকার মাত্র তাঁর স্বভাব-তেজস্বী মন বিরূপ হয়ে যেত, ক্ষুরধার মেধা সকল দুর্বুদ্ধির বিরুদ্ধে বিদ্রূপে স্ফুরিত হয়ে উঠত। কখনও বক্র-হাস্যে, কখনও বা সবিদ্রূপ অট্টহাস্যে তাকে সম্বর্ধিত করতে ভুল হত না তাঁর। সামাজিক অন্যায়-অনাচার, ব্যক্তিগত চারিত্রিক ত্রুটি ও অসঙ্গতি স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন মানব-চিত্তে যে বিরূপতা, উষ্মা ও ব্যঙ্গ জাগিয়ে তোলে তাকেই তিনি বার বার তাঁর প্রহসনগুলির মধ্যে রূপ দিয়েছেন। 'ত্র্যহস্পর্শ', 'পুনর্জন্ম' ও 'প্রায়শ্চিত্তে' এই ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের মূর্তিটি মুহূর্তে মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

কিন্তু এ ছাড়াও আরও এক শ্রেণীর হাসির সংবাদ শিল্প আমাদের মধ্যে মধ্যে দিয়ে থাকে। সে হাসির মধ্যে অন্যায়-অবিচার-সঞ্জাত বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গ-হাস্যের লেশমাত্র থাকে না; সেখানে মানুষের সম্পর্কে সামান্যতম অভিযোগও অনুপস্থিত। তবু তা হাসিতে ভরপুর। এখানে হাসির জন্মদাতা কৌতুক। যেখানে এই হাসির মূর্তি অতি সুচারু সেখানে সে সকৌতুক হাসি প্রভাত-আলোর মত নির্মল, বাক্য সেখানে অর্থহীন কলকাকলীর মত আনন্দময়। দ্বিজেন্দ্রলাল অন্তত একবার এই সকৌতুক হাস্যসম্ভার আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন তাঁর 'বিরহ' নাটকখানির মধ্য দিয়ে।

সাহিত্য-শিল্পের রাজ্যে যাঁরা রাজচক্রবর্তী তাঁরা অধিকাংশজনেই হাস্য-রসকে পরিহার করে চলেন লঘু ও চপল বিবেচনা করে। দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গীকৃত 'বিরহে'র ভূমিকায় নিজেও সে কথা উল্লেখ

করেছেন; বলেছেন, "আমাদের দেশে এবং অন্যত্র অনেকে হাস্যরসের উদ্দীপনাকে অযথা চপলতা বিবেচনা করেন।" কিন্তু জীবনের মধ্যে প্রাণের গূঢ়প্রবাহিণী ঝর্ণাধারার মত আনন্দ যেখানে ও যখন সতত স্ফুরিত ও স্বতঃস্ফূর্ত, যখন প্রাণের সেই আনন্দের প্রভায় দৃষ্টির সম্মুখে চলমান জীবনের স্রোত আনন্দ-তরঙ্গের মত প্রতিভাত হয় তখন সেই আনন্দধারার তরঙ্গ-শীর্ষে শীর্ষে কত দ্যুতি, তার রকমফেরই বা কত রকম! সহজ কৌতুকও সেই আনন্দের এক দ্যুতি মাত্র। 'বিরহ' নাটকের মধ্যেও যে কৌতুক তাও সেই আনন্দ-তরঙ্গ থেকেই উদ্ভূত।

উৎসর্গপত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছেন, "সব বিষয়ের দুটি দিক আছে।—একটি গম্ভীর, অপরটি লঘু। বিরহেরও তাহা আছে। আপনি ও আপনার পূর্ব্ববর্তী কবিগণ বিরহবেদনাপ্লুত বিরহের করুণ গাথা গাহিয়াছেন। আমি—'মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী' হইয়া বিরহের রহস্যের দিকটা জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। আপনাদের বিরহ-বেদনাকে ব্যঙ্গ বা উপহাস করা আমার উদ্দেশ্য নহে।..আমার এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য—অল্পায়তনের মধ্যে বিরহের প্রকৃত হাস্যকর অংশটুক্ দেখানো।" আপনার রচনার মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল এই প্রতিশ্রুতি পালনেরই চেষ্টা করেছেন।

তৃতীয় পক্ষের পত্নী নির্মলার হাতে দাম্পত্যকলহের মধ্যে একান্ন বৎসর বয়স্ক, বিষয়সম্পন্ন মানুষ গোবিন্দচরণ মুখোপাধ্যায় সম্মার্জনী দ্বারা পুরস্কৃত হলেন। সম্মার্জনীপ্রহারেও পত্নী তৃপ্তা নন, তাঁর স্বামী সে প্রহার অম্লানবদনে সহ্য না করায় অভিমানিনী পত্নী পতিগৃহ ত্যাগ করে পিত্রালয়ে গমন করলেন। গোবিন্দচরণের বিরহের কাল সমাগত হল। তাঁর বিরহ আরম্ভ হল বিরহ-বেদনা দিয়ে নয়, নিশ্চিন্ততা দিয়ে। বললেন—"আঃ! দিন-কতক হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।" বিরহের কালে যখন নায়িকারা বিরহতাপে তাপিতা হয়ে শীতল পদ্মপত্রে শয়ন করেন, নায়কদের কাছে যখন বসন্তের মলয় বাতাসও অসহনীয়, কোকিলের গান কটু মনে হয়, যখন নায়িকা অবিরাম বিরহ-জ্বরে ক্ষীণতনু হয়ে শয্যার সঙ্গে প্রায় লীন হয়ে যান, যখন প্রিয়বিচ্ছেদকাতর, চেতন-অচেতনে-ভেদজ্ঞানহীন কামার্ত নায়কের প্রকোষ্ঠ থেকে কনক-বলয় দেহের শীর্ণতা হেতু স্খলিত হয়ে যায়, সেই কালে গোবিন্দচরণ প্রিয়বিচ্ছেদের পর কচুরি, সিঙাড়া, সন্দেশ, বোঁদে ও সরভাজা সেবনে নধরকায় ও নবীনকান্তি-সম্পন্ন হয়ে উঠলেন। গোবিন্দচরণের বিরহানল হৃদয়ে জ্বলত না, জ্বলত উদরে। ভোজনরত অবস্থাতেই বিরহতাপিত গোবিন্দচরণের মেদস্ফীত দেহের ছবি উঠল।

এই কৌতুকহাস্যের পথেই নাটকের যাত্রা। তারপর আবির্ভাব ভায়রাভাই

ইন্দুভূষণের এবং পুরুষবেশী শ্যালিকা নব্যনায়িকা সুন্দরী চপলার। তাঁদেরই হাতের কারসাজিতে এবং চাকর রামকান্তের পরোক্ষ সহযোগিতায় নাটকের সুমধুর সমাপ্তি। এই মূল কৌতুক-কাহিনীর সঙ্গে রামকান্ত গোলাপীর অপ্রধান কাহিনীটি যুক্ত হয়ে নাটকটিকে আরও সরস, আরও সতেজ করেছে। মূল কাহিনী যেখানে সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে গৃহীত সেখানে অপ্রধান কাহিনীর পাত্র-পাত্রী দুজন এসেছে সমাজের স্বল্পবিত্ত শ্রেণী থেকে। এ গল্প রামকান্ত গোলাপীর অনুরাগ ও প্রণয়ের কাহিনী। গোবিন্দচরণ-নির্মলার মূল কাহিনী-প্রতিমাটিকে চারিপাশে চালচিত্রের সজ্জার মত রামকান্ত গোলাপীর আখ্যানটি দিয়ে নাট্যকার নাটকটিকে সজ্জিত করেছেন। আর গোলাপী বাংলা সাহিত্যে একটি অবিস্মরণীয় চরিত্র হয়ে আজও বিরাজ করছে।

নাটকটিতে যে রস পরিবেশিত হয়েছে তা অসূয়াহীন, এমন কি তার মধ্যে কারও প্রতি বিন্দুমাত্র কটাক্ষ নেই। হাস্যরস এখানে শরতের নির্মল গঙ্গা-প্রবাহের মত। কাহিনীতে, রসে, মনোভাবে কোথাও বিন্দুমাত্র কালির স্পর্শ নেই; আগাগোড়া শুভ্র, সুন্দর ও অকুণ্ঠ আনন্দদায়ক। নাটকের মনোভাবটি যেন গোলাপীর প্রথম আবির্ভাবের সময় তার দ্বিতীয় গানেই প্রকাশিত হয়েছে।—

"হেসে নাও—এ দুদিন বৈ ত নয়;
কার কি জানি কখন সন্ধ্যে হয়।
তুলে নেও—এখনই সে ঝরে যাবে হায়;
....
আহা যৌবন বড় মধুময়।
....
—ভালবাস ভুলে ভাবনাভয়।"

এ গান ও এ নাটক আনন্দিত জীবনের সেই সুখ-সঙ্গীত, যা গম্ভীরভাবে জীবনের অর্থ চিন্তা করে না, যা পায় তাই প্রাণের আনন্দে সুখে-দুঃখে গ্রহণ করে। সেই সহজ গ্রহণের মধ্য দিয়েই যেন অন্যায়কে একান্ত সহজে প্রতিহত করার শক্তি মানব-চরিত্রে স্বাভাবিকভাবেই জাগ্রত হয় এবং অন্যায়কে প্রতিরোধ ও প্রতিহত করে।

আরও একটি উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, সচরাচর নাটক রচনার সময়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাটকের চরিত্র ও কাহিনী নাট্যকারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভিন্ন-পথমুখী হয়ে এমন পথরেখা ধরে অনিবার্য বেগে ধাবিত হয়ে, এমন পরিস্থিতি রচনা করে যেখানে সমাপ্তিরেখা টানতে নাট্যকারকে অনেক অবাস্তব, এমন কি

অসম্ভব ঘটনার দ্বারস্থ হতে হয়। বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে এর ভূরি পরিমাণ নিদর্শন আছে। দ্বিজেন্দ্রলালের ক্ষেত্রও এর ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু 'বিরহ' নাটকে সবই এমন সহজভাবে এসেছে যে, কোন কিছুই বাস্তব বলে গ্রহণ করতে মন কুণ্ঠিত হয় না। এমন কি গোবিন্দচরণের শ্যালিকা চপলার পুরুষবেশে আবির্ভাবেও পাঠক বা দর্শকের বাস্তবতাবোধ ক্ষুণ্ণ হয় না। সবটা বুঝেই পাঠক ও দর্শক সকৌতুকে তা উপভোগ করতে পারেন।

বিদ্রূপাত্মক হাস্যরসের নাটক রচনা কঠিন কাজ; বিদ্রূপহীন হাস্যরস নাটকের মাধ্যমে পরিবেশন করা কঠিনতর। এবং তাকে বাস্তব মূর্তি দিয়ে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা বোধ হয় কঠিনতম কাজ। দ্বিজেন্দ্রলাল সেই কঠিনতম সার্থকতা অর্জন করেছেন।

মানব-জীবনে বাম মূর্তির যিনি দেবতা, তাঁর এক হাতে তিরস্কারের উদ্যত তর্জনী, অন্য হাতে প্রহারের দণ্ড; তাঁর এক নয়নের দৃষ্টি বিদ্রূপে উজ্জ্বল, অন্য নয়ন ক্রোধে স্ফুরিত, তাঁর ওষ্ঠের এক প্রান্ত কুটিল হাস্যে বক্র, অন্য প্রান্ত অবরুদ্ধ ক্রোধে কঠিন। শিল্পে এই দেবতার পূজা হয় বক্র হাস্যের পুষ্পে যার অঙ্গে অঙ্গে বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গ অগুরু-চন্দনের মত প্রলিপ্ত থাকে। আর মানব-জীবনে যে দেবতা দক্ষিণ মূর্তিতে স্থিত তাঁর এক হাতে অভয়, অন্য হাতে বর; তাঁর প্রসন্ন দৃষ্টি মমতার অশ্রুজলে স্নিগ্ধ ও মেদুর, তাঁর ওষ্ঠের হাসি করুণ ও কোমল। শিল্পে তিনি পূজা গ্রহণ করেন মমতার ও প্রেমের অশ্রুজলের ধারায়; পূজা গ্রহণের ক্ষণে তাঁর দুই চোখের প্রসন্ন দৃষ্টি অশ্রু-জলের রেখায় মেদুর ও সজল হয়ে ওঠে।

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর নাট্যকারের জীবনে এই দুই দেবতারই পূজা করেছিলেন। মানব-জীবনে যিনি বাম মূর্তির দেবতা তাঁর পূজা যথাবিহিত নিয়মে যেমন বক্রহাস্যের পুষ্পের সঙ্গে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের অগুরু-চন্দন মিশিয়ে পূজা করেছেন, তেমনি শিল্পচর্চার এক পরম উদ্দীপ্ত ক্ষণে এই দেবতাকেই বিপরীত পূজাবিধিতে সহানুভূতি, আনন্দ ও মমতার পুষ্পে পূজা নিবেদন করেছেন। বাম মূর্তির দেবতা তাঁর সে পূজা গ্রহণ করেছিলেন। 'বিরহ' নাটকখানি ভাল করে অনুধাবন করলে মনে হয়, এখানে সেই দেবতার বক্র-ওষ্ঠ হাস্য একান্ত ক্ষমাসুন্দর প্রসন্নতায় সরল ও সরস হয়ে উঠেছে।

(৪)

দ্বিজেন্দ্রলাল 'পুনর্জন্মে'র মত ব্যঙ্গ-সরস ও 'বিরহে'র মত সহানুভূতি-কোমল প্রহসন রচনা করে হাস্যরসাত্মক নাটকের ক্ষেত্রে স্থায়ী কীর্তি রেখে

গিয়েছেন। নাট্যকার-জীবনের প্রারম্ভ থেকেই তিনি প্রহসন রচনা করেছেন মধ্যে মাঝে। হাস্যরসাত্মক নাটক, যাকে আমাদের নাট্য-সাহিত্যে একমাত্র 'প্রহসন' নামেই অভিহিত করা হয়ে থাকে, সেই প্রহসন রচনাতেই ছিল দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার রুচি ও স্ফূর্তি। তাঁর মেধা ও বুদ্ধি ছিল ক্ষুরধার, চরিত্র ছিল আপোষহীন ও তেজস্বী। সেই সঙ্গে জীবনে অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে যে অংশ সামাজিক ও জীবিকা-অর্জনের ভূমি তা বার বার বিরোধিতা ও প্রতিকূলতার দ্বারা কণ্টকিত হয়েছে। এর ফলে অন্যায়, অনাচার ও অত্যাচারকে তাঁর তেজস্বী চরিত্র ও ক্ষুরধার মেধা কখনও ক্ষমা করতে পারে নি; তার বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপে শাণিত অট্টহাস্য করেছে। তারই পরিচয় মূলত রয়েছে এই প্রহসনগুলির অঙ্গে অঙ্গে। কিন্তু জীবনে যত অগ্রসর হয়েছেন ততই অভিজ্ঞতার প্রভাবে সেই বিজয়ী বীরের উদ্ধত অট্টহাস্য শান্ত হয়ে এসেছে। তার সঙ্গে পত্নী-বিয়োগের বিষণ্ণতায় জীবন ম্লান হয়ে এসেছে। এই কালে রচিত 'বঙ্গনারী' নাটকে সদানন্দের মুখ দিয়ে যেন নিজের মনের বেদনাই প্রকাশ করেছেন। তাঁর সদানন্দ বলছে, "প্রেমের গান আর গাই না, হাসির গান আর গাই না। সে দিন গিয়েছে। হাসি-তামাসার দিন গিয়েছে, আমারও গিয়েছে, সমাজেরও গিয়েছে।"

তাই মনে হয় তাঁর জীবনে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে প্রহসন রচনা শেষ পর্যন্ত সামাজিক নাটক রচনায় পরিণতি লাভ করেছে। নাট্যকার হিসাবে প্রহসন রচনাতেই ছিল তাঁর চিত্তের রুচি ও শক্তির প্রবণতা। তাঁর প্রতিভা বোধ হয় প্রহসনেরই পদ্মদল ফোটাতে চেয়েছিল সারা জীবন ধরে। কিন্তু বেদনা ও দুঃখের উত্তাপে যখন জীবনে স্বাভাবিক আনন্দের সরোবর জলশূন্য হয়ে এল, তখন প্রহসন-পদ্মদলের পাপড়িগুলি শুকিয়ে ঝরে পড়ল। যা বাকী থাকল তা তখন পুষ্পদণ্ডের উপরে বীজের আধারটি। হাস্যরসহীন নাটকই তখন তাঁর হাতে সামাজিক নাটক হিসাবে আবির্ভূত হল।

তাঁর সামাজিক নাটক মাত্র দুখানি। 'পরপারে' আর 'বঙ্গনারী'। দুটিই তাঁর জীবনের একেবারে অন্তিম পর্বের রচনা। তাঁর মৃত্যু ঘটেছে ১৯১৩ সালে, আর 'পরপারে' প্রকাশিত হয়েছে তার এক বৎসরের চেয়েও স্বল্প কাল পূর্বে, ১৯১২ সালে। 'বঙ্গনারী' তাঁর মৃত্যুর তিন বৎসর পর, ১৯১৬ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

'পরপারে' নাটকখানি তাঁর একান্ত পরিণত বয়সের রচনা হলেও এখানে দ্বিজেন্দ্রলাল, প্রথম সামাজিক নাটক রচনা বলেই হোক অথবা যে কোন কারণেই হোক, নিজের শক্তিকে যেন আবিষ্কার করতে পারেন নি। তিনি অস্পষ্টতা পছন্দ করতেন না; স্পষ্টতা ও বুদ্ধিগ্রাহ্যতা তাঁর প্রতিভার অন্যতম বিশেষত্ব।

অথচ মনে হয় এই নাটকে তিনি স্পষ্ট কোন বক্তব্যকে আরম্ভ থেকে পরিণাম পর্যন্ত স্তরে স্তরে কল্পনা করে স্থির করে নিয়ে রচনায় হাত দেন নি। সেই কারণেই নাটকে স্পষ্ট ও সরল ঋজুতা নেই, কল্পনা বার বার বিপথগামী হয়ে ইতস্তত পরিভ্রমণ করেছে, ঘটনা বার বার অবাস্তবতার দ্বারা আপনার সহজ রূপ হারিয়েছে, শেষ পর্যন্ত কোন সহজ পরিণামেও উপনীত হয় নি। এই নাটকের যারা পাত্র-পাত্রী, তাদের অধিকাংশ জনই সেই কারণে সাধারণ মানুষের মত নিজের সহজ, সাধারণ ও পরিচিত আবেগ ও বোধের মূর্তি নিয়ে প্রকাশিত হতে পারে নি। যে শক্তিতে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের ধাতুগত অধিকার, সে শক্তির বিন্দুমাত্র তিনি এ নাটকে ব্যবহার করতে পারেন নি। তার ফলে নাটকটি তাঁর হাতের রচনা হয়েও সার্থক হতে পারে নি।

অথচ সেই সমসাময়িক কালেই রচিত 'বঙ্গনারী' নাটকে তিনি একান্ত স্বাভাবিকভাবে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। এর প্রধান কারণ তাঁর ধাতুগত শক্তি এখানে পূর্ণভাবে তাঁর সহায়তা করেছে। নাটক রচনা করবার প্রথমেই একটি স্পষ্ট বিষয় ও উপযুক্ত সমস্যা পেয়ে গিয়েছেন। সে সমস্যা যেমন বাঙালী সমাজের অন্যতম বৃহৎ সমস্যা তেমনি বাংলা নাটকের অত্যন্ত পরিচিত বিষয়। বিষয়টি হল—কন্যাদায় ও পণপ্রথা। তাঁর 'বঙ্গনারী' প্রকাশিত হবার কয়েক বৎসর পূর্বে ১৯০৫ সালে কলকাতার নাট্যমঞ্চে গিরিশচন্দ্রের 'বলিদান' নাটক অভিনীত হয়ে গিয়েছে। গিরিশচন্দ্রের 'বলিদানে'র কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা করুণাময় দ্বিজেন্দ্রলালের 'বঙ্গনারী'তে দেবেন্দ্র হয়ে আবার সকরুণ মূর্তিতে ফিরে এসেছে। না এসে সে দিন উপায় ছিল কোথায়? সমাজে সে দিন ঘরে ঘরে যে কন্যাদায়গ্রস্ত অসহায় পিতা সবারই চোখের সামনেই ম্লান মুখে ঘুরত ফিরত!

'বঙ্গনারী' যখন দ্বিজেন্দ্রলাল রচনা করেছেন তখন তাঁর প্রতিভা অতি পরিপক্ক, নাট্যশক্তি তখন তাঁর কাছে করামলকবৎ অপেক্ষা করছে। তাঁর অতি বিখ্যাত ও অতি সার্থক ঐতিহাসিক নাটকগুলির সব রচনা সমাপ্ত হয়েছে। নাটকের গঠন-কৌশল তখন তাঁর সম্পূর্ণ আয়ত্তে। শক্ত ভিতের উপর পাকা পাঁচতলা শক্ত-পোক্ত ইমারতের মত তার গড়ন; এক তলা থেকে উপরের তলায় যাবার উপযুক্ত সুপ্রসর ব্যবস্থা; শেষ পর্যন্ত একেবারে পাঁচ তলায় পৌঁছে উন্মুক্ত আকাশের তলে নিশ্চিন্ত বিশ্রাম। উপমা দিয়েই বললাম কথাটা। সুস্পষ্টভাবে ও সুচারুভাবে গঠিত পঞ্চাঙ্ক নাটকটি নাট্যকারের পরিপক্ক শিল্প-রীতির অতি উৎকৃষ্ট নিদর্শন হয়ে প্রকাশিত।

ধনী পিতার সম্পত্তিতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কৌশলে বঞ্চিত, কন্যাদায়গ্রস্ত দেবেন্দ্রকে ঘিরে নাটকের কাহিনী সুরু। একই ব্যক্তিকে অবলম্বন করে দুটি

গল্পের সুতোতে নাট্যকার কাহিনী বুনেছেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উপেন্দ্র কর্তৃক দেবেন্দ্রের পিতৃ-সম্পত্তির ন্যায্য অংশ থেকে বঞ্চনা এবং দরিদ্র দেবেন্দ্রের কন্যা-দায়। কিন্তু দুটি কাহিনী এমন নিপুণ সৌন্দর্য ও কৌশলের সঙ্গে বোনা হয়েছে যে, একের থেকে অন্যকে কোনভাবেই পৃথক করা কঠিন। এই যুক্ত-বেণীর কাহিনী প্রথম অঙ্কে অগ্রসর হয়েছে কেদার কর্তৃক দেবেন্দ্রের মধ্যমা কন্যা সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা সুশীলাকে বিবাহলিপ্সু যজ্ঞেশ্বরকে দেবেন্দ্রের গৃহ থেকে বিতাড়ন পর্যন্ত। দ্বিতীয় অঙ্কে কাহিনী অগ্রসর হয়েছে দেবেন্দ্রের ভাগ্যের দুর্যোগকে আরও ঘনীভূত করে দেবেন্দ্রের কনিষ্ঠা কন্যা কুমুদিনীর মৃত্যু পর্যন্ত। তৃতীয় অঙ্কের সমাপ্তি লম্পট যজ্ঞেশ্বরের হাতে অসহায় অথচ সাহসিকা বিনোদিনীর আত্মরক্ষায়। চতুর্থ অঙ্ক শেষ হয়েছে সুশীলার দস্যু-হস্ত হতে হত্যার দ্বারা আত্মরক্ষায় এবং সুশীলাকে রক্ষার জন্য বিনয়ের আত্ম-ত্যাগে। নাটক সমাপ্ত হয়েছে সম্পূর্ণ ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায়, শিষ্টের প্রতিষ্ঠায় ও দুষ্টের শাসনে।

নাটকের সমাপ্তিতে এই যে শিষ্টের ও অন্যায়ভাবে অত্যাচারিতের প্রতিষ্ঠা ও দুষ্টের শাসন তা সৌভাগ্যক্রমে মনভোলানো বা ছেলেভোলানো গল্পে পর্যবসিত হয় নি। এ কথা ঠিক যে, সংসারে সচরাচর সত্যের ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা কোন সহজ বা সংক্ষিপ্ত পথে হয় না। তবে এটা ঠিক যে, মানব-চিত্ত সেই ন্যায়বিচার দেখবার জন্য, সত্যকে প্রতিষ্ঠিত দেখার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। অথচ তা সচরাচর হয় না, বা হলেও তা স্বাভাবিক সত্যমূর্তি লাভ করে না। তাই শিল্প-সংসারে এত বিয়োগান্ত রচনা! কিন্তু এখানে দ্বিজেন্দ্রলালের কৃতিত্ব এই যে, তিনি সেই দুর্লভকে, প্রায় অলভ্যকে এক স্বাভাবিক মূর্তিতে নাটকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন। যাকে প্রতিষ্ঠা করেছেন সে চিরন্তন মানব-মাহাত্ম্য, বিজয়ী মানবাত্মা। অথচ সে প্রতিষ্ঠা বাস্তবতা-বিরোধী হয় নি। যদিও কোথাও বাস্তবতা থেকে চ্যুতির আভাস আছে, তবু সে বাস্তবতাকে মেনে নিতে আটকায় না, বরং মেনে নিয়ে চিত্ত একান্ত তৃপ্ত ও প্রসন্ন হয়। যেমন তৃতীয় অঙ্কের সমাপ্তিতে বিনোদিনীর আত্মরক্ষা। সব মিলিয়ে মানব-চরিত্র ও মানব-মাহাত্ম্যই নাটকে শেষ পর্যন্ত জয়ধ্বজা উড্ডীন করেছে। এই-ই 'বঙ্গনারী'তে দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব।

মানব-চিত্তের পরম বাঞ্ছিতের এই সর্বাঙ্গীণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হত না যদি মুক্তপ্রাণ, অর্ধোন্মাদ, আনন্দময়, 'অসভ্য' কেদার না থাকত। কেদার মানব-সমাজে দেখা যায় না, দেখা গেলেও বড় একটা দেখা যায় না, অথচ কেদারকে জীবনের পথে সঙ্গী হিসাবে পাবার জন্য মানব-চিত্ত তৃষিত ও ব্যাকুল। এই চরিত্রকে সৃষ্টি করে তাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা সহজ শিল্পকর্ম নয়।

এই নাটকে এক প্রান্তে অবস্থান করছে মুক্তপ্রাণ কেদার, অন্য প্রান্তে রয়েছে কুটিল অজগরের মত বিষাক্ত, ধর্মধ্বজী, ভণ্ড, ভয়ংকর উপেন্দ্র। দুটি চরিত্রই তাদের কর্মে ও উদ্দেশ্যে অত্যন্ত গভীর ও গম্ভীর চরিত্রের প্রাণী, কিন্তু তাদের বাহ্যিক আচরণ সর্বদা হাস্যোদ্রেক করে। শিল্পকর্ম করতে গিয়ে নাট্যকার দুটি চরিত্রেই সুপ্রচুর বর্ণসমাবেশ করেছেন। অথচ তা স্বভাব-বিরোধী, অস্বাভাবিক বা বিসদৃশ হয় নি। এখানেই এই দুটি চরিত্র সৃষ্টিতে তাঁর অপরিসীম নৈপুণ্য। যে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথম জীবনে প্রহসন রচনায় বহু সময় ও বহু মনোযোগ ব্যয় করেছেন, জীবনের অন্তিম পর্বে সামাজিক নাটক রচনার সময় সেই শিল্পরীতি ও অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করে তিনি এই আশ্চর্য সুফল লাভ করেছেন। বাংলা নাট্য-সাহিত্যে চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে কেদার ও উপেন্দ্র চরিত্র দুটি দ্বিজেন্দ্রলালের আশ্চর্য দান বলে বিবেচিত হবে। অবশ্য ঐতিহাসিক নাটকেও তিনি এর পূর্বেই এই জাতীয় চরিত্র সার্থকভাবে সৃষ্টি করেছেন। 'সাজাহান' নাটকে দিলদার চরিত্র তার প্রমাণ। কিন্তু ঐতিহাসিক নাটকের বর্ণাঢ্য এবং কল্পনাবহুল পরিবেশে যা সহজে সম্ভব, সামাজিক নাটকের পরিচিত, বর্ণহীন পটভূমিতে তা সৃষ্টি করা অনেক পরিমাণে কঠিন। দ্বিজেন্দ্রলাল সেই কঠিন কর্ম আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গেই সম্পাদন করেছেন।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গিরিশচন্দ্রের 'বলিদান' এবং দ্বিজেন্দ্রলালের 'বঙ্গনারী' একই সমস্যার ভিত্তিতে রচিত। কিন্তু দুইয়ে পার্থক্য কত! 'বলিদানে'র প্রকাশকাল ১৯০৫ সাল আর 'বঙ্গনারী' স্বভাবতই ১৯১৩ সালে দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পূর্বেই রচিত, যদিও 'বঙ্গনারী'র পুস্তকাকারে প্রকাশকাল ১৯১৬। যদিও দুই নাটকের রচনায় পার্থক্যের কাল মাত্র আট বছরের বেশী নয়, কিন্তু দুটি নাটকে যেন দুই প্রজন্মের ব্যবধান। এ কথা ঠিক যে, 'বলিদানে'র করুণাময় আর 'বঙ্গনারী'র দেবেন্দ্র এই দুজনের মধ্যে খুব বেশী তফাৎ নেই। দুজনেই বিষণ্ণ, একান্তভাবে বিপন্ন; কন্যাদায়ে বিষম বিব্রত। কিন্তু করুণাময় নাটকের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বড় অসহায়, বড় সকরুণ, প্রায় ভেঙে-পড়া মানুষ। কিন্তু দেবেন্দ্র তেমনটি নয়, তার বিষণ্ণতার অন্তরালেও কোথায় যেন একটা কি আছে, কোন জোর আছে যা তাকে সর্বক্ষণ অন্তত খাড়া করে রেখেছে। একে দুই ব্যক্তি-চরিত্রের বিশেষ পার্থক্য বলেও গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু এ সব বাদ দিয়েও দুটি নাটকে কিছু কিছু জায়গায় আশ্চর্য পার্থক্য আছে, এমন কি সেখানে তারা প্রায় বিপরীত। 'বলিদানে' যেখানে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটি বিষণ্ণতা ও বিয়োগান্তিকতার কৃষ্ণ ছায়া সমস্ত পরিবেশকে ছেয়ে আছে,

সেখানে 'বঙ্গনারী'র বিষণ্ণতা মুহূর্তে মুহূর্তে কোন্ আগন্তুক আনন্দ আর আশ্বাসের দমকা হাওয়ায় বার বার উড়ে গিয়েছে, বার বার তাকে পরাজিত করেছে। অনেকেই একটা বিশেষ ও স্পষ্ট কারণকে এর জন্য অঙ্গুলি নির্দেশ করবেন হয়তো! বলবেন, কেদারের ব্যক্তিগত উপস্থিতি ও কার্যকারিতার ফলেই এ সম্ভব হয়েছে। সত্য কথা! কিন্তু কেদার এল কোথা থেকে! এ কথা ঠিক যে, কেদার সেই চিরকালের আনন্দময়, সত্যনিষ্ঠ, দুঃসাহসী পুরুষ। কিন্তু সেও এসেছে নবীন কালের মূর্তি নিয়ে। নাটকে কেদার তো নবীন কালেরই নিত্য মূর্তি! তা ছাড়া 'বলিদান' নাটকে যেখানে অপাত্রে বিবাহিত কন্যা কিরণ্ময়ীর দুর্গতির অন্ত ছিল না, সেখানে দেবেন্দ্রের কন্যা সুশীলার মূর্তি একেবারে বিপরীত। বৃদ্ধ পাত্রে কন্যা সম্প্রদানের প্রস্তাবের মুহূর্তেই সে তার নবীন কালের শিক্ষার জোরে, সজোরে বলতে পেরেছিল—আমি বিয়ে করব না। আমি সমাজের পায়ে নিজেকে বলি দেব না, থাকে প্রাণ—যায় প্রাণ। নবীন বিজয়ী কালই সুশীলাকে এ মন্ত্রণা যুগিয়েছে। বিলাত-ফেরতের সঙ্গে সুশীলার বিবাহে যে আপত্তি হয়েছিল সে আপত্তি এবং বাধাও শেষ পর্যন্ত টেকে নি। সুশীলার সঙ্গেই বিনয়ের জীবনের গ্রন্থিবন্ধন ঘটেছিল শেষ পর্যন্ত। সামাজিক কুসংস্কার ভেঙে বাংলা নাটকে যে সব বিবাহ সংঘটিত হয়েছে 'বঙ্গনারী'তে বিনয়-সুশীলার বিবাহ তাদের আদিতম একটি।

যাই হোক, দ্বিজেন্দ্রলাল নাট্যকার হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন প্রহসনের মধ্য দিয়ে। চারিপাশের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও বৈচিত্র্যময় জীবনকে যথাসম্ভব লঘু সরসতার পথে প্রকাশ করে তাঁর যাত্রারম্ভ। সেই যাত্রাই তো ভিন্নতর ক্ষেত্রের সন্ধানে তাঁকে পৌঁছে দিয়েছিল ঐতিহাসিক নাটকের ক্ষেত্রে। সেখানে স্বর্ণময় শিল্পকীর্তি রচনা করে জীবনের অন্তিম পর্বে তিনি পৌঁছেছিলেন সামাজিক নাটকের ক্ষেত্রে। পূর্বের দুই ক্ষেত্রের সম্পূর্ণ শিল্প-অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করেই তিনি সামাজিক নাটক রচনা আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু সে কাল একান্ত সংক্ষিপ্ত। তাঁর জীবনের অন্তিম পর্ব যেখানে সমাপ্ত হয়েছে তার চেয়ে যদি আরও খানিকটা দীর্ঘতর হত তা হলে বাংলা নাট্য-সাহিত্য আরও কয়েকখানি উৎকৃষ্ট সামাজিক নাটকে সমৃদ্ধ হতে পারত। কিন্তু যা আমরা পাই নি, তার জন্য দুঃখ করে লাভ কি? তিনি যা দিয়ে গিয়েছেন তাই বা কম কিসে? তাঁর শ্রেষ্ঠ দান ঐতিহাসিক নাটকে।

(৫)

ঐতিহাসিক নাটকের ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল আজও সম্রাটের আসনে প্রতিষ্ঠিত। আজ কালধর্মে সব রকম শিল্পের মত নাট্যশিল্পেও বাস্তবতা-মুখী শিল্প-সাধনার ফলে ঐতিহাসিক নাটকের গুরুত্ব আশ্চর্য রকম সীমিত হয়ে এসেছে। কিন্তু যে কালে দ্বিজেন্দ্রলালের আবির্ভাব, সে কালে সমস্ত শ্রেণীর নাটকের মধ্যে ঐতিহাসিক নাটকেরই সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য ছিল। ঐতিহাসিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে তাঁর সমসাময়িক কালে গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদ-প্রসাদ প্রভৃতি দিক্‌পালেরা নাট্য-জগৎ উজ্জ্বল করেই বিরাজমান ছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনিই এই জগতের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব।

প্রহসনের ক্ষেত্র থেকে সৃষ্টির নবতর পথের সন্ধানে তিনি প্রথম রচনা করলেন 'তারাবাই'। 'তারাবাই' নাটকে তাঁর শক্তিমত্তার স্পষ্ট চিহ্ন অবশ্যই আছে; কিন্তু তিনি যেন আপনার পূর্ণ শক্তিকে এখানে সম্পূর্ণ আবিষ্কারও করতে পারেন নি, নিজেও যেন নিজের সে শক্তির পূর্ণ আস্বাদও পান নি। কিন্তু 'প্রতাপসিংহ' রচনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আপনার সম্পূর্ণ শক্তিকে আপনার সৃষ্টির মধ্যে আবিষ্কার করলেন।

এ দিক দিয়ে ১৯০৫ সাল থেকে ১৯০৯ সাল এই পাঁচ বৎসর শিল্প-সৃষ্টির দিক থেকে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাল। ১৯০৪।১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উত্তাপে বাংলা দেশে অজস্র বাঙালীর হৃদয় উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। তার ফলে সে দিন যার যা শ্রেষ্ঠ দান সে তাই নিয়ে পুষ্পাঞ্জলির মত দেশমাতৃকার পায়ে উৎসর্গ করবার জন্য অগ্রসর হয়ে এসেছিল। আবার এই আঘাতের আলোতেই বহুজনের চরিত্রের লুক্কায়িত সম্পদ আত্মপ্রকাশ করেছিল। এরই ফলে যেমন এক দিকে রবীন্দ্রনাথের হৃদয় হতে সংগীতের প্লাবন গঙ্গাধারার মত নেমে এসেছিল তেমনি দ্বিজেন্দ্রলালের হৃদয় থেকে স্বদেশ-প্রেম তরল উত্তপ্ত লাভাস্রোতের মত নাটকের মূর্তি নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। এরই প্রকাশ তাঁর রাজপুত ইতিহাস-ভিত্তিক তিনখানি নাটকে, যেগুলি ১৯০৫ সাল থেকে ১৯০৮ সালের মধ্যে রচিত হয়েছিল। সেগুলি হল 'প্রতাপসিংহ', 'দুর্গাদাস' ও 'মেবার পতন'।

এই তালিকাকে সম্পূর্ণ করবার জন্য আরও দুখানি নাটকের উল্লেখ করতে হবে। সে দুখানি হল 'নূরজাহান' এবং 'সাজাহান'। এই পাঁচখানি নাটকে তাঁর ঐতিহাসিক নাটকের তালিকা সম্পূর্ণ। এই পাঁচখানি নাটকেই

দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তির চিহ্ন এবং নাট্যকার হিসাবে শ্রেষ্ঠ গৌরব নিহিত।

এই নাটকগুলির মধ্যে যে উত্তাপ নিহিত, তা আজকের পরিবর্তিত-রুচি পাঠক ঠিক পাবেন না, পেতে চাইবেনও না। কালধর্মের গুণে এই পঞ্চাঙ্ক নাটকগুলিকে আজ অনাবশ্যক দীর্ঘ মনে হবে, নাটকীয় উক্তিগুলিকে বহু স্থলে অকারণ দীর্ঘ ও বাহুল্য বলে মনে হবে। যে সব আবেগ ও আদর্শের কথা নাটকের প্রায় সমস্ত অংশেই বর্ণিত তাকে সম্পূর্ণ সত্য মনে হবে না, অবাস্তব বোধ হবে। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও অসঙ্কোচেই বলতে পারি, আমাদের জীবনে এমন মুহূর্ত ও ক্ষণ এখনও আসতে পারে যখন এইগুলির চেয়ে সত্য আর কিছু মনে হবে না। সেই পরিবর্তিত মানসিক অবস্থায় অনুভব হবে যে নাট্যকার যা রচনা করেছেন তা বাস্তব, এবং যেমন ভাবে রচনা করেছেন শিল্পের দিক থেকে তা ঠিকই হয়েছে। যে উজ্জ্বল ও উত্তপ্ত পটভূমিতে নাটকগুলির জন্ম, পাঠকের জীবনের পটভূমিতে সেই উত্তাপ ও আলোর স্পর্শ লাগলেই তবে এদের যথার্থ স্বরূপ অনুভব করা যাবে। সেই মুহূর্তে এদের গাঢ় সত্য অনুভবে বিন্দুমাত্র সংশয় থাকবে না।

রাজপুত ইতিহাস-ভিত্তিক নাটক তিনখানির মূল বিষয় স্বদেশপ্রেম; শত্রুহস্তে আক্রান্ত ও নির্যাতিত স্বদেশকে আক্রমণ ও নির্যাতন থেকে রক্ষায় রাজপুত জাতি বিব্রত। এখানে ইতিহাসের পাত্র-পাত্রীরা শুধুমাত্র ব্যক্তি নন, সমগ্র জাতিই তাদের মুখ দিয়ে আপনার বেদনা ও বীর্য প্রকাশ করছে। তার ফলে পাত্র-পাত্রীর কেউই, আমরা যে সব মানুষকে প্রতিদিন দৈনন্দিন প্রাত্যাহিকতার মধ্যে দেখি, তাদের মাপের নয়। তাদের মূর্তি আবেগের দ্বারা, আদর্শের দ্বারা বহু পরিমাণে স্ফীত ও দীর্ঘ। সেই স্ফীত ও দীর্ঘকায় মূর্তিগুলির মধ্যে আমাদের ব্যক্তিস্বার্থের দ্বারা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও ক্ষুদ্র আবেগকে খুঁজে পাব কি করে? বৃহৎ আবেগ ও মহৎ আদর্শের পটভূমিতে তাদের বিচার করলে তাদের সত্য মূর্তি ও বাস্তবতা উদ্‌ঘাটিত হবে।

বাকী দুখানি নাটক 'নূরজাহান' ও 'সাজাহান' সম্পর্কেও সেই ধরণের কথাই বলতে হবে। এরা যেন অতীত কালের বিশালকায় স্ত্রী-পুরুষ। এদের কোন একটি ক্ষুদ্র সংসারে ধরে না, সমগ্র ভারতবর্ষ এদের গৃহাঙ্গন। এদের আশা-ভরসা, দুঃখ-বেদনা, ক্ষোভ-প্রেম, হিংসা-প্রতিহিংসা, উত্থান-পতন সবই তেমনি বড় মাপের। ইতিহাসের অতি বৃহৎ ফ্রেমে এই সব অতিকায় চরিত্রগুলির মধ্যে বড় মাপের, অতি তীব্র, অতি উচ্চ এই আবেগগুলি না থাকলেই বরং বেমানান হত।

কিন্তু ঐতিহাসিক নাটকের ক্ষেত্রে কেবল দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কেই এই

কথাটি খাটে সম্পূর্ণরূপে। তাঁর আগে, তাঁর পরে ও তাঁর সমসাময়িক কালে বহুজনেই বহু ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছেন, কিন্তু আর কারও ক্ষেত্রে এ কথাটি সম্পূর্ণভাবে খাটে না। এক ধরণের ঐতিহাসিক বাস্তবতা তিনি সৃষ্টি করতে চেয়েছেন এবং তা তিনি সার্থকভাবে সৃষ্টি করতেও পেরেছেন। এই সার্থকতার চাবিকাঠিটি নিশ্চয়ই কোথাও আছে। সেটি অনুসন্ধান করা দরকার।

প্রথম কথা প্রতিটি চরিত্রের স্ফীত আবেগ। আবেগ সম্পর্কে কিছু কথা এখনই উল্লেখ করেছি। সাধারণত একটি মানব-চরিত্রে বুদ্ধি ও আবেগ মেশামিশি হয়ে থাকে, তাই বহু বিচিত্রের আধার এই মানব-জীবনে মৌল বা শুদ্ধ আবেগ আমরা কদাচিৎ প্রত্যক্ষ করি। সাধারণত মানব-চরিত্র বিবিধ মিশ্র আবেগের দ্বারা সৃষ্ট, এবং তাদের প্রকাশের সময়েও সচরাচর সেই মিশ্র আবেগের ক্রিয়াই প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু মৌল ও বিশুদ্ধ আবেগও আমরা জীবনে প্রত্যক্ষ করি, যার মধ্যে অন্য আবেগের মিশ্র ক্রিয়া নেই। দ্বিজেন্দ্র-লালের ঐতিহাসিক নাটকে অতিকায় চরিত্রগুলি সবই এক এক মৌল ও বিশুদ্ধ আবেগের আধার। এক এক পৃথক আবেগ, অন্য সব আবেগ বিবর্জিত হয়ে, এই চরিত্রগুলির মধ্যে তীব্রতম মূর্তিতে প্রকাশিত। 'প্রতাপসিংহে' প্রতাপসিংহ, শক্তসিংহ, প্রতাপের কন্যা ইরা, মহাবৎখাঁ, মেহেরউন্নিসা, দৌলত-উন্নিসা; 'দুর্গাদাসে' দুর্গাদাস, শম্ভুজি, গুলনেয়ার, মহামায়া; 'মেবার পতনে' রাজা অমরসিংহ, মহাবৎখাঁ, গোবিন্দসিংহ, অজয়সিংহ, মানসী, সত্যবতী, কল্যাণী: 'সাজাহানে' সাজাহান, দারা, সুজা, ঔরংজীব, মোরাদ, মহম্মদ সুলতান, জাহানারা, নাদিরা, পিয়ারা, মহামায়া; 'নূরজাহানে' জাহাঙ্গীর, শের খাঁ, খুরম, বিজয়সিংহ, মেহেরউন্নিসা, লায়লা—এই অসংখ্য চরিত্র মাত্র এক একটি আবেগকে জীবন প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম বলে বেছে নিয়ে সেই একমাত্র আবেগের পথ দিয়ে নিজেকে অতি স্ফীত ও অতি তীক্ষ্ণ ও তীব্র করে প্রকাশ করেছে। দেশপ্রেম, আনুগত্য, প্রতিহিংসা, কামপরায়ণতা, প্রেম, গর্বান্ধ অক্ষম পুত্রস্নেহ, সাহসিক বীর্যবত্তা, উদারতা, পিতৃভক্তি, উচ্চাশা, রহস্যপ্রিয়তা, মানব-প্রেম—এই সব আবেগ ও প্রবৃত্তির এক একটির আধার এক এক জন; কোন ক্ষেত্রেই কেউ একের অধিক গ্রহণ করে নি। মূলত মাত্র একটি আবেগের পথেই সমগ্র ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। তাই প্রতিটি চরিত্রের প্রকাশ এমন তীব্র, তীক্ষ্ণ, অকপট ও প্রবল। প্রকাশের সেই একমুখী প্রাবল্যই তাদের অস্তিত্বকে অতি বৃহৎ করে রচনা করেছে।

কিন্তু সবেরই একান্ত শিল্পময় প্রকাশ ঘটেছে এই নাটকগুলিতে। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, দ্বিজেন্দ্রলালের এই পাঁচখানি ঐতিহাসিক নাটকের

পরিচ্ছন্ন ও সুচারু গঠন সমগ্র বাংলা নাট্য-সাহিত্যের মধ্যে একান্ত দুর্লভ এবং সেগুলি আজও বাংলা পঞ্চাঙ্ক নাটকের আদর্শস্থল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নাটকগুলি একান্ত পরিচ্ছন্ন ও সুচারুভাবে পরিকল্পিত ও রচিত। পরিকল্পনার মধ্যে অস্পষ্টতার আভাস মাত্র কোথাও নাই। নাটকগুলির আরম্ভ, তারপর দ্রুতগতিতে তার আরোহ ও তারপর তার অবরোহ ও সমাপ্তি। সমস্ত কাহিনী একের পর এক যেন দল পরিস্ফুট করে নাটকের শেষ মর্মমূলে দর্শক ও পাঠককে অনিবার্যভাবে পোঁছে দেয়। স্তর-বিন্যস্ত কাহিনী চারিদিকে যদিও আপনার শাখা বিস্তার করে তবু তা অরণ্যজালে পরিণত হয়ে পাঠকের সহজ মানসযাত্রার গতি রোধ করে না বা বিভ্রান্ত করে না; আপনার স্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন মূর্তিটি সব সময় পাঠকের চোখের সম্মুখে ধরে রাখে এবং পাঠক অনুভব করেন সেই বিশেষ বিশেষ শাখা-প্রশাখার গতি তাঁকে কোন্ দিকে যাবার ইঙ্গিত দিচ্ছে। তাঁর নাটকের কাহিনীতে নাটকীয় প্রকাশ আছে, কিন্তু তা অতি-নাটকীয়তার আতিশয্যে স্থূল নয়। তাঁর নাটকের বিন্যাসের এই স্পষ্টতা ও ঋজুতা, বহু জটিলতা সম্বলিত হয়েও, অতি পরিচ্ছন্ন। এই স্পষ্টতা ও পরিচ্ছন্নতাই তাঁর নাটকগুলিকে এক অনন্য উজ্জ্বলতা দিয়েছে।

কিন্তু নাটকের বিন্যাস, সে তো কেবল বহিরঙ্গ বিষয়। নাটকের বিন্যাস আসলে নির্ভর করে তার চরিত্রগুলির প্রাণবত্তার প্রকাশে। তিনি এই ঐতিহাসিক নাটক রচনা কালে চরিত্র চিত্রণের অতি আশ্চর্য ও গূঢ় শিল্পকৌশলটি সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন এবং তাঁর নাটকগুলিতে তার সার্থক প্রয়োগ করেছিলেন। বাংলা নাট্য-সাহিত্যের আর কোনও নাট্যকার বোধ হয় তাঁর মত নাটকীয় চরিত্র চিত্রণের কৌশলটি আয়ত্ত করতে পারেন নি। সাধারণত নাটকের প্রারম্ভে যে যে চরিত্রগুলি নিয়ে নাটক আরম্ভ হল নাটকের অন্তিম পর্বেও প্রায়শই আমরা দেখি নাটকীয় চরিত্রগুলির বিশেষ বদল হয় নি। তারা যেমন ছিল প্রায় তেমনিই আছে। কাল যেমন জীবকে পরিপাক করে ও অপরিপক্ককে কালের পাকের মাধ্যমে পরিপক্ক করে তোলে, তেমনি নাটকীয় ঘটনার কটাহে নাটকীয় চরিত্রেরও পাক হয়, এবং ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে তারা এক ধরণের পরিপক্কতা লাভ করে; অন্তত যা ছিল তা আর থাকে না, তার থেকে অনেক পৃথক প্রাণীতে পরিণত হয়। সে প্রায় একই দেহে জন্ম থেকে জন্মান্তরের মত। কিন্তু এ শক্তি খুব কম নাট্যকারেরই আয়ত্তে। এ শক্তি কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করেছিলেন। 'প্রতাপসিংহে' নাটকারম্ভের প্রতাপসিংহ ও নাটকের শেষে মৃত্যুশয্যাশায়ী প্রতাপসিংহ অথবা 'দুর্গাদাসে'

নাটকারম্ভের শক্ত কঠিন দুর্গাদাস ও নাটকশেষের বিষণ্ণ, প্রশান্ত দুর্গাদাস একই দেহে দুই ভিন্ন মানুষ। 'নুরজাহান' নাটকে আরম্ভের প্রসন্না, হাস্যমুখী নুরজাহান আর শেষের প্রায়-উন্মাদিনী, ক্রুর, প্রতিহিংসাপরায়ণা নুরজাহানে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। 'নুরজাহান' নাটকারম্ভের সরলা লায়লা ও নাটকের ঘটনার আবর্তে আবর্তে উন্মথিত প্রতিহিংসায় ক্রুর ও শেষে শান্ত স্নেহশীলা লায়লায় যেন একই রমণীর মধ্যে দুই বিপরীত মূর্তি বিভাসিত। 'সাজাহান' নাটকের আরম্ভকালের উদ্বিগ্ন সম্রাট সাজাহান আর অন্তিম পর্বের উন্মাদ, শোকার্ত, আতুর সাজাহানে প্রভেদের কি পরিমাণ হয়? এ তো উদাহরণ হিসাবে কয়েকটি চরিত্রের উল্লেখ করলাম মাত্র। ওই পাঁচখানি নাটকের প্রায় সব চরিত্রগুলিতে নাটকীয় কাহিনীর চলমানতার সঙ্গে চরিত্রগুলির চলমানতা ও স্পষ্ট পরিবর্তিত মূর্তি লক্ষ্য ও আস্বাদ করবার বিষয়। তাঁর নাটকগুলির পরিচ্ছন্ন, স্পষ্ট, সুগঠিত কাহিনী যদি তাঁর নাটককে দ্বিমাত্রিক পরিধি দান করে থাকে তা হলে তাঁর নাটকীয় চরিত্রগুলির চলমানতা তাতে এক ত্রিমাত্রিক পরিধি সংযোজিত করেছে।

তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলির শিল্পাস্বাদ ছাড়াও আরও একটি পৃথক ফলশ্রুতি আছে। তাঁর সব নাটকই, বিশেষ করে এই ঐতিহাসিক নাটকগুলি কেবলমাত্র রসচর্চার বিষয় হয়েই শেষ হয়ে যায় নি, ভাব যে জীবনের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে জীবনে নূতন উদ্যমের ও ওজস্বিতার সঞ্চার করতে পারে, তারও প্রমাণ রয়েছে এখানে। ভাব-চর্চার দ্বারা যে পৌরুষ ও মনুষ্যত্বের সাধনা ও উদ্বোধন সম্ভব তা তিনি এই নাটকগুলি রচনা করে সার্থকভাবে প্রমাণ করেছিলেন। এবং এই ভাব কোন ক্রমেই অস্পষ্ট বা সাধারণ মানববোধের বাইরের কিছু নয়। একান্ত সহজ ও স্বতস্ফূর্ত এর অনুভব ও প্রকাশ। এ এমন এক ধরণের আদর্শবাদ যা বিশেষ কালের প্রয়োজনেও যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি চিরকালের প্রয়োজনেও সমান প্রয়োজনীয়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তাঁর নাটকগুলির কোন চরিত্র এই উজ্জ্বলতা থেকে ভ্রষ্ট নয়। প্রাণত্যাগের প্রাক্কালেও একমাত্র 'সাজাহানে' সাজাহান ছাড়া কেউ জীবনের উজ্জ্বল ও স্বস্তিকর স্থিতি থেকে ভ্রষ্ট হয় নি। এমন নাটকীয় চরিত্রের সান্নিধ্য ও সাহচর্য দর্শক বা পাঠকের পক্ষে কম সুখকর ও স্বাস্থ্যকর নয়।

তাঁর পাঁচখানি ঐতিহাসিক নাটকের সবগুলিই বিয়োগান্ত। কিন্তু সবগুলিতেই মানব-জীবনের ও মানব-অস্তিত্বের অকুণ্ঠ জয়ঘোষণা আছে। এমন কি যে 'সাজাহান' নাটক পরিপূর্ণভাবে বিয়োগান্ত, যেখানে নায়ক সম্রাট সাজাহান মৃত্যুর পূর্বে মানসিক স্থিরতা হারিয়ে উন্মাদ হয়ে গিয়ে মানুষ হিসাবে ভারসাম্য হারিয়েছেন, তখনও তাঁর হৃদয়ে সহস্র অপরাধে অপরাধী,

পাষণ্ড পুত্র ঔরংজীবের জন্য পিতৃস্নেহ আতুর হয়ে সকাতরে অশ্রুপাত করেছে। এক দিকে নাটকগুলি মানব-অস্তিত্বের জয়োচ্চারণে অকুণ্ঠ, আবার অন্য দিকে সেই জীবন, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে মানব-জীবন এই পৃথিবীর পটে বিধৃত সেই জীবন, যেন আমৃত্যু দুঃখের ও ক্লেশের এক অনিবার্য শোভাযাত্রা। মানব-জীবনে সব সুখের উপকরণের প্রাচুর্য সত্ত্বেও কেউই দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ পায় নি। রাজপুতানায় রাজপ্রাসাদগুলিতে সব সুখেরই উপকরণ তো ছিল; বাইরে ভোজ্য ও ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য, মানুষের অন্তরে প্রেম, মমতা, দেশপ্রেম, বীর্য সমস্ত উৎকৃষ্ট মানবীয় গুণের প্রাচুর্য। তা সত্ত্বেও তারা দুঃখ, ক্লেশ, বেদনা ও যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পায় নি। এ ক্ষেত্রে একটা সহজ উত্তর আছে। সাম্রাজ্যলোভী মুঘলশক্তি বিপুলতর শক্তি নিয়ে, বাইরে থেকে এসে, রাজপুত-জীবনের সুখের হাটে আগুন জ্বালিয়ে দুঃখ ও যন্ত্রণা নিয়ে এসেছিল। কিন্তু মানুষের জীবনে দুঃখ এসেছিল, আসে—এইটাই আসল কথা। কে এনেছিল, কেন এসেছিল সেটা বড় কথা নয়। বিজয়ী দুর্গাদাস জীবনে কি অর্জন করতে বাকী রেখেছিলেন? শত্রুকে বার বার তিনি নির্জিত করে মাড়বারকে তিনি শত্রুশূন্য করেছিলেন। এই বিজয়ী বীরের তুল্য হৃদয়বান, চরিত্রবান ও সত্যসন্ধ সে দিন কে ছিল রাজপুতানায়? তা সত্ত্বেও তিনি কেন মাড়বার হতে রাজাদেশে নির্বাসিত হয়েছিলেন? কারণ এই মানব-নিয়তি। দুঃখ ও ক্লেশের পথেই তার যাত্রা, সেই বিষণ্ণ অন্ধকার পথেই সে পৃথিবীর পৃষ্ঠপট থেকে মুছে যাবে। দিল্লীর প্রাসাদে কিসের অভাব ছিল? কিছুরই অভাব ছিল না তো। অতুল বৈভব, অনন্ত ঐশ্বর্য সেখানে। সেখানে ওই বৈভব ও ঐশ্বর্যের পথেই জীবনে অন্ধকারময় ক্লেশ ও দুঃখ, জ্বালাময় মনোকষ্ট নেমে এসেছিল। একবার নয়, বার বার। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম বয়সের প্রহসন রচনার লঘু আনন্দময় কাল তখন বিগত। জীবনে দুঃখ, বেদনা, বিরোধিতা আস্বাদ করে জীবনের গভীরে তখন তিনি প্রবেশ করেছেন। সেই কালের উপলব্ধি ও অনুভবে নাটকের কাহিনী অনুরঞ্জিত হয়ে, এই নাটকগুলির মধ্যে জীবনের বিয়োগান্ত, বেদনার্ত ও যন্ত্রণাকাতর মূর্তিই প্রকাশিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও তিনি জীবনের প্রতি আস্থা হারান নি। শেষ পর্যন্ত জীবনের বিয়োগান্ত, যন্ত্রণাকাতর পরিণামের উপলব্ধি সত্ত্বেও তিনি জীবনের জয়োচ্চারণ করে গিয়েছেন।

নাটকে সুস্পষ্ট, সুঠাম ও পরিচ্ছন্ন কাহিনীর বিন্যাস, নাটকীয় চরিত্রে প্রবল আবেগের সন্নিবেশ, নাটকীয় চরিত্রগুলির ছেদহীন চলমানতা, জীবন-বোধের বিয়োগান্ত গভীরতা, সামগ্রিক মানব-জীবনের প্রতি নিঃশেষ আস্থা ও সেই সঙ্গে নাট্যকারের চিত্তের ও মননের রুচি ও দীপ্তি, সেই সঙ্গে তাঁর

কাব্য-ঐশ্বর্যময় ভাষা তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলিকে আমাদের নাট্য-সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ বিশিষ্টতায় চিহ্নিত করে রেখেছে। এই সব কারণে ঐতিহাসিক নাটকের ক্ষেত্রে আজও তিনি উজ্জ্বলতম ব্যক্তিত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন ও থাকবেন।

(৬)

নাট্যকার হিসাবে তাঁর আরও এক অনন্য সম্পদ ছিল। এ সম্পদ মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারও ছিল না। সে তাঁর গান। গীতিকার হিসাবে তাঁর স্বতন্ত্র খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা ছিল। সেই শক্তিকে তিনি নাটকের প্রয়োজনে জীবনের প্রথম কাল থেকেই সার্থকভাবে ব্যবহার করেছিলেন। গীতিকারের শক্তিকে নাটকের প্রয়োজনে ব্যবহার করা সহজ নয়; বহু ক্ষেত্রে এই দুই শক্তি পরস্পর-বিরোধী হয়ে দেখা দেয়। তাঁর ক্ষেত্রে এই দুই শক্তি পরস্পর-বিরোধী না হয়ে বরং পরস্পরকে সুপ্রচুর সহায়তা করেছে। তাঁর গান তাঁর নাটককে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খর্ব করে নি, বরং গৌরবান্বিত করেছে। প্রহসন এবং ঐতিহাসিক নাটক দুই ক্ষেত্রেই তাঁর গানগুলি নাটকগুলির নাট্যগৌরব বর্ধিত ও নাট্যরস ঘনীভূত করেছে।

প্রহসন রচনার সময় থেকেই তিনি এ শক্তি কাজে লাগিয়েছিলেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসেও সমানভাবেই গান নাটকের অংশীভূত হয়েছে। প্রতি ক্ষেত্রেই গানগুলি নাটকীয় রসকে আশ্চর্যভাবে ঘনীভূত করেছে। নাটকের ঘটনা ও সংলাপের মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে বা প্রচ্ছন্নভাবে নাটক আপনার গতিতে চলতে চলতে একটি গীতের প্রান্তে এসে দাঁড়াল। সচরাচর নাটকে দেখা যায় গানের সময় নাটকীয় ঘটনা পথ চলতে চলতে এসে হঠাৎ গানের সরোবরের তীরে পথ হারিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। গান শেষ হলে আবার গানের সরোবর সাঁতার কেটে পার হয়ে ওপারে নূতন করে পথ ধরতে হল। অথচ দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে নাটকের ঘটনা সংলাপ জলধারার মতই গানের হ্রদে পড়ে আপনার গতিকে ঘনীভূত করে আবার ওদিকে নূতন পথ কেটে বেরিয়ে গেল; তার গতি কোথাও স্তব্ধ হল না। সোজা কথায় সাধারণভাবে গান যেখানে নাটকে নাটকীয় গতিকে মন্দীভূত করে সেখানে তাঁর নাটকে গান নাটকীয় রসকে ঘনীভূত করেছে। আজও আমরা তাঁর বহু গানের কলি ব্যবহার করি, অথচ জানি না সেগুলি তাঁর নাটকেরই অংশ বিশেষ।

'বিরহে' 'হেসে নাও দুদিন বৈ ত নয়', 'সে কেন দেখা দিল রে, না দেখা ছিল রে ভালো'; 'প্রায়শ্চিত্তে' 'আমরা বিলেত ফের্তা ক' ভাই', 'হল কি?

এ হল কি? এ ত ভারী আশ্চর্য!'; 'ত্র্যহস্পর্শে' 'পার ত জন্মো না কেউ, বিষ্যুৎবারের বারবেলা'; 'পুনর্জন্মে' 'প্রাণ রাখিতে সদাই যে প্রাণান্ত'; 'বঙ্গনারী'তে 'ঘোরো, ঘোরো আমার ঘানি' আজও আমাদের সরস মুহূর্তে আমাদের মুখে মুখে ফেরে। জীবনের গম্ভীর ও গভীরতর ক্ষেত্রেও এ শক্তি সমানভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। 'প্রতাপসিংহে' 'যাও যাও সমরক্ষেত্রে গাও উচ্চে রণজয় গাথা', 'মেবার পতন' নাটকে 'ভেঙে গেছে মোর স্বপ্নের ঘোর, ছিঁড়ে গেছে মোর বীণার তার', 'মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়—যুঝেছিল যেথা প্রতাপ বীর' বা 'সাজাহান' নাটকে 'এসেছি, আজি এসেছি বঁধু হে নিয়ে এই হাসি রূপ গান', 'আমি সারা সকালটি বসে বসে এই সাধের মালাটি গেঁথেছি', 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা' প্রভৃতি গান আজও যে কোন আধুনিক গানের মতই সচল ও প্রাণবান, এবং আমাদের আধুনিক আবেগের অংশ বিশেষ।

তাঁর স্বদেশপ্রেমের গানগুলি তাঁর ঐতিহাসিক নাটকের দীপ্তি ও গাঢ়তাকে উজ্জ্বলতর ও গাঢ়তর করেছে। এগুলি আজও সগৌরবে গীত হয় এবং আমাদের ভিতরে এখনও এমন বাঞ্ছিত ক্রিয়া করে যা অন্য অধিকাংশ গানের দ্বারা সাধিত হয় না।

(৭)

নাটকের রাজ্যে তিনি বহু কারণেই স্মরণীয় পুরুষ। বহু কারণের মধ্যে একটি বিশিষ্ট কারণ হল বাংলা নাট্য-সাহিত্যে তিনি কিছু নূতন ধরণের চরিত্র সৃষ্টি করে গিয়েছেন। তাঁর পূর্বে সাহিত্যের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে নাট্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে সে সব চরিত্র ছিল না। এবং সেগুলি যে সার্থক সৃষ্টি তার প্রমাণ মিলবে এই সব চরিত্রের একাধিক নাট্যকারের হাতে অনুকৃতিতে। 'রাণা প্রতাপে' শক্তসিংহ এবং 'মেবার পতনে' অমরসিংহ দুটি আশ্চর্য সৃষ্টি। শক্তসিংহের মধ্যে দুটি বিরোধী ভাব তার অন্তরের মধ্যেই ক্রিয়াশীল হয়ে অন্তরের মধ্যেই সংঘাত সৃষ্টি করে চলেছে। সেই সংঘাতের পটভূমিতেই তার চরিত্রের স্ফুরণ। আর অমরসিংহ প্রথম থেকেই এক আশ্চর্য বিষণ্ন মূর্তিতে মঞ্চে আবির্ভূত। তাঁর বিষণ্নতার কারণ, সমৃদ্ধ, শস্যশ্যামল মেবারকে তিনি পিতা প্রতাপসিংহের চেয়ে কম ভালবাসতেন না। কম ভালবাসতেন না বলেই হাস্যমুখ মেবারের অঙ্গে যুদ্ধের ক্ষত ও অগ্নি-দাহের কল্পনা তাঁর কাছে অসহ্য ছিল। সেই কারণেই তিনি যুদ্ধ চান নি। তিনি যে যুদ্ধ চান নি তার কারণ এ নয় যে তিনি ভীরু ছিলেন। অথচ

তিনি জানতেন যুদ্ধে মেবারের শ্যামল মুখের স্নিগ্ধ হাসিটি মুছে যাবে। আবার এও জানতেন যে, যুদ্ধ তাঁকে করতে হবেই। অনিচ্ছা সত্ত্বেও অসম শক্তি নিয়ে যুদ্ধ করলেন। যা তিনি কল্পনা করেছিলেন তাই ঘটল। মেবারের শ্যামশ্রী ধ্বংস হল, মেবার মোগলের পদানত হল। তাঁর চরিত্রের চির-বিষন্নতার অন্তরালে মেবারের প্রতি তাঁর প্রচ্ছন্ন গাঢ় মমতা ও বীর্যবত্তা সকলকে তাঁর প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট করে।

তারপর 'সাজাহান' নাটকের সাজাহান ও দিলদার এবং 'বঙ্গনারী'র কেদার। দ্বিজেন্দ্রলালের সম্রাট সাজাহান বাংলা নাট্য-সাহিত্যে সম্পূর্ণতম বিয়োগান্ত চরিত্র। সার্বিক ব্যথা ও বেদনার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত এই বৃহৎ চরিত্র আশ্চর্যভাবে চিত্রিত হয়েছে। সমগ্র নাটকটি যেন একটি ছবিতে প্রকাশ করা যায়। একটি বনস্পতির অঙ্গে যত রকমের আঘাত কল্পনা করা যায় তত রকমের আঘাত বার বার তার অঙ্গে বর্ষিত হয়ে তাকে দগ্ধ ও বজ্রাহত করে গিয়েছে। বহু-বজ্রাহত বনস্পতিই বোধ হয় তাঁর একমাত্র উপমা।

দিলদার আর কেদার উভয়েই বিদূষক, নূতন ধরণের বিদূষক। এদের অনুকৃতি পরবর্তীকালের নাটকে একাধিক বার ঘটেছে, কিন্তু তাদের উজ্জ্বলতা ও গভীরতাকে কেউ স্পর্শ করতে পারেন নি।

(৮)

দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কে এতক্ষণ যা বললাম তাতে আমার শ্রোতাদের এই ধারণা হতে পারে যে, নাট্যকার হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলালের কোথাও বিন্দুমাত্র ত্রুটি ছিল না। ত্রুটি তাঁর ছিল, অনেকই ছিল। কিন্তু আমার এই বক্তৃতা কোনক্রমেই সমালোচনা হিসাবে আমি উপস্থাপন করি নি। তিনি বাংলা নাট্য-সাহিত্যের স্মরণীয় পুরুষ। তাঁর নাটকের আস্বাদের তৃপ্তিকেই আমি মাত্র পরিবেশন করতে চেয়েছি।

তাঁর যে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, পঞ্চাঙ্ক নাটক তা আজকের দিনে প্রাচীন বিগত কালের অতিকায় প্রাণীর মত বিবেচিত হবে। তাদের পৃথু কলেবর, দীর্ঘ কাহিনী, দৈনন্দিন জীবনের প্রাত্যাহিক ভাষার থেকে অতি পৃথক এক ভিন্ন ভাষায় রচিত, অতি দীর্ঘ, অতি মাত্রায় কাব্য-ভাবালু সংলাপ শিল্পের পক্ষে উপযুক্ত ও সার্থক কি না সে বিষয়ে সন্দেহ উদ্রিক্ত করবে। নাটকে সংলাপ যেখানে দীর্ঘ, সেখানে আবেগ সর্বদাই বড় উঁচু তারে বাঁধা; সেগুলি বাস্তব জীবনের চিত্রণে বাস্তবানুগ নয়, এমন কথাও মনে হবে। নাটকের কাহিনী আজকের দিনে তো অনাবশ্যকভাবে দীর্ঘ মনে হবেই।

আবেগধর্মী চরিত্র ও ঘটনা কল্পনার সাহায্যে আঁকতে গিয়ে কল্পনা যতক্ষণ বুদ্ধি-বিবেচনার খাতের মধ্যে প্রবাহিত ততক্ষণ তার মধ্যে নাটকীয় বাস্তবতার অভাব হয় নি। কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই কল্পনার স্রোত বুদ্ধি-বিবেচনার দুই তীর ছাপিয়ে এক অবাস্তব ও অসম্ভব মূর্তি গ্রহণ করেছে। 'প্রতাপসিংহ' নাটকে মেহেরউন্নিসা ও দৌলতউন্নিসার অবতারণা ও প্রসঙ্গ এবং 'দুর্গাদাস' নাটকে গুলনেয়ারের সম্পূর্ণ চরিত্র ও তার কার্যকলাপ এই অবাস্তবতার দোষে দুষ্ট। এমন উদাহরণ তাঁর রচনা থেকে আরও হাজির করা কিছু কঠিন কাজ নয়। রোমান্স সৃষ্টির জন্য বল্গাহীন কল্পনা এমনটি ঘটিয়েছে।

(৯)

এ সব ত্রুটি তাঁর রচনার মধ্যে আছে। এই সব ত্রুটি সত্ত্বেও তিনি আজও উজ্জ্বল, আজও স্মরণীয়। তাঁর কীর্তি আজও পরম সমাদরের সামগ্রী। তাদের শিল্পময় সার্থকতায় তারা আজও উজ্জ্বল। শিল্পকর্ম ছাড়াও দু-একটি বিশেষ কারণে তিনি বরাবর আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবেন। তাঁর শিল্পের স্বর্ণ-আধারে তিনি এক বিশেষ অমৃত আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন। তা তাঁর স্বদেশপ্রেমের উদ্দীপনা। স্বাজাত্য ও স্বজাতির সম্পর্কে অকপট শ্রদ্ধা ও প্রেম ছিল বলেই পরশাসনকে অপসারণ কামনা ও পরাধীনতা তাঁর হৃদয়ে যেন আগুনের মত প্রজ্বলন্ত ছিল। সেই অগ্নিকেই তিনি তাঁর শিল্পের স্বর্ণপাত্রে স্থাপন করেছিলেন। তিনি রাজকর্মচারী ছিলেন, তা সত্ত্বেও এই প্রেম প্রকাশে তাঁর দ্বিধা ছিল না, ভয় ছিল না। এবং তাঁর এই প্রেম আমাদের স্বাধীনতা-আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে যথেষ্ট উত্তাপ যুগিয়েছে। সেই কারণে তাঁর, আমাদের কাছে পৃথক নমস্কার প্রাপ্য রয়েছে। সেই নমস্কার তাঁকে নিবেদন করি।

একদিকে ধর্মান্ধতা অন্যদিকে ভাবালুতা—এই দুয়েরই তিনি শত্রু ছিলেন। কুসংস্কার, ধর্মের ভণ্ডামি ও অন্ধতা দ্বারা সমাজের এক অংশ যে পঙ্গুতায় আক্রান্ত তা তিনি জীবনারম্ভের প্রথম কাল থেকে লক্ষ্য করে-ছিলেন। ভাবালুতা যে জীবনের ঋজুতাকে বার বার খর্ব ও খণ্ডিত করছে এও তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টির অগোচর ছিল না। তাই এই দুইকেই তিনি ব্যঙ্গ ও শ্লেষের দ্বারা তাঁর প্রহসনগুলিতে ও সামাজিক নাটকে বার বার তিরস্কৃত করেছেন। সংস্কারহীন, দ্বিধাহীন অকুণ্ঠ উজ্জ্বল বুদ্ধি ও শ্রদ্ধা-শীল, সহানুভূতিময় হৃদয় এই দুইয়ের সংযোগে সুস্থ দেশের মানুষ ভয়হীন হয়ে বিচরণ করবে—এই ছিল তাঁর চিত্তের আকুতি। যাতে তাঁর স্বজাতি

জীবনে নবীন উদ্যমে উদ্বুদ্ধ হয় এই ছিল তাঁর কামনা।. এই আকুতি ও আকুলতার জনাই তিনি সারা জীবন নাট্যশিল্পের মাধ্যমে প্রয়াস করেছেন। অগ্রজতুল্য শুভার্থীর এই শুভকামনার বিনিময়ে আরও একটি নমস্কারও তাঁর প্রাপ্য। সে নমস্কারও তাঁকে নিবেদন করি।

(১০)

আজ কাল-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাতৃভাষা-ভাষী জনগণের রুচির প্রভৃত রূপান্তর ঘটেছে। এই রূপান্তরের ফলে আজ আর তাঁর নাটক, এক-আধখানি ছাড়া অভিনীত হয় না। নাটকের পাঠকও কমে এসেছে। এ সত্ত্বেও এখানে উল্লেখ প্রয়োজন—আমরা যেন তাঁর রচনা থেকে মুখ না ফেরাই। মুখ ফেরালে তাঁর উজ্জ্বল নামে এই খণ্ডকালের বিস্মৃতির ধুলো পড়বে মাত্র, তার বেশী ক্ষতি তাঁর হবে না। কারণ আবার পরবর্তী কাল এসে, নিজেরই প্রয়োজনে, আমাদের তিরস্কার করে সে ধুলো পরিষ্কার করে তাঁকে আবার সপ্রেম নমস্কার নিবেদন করবে।

এর কারণ আমাদের অগোচর নয়। সে কারণ আমাদের কোন গ্রন্থ পাঠ করে জানতে হয় নি। আমরা আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তা প্রত্যক্ষ করেছি। তিনি তাঁর রচনার হিরণ্ময় পাত্রে দেশপ্রেমের যে অগ্নি প্রজ্বলিত রেখে গিয়েছেন, আমাদের জাতীয় জীবনে আপৎকাল উপস্থিত হলে যখন অবসাদের হিমে চারিদিক হিমকাতর তখন প্রাণের অগ্নি সংগ্রহের জন্য তাঁরই কাছে প্রাণের আর্তিতে আমরা ছুটে গিয়েছি। জানি, আবার তেমন কোন আপৎকাল উপস্থিত হলে তাঁরই কাছে আবার ছুটে যাব।

আজ সুখ-দুঃখময় সাধারণ দিনে আমরা তাঁকে ভুলে আছি, তাঁর নাটকে আজকের অন্ধতা ও মূঢ়তার শোধক ঔষধ থাকলেও তাঁর দিকে মুখ ফেরাচ্ছি না, ক্ষতি নাই। কিন্তু এই সাধারণ সুখ-দুঃখময় আমাদের অস্তিত্বের গায়ে যে দিন ঝড়ের ঝাপটা লাগবে, সেই আপৎকালে, বিভ্রান্তির সেই মুহূর্তে আশ্রয়ের সন্ধানে যখন আমরা অন্ধকারে হিমে ছুটে বেড়াব, তখন দেখতে পাব দূরে কে যেন অন্ধকারের মধ্যে অগ্নির আলো ও উত্তাপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আমাদেরই অপেক্ষা করছেন। প্রাণের আর্তিতে তাঁর কাছে তাঁর কর-প্রসারিত অগ্নির দিকে হাত বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করব—তুমি কে?

ক্ষমাসুন্দর হাসির সঙ্গে উত্তর পাব—আমি দ্বিজেন্দ্রলাল। এস, আমি তোমারই জন্য এই অগ্নি নিয়ে অপেক্ষা করছি।

কিন্তু জ্ঞানত সে ভ্রান্তিতে প্রয়োজন কি?

পঞ্চম বক্তৃতা

(৫) রবীন্দ্রনাথ ঃ দুটি মধুর নাটক ও সমাপ্তি

(১)

মহাকবি রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা'য় অর্জুনকে প্রথম দর্শন করে চিত্রাঙ্গদা সবিস্ময়ে ও সহর্ষে স্বগতোক্তি করেছিল—"এই পার্থ আজন্মের বিস্ময় আমার!" রবীন্দ্র-পরবর্তী শিল্পকীর্তিলিপ্সু প্রতিটি জনের সবিস্ময় উক্তি চিত্রাঙ্গদার ওই স্বগতোক্তির মধ্যে যেন প্রতিধ্বনিত। রবীন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়ে তাঁদের কারও অন্য অনুভব হবার উপায় নেই।

মহাকবি বলেই রবীন্দ্রনাথের প্রথম এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। কিন্তু বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির কোন্ বিভাগ তাঁর মহার্ঘতম দানে উজ্জ্বল নয়? সমস্ত ধরণের শিল্পকর্মেই তাঁর আশ্চর্য ও সিদ্ধ হাতের সুমহৎ স্পর্শ রয়েছে। অন্য সব বিভাগের কথা ছেড়েই দিলাম। আজ আমাদের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নাটকের কথাই বলি। নাটকের ক্ষেত্রেই তাঁর দান কী আশ্চর্য, কী অভিনব! গদ্য পদ্য উভয় মাধ্যমেই নাটক রচনা করেছেন, সেই সঙ্গে রচনা করেছেন নৃত্যনাট্য, সঙ্গীত ও নৃত্যের সম্মেলনে রচিত। কাব্য-নাটকের মধ্যে আখ্যান-কাব্য নাট্য-কাব্য প্রভৃতি বিভিন্ন নাট্যকর্মের মধ্যে কত বিভিন্ন ধরণের বিষয়, ভাব ও চিন্তা পরিবেশন করেছেন। তাদের শিল্পরীতিতেই বা কত বৈচিত্র্য! গদ্য-নাটক সম্পর্কেও সেই একই কথা। কত বিচিত্র ভাব, কত বিচিত্র চিন্তা ও কল্পনা, কত বিচিত্র শিল্পরীতির প্রকাশ তার মধ্যে। সামাজিক নাটক ও প্রহসন, ব্যঙ্গ-কৌতুক, হাস্য-কৌতুক থেকে রূপক ও সাঙ্কেতিক নাটক পর্যন্ত তার ব্যাপ্তি। অতি লঘু থেকে অতি গুরু, অতি সহজ ও সাধারণ থেকে অতি গুরু ও অভিনব ভাব ও কল্পনার বিহার তাদের মধ্যে।

প্রায় সত্তর বৎসর কাল প্রসারিত শিল্পি-জীবনে তিনি কাব্যে ও গদ্যে যে পরিমাণ নাটক রচনা করেছেন তাদের সংখ্যাও স্বল্প নয়। প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। যিনি কর্মজীবনে শুধুমাত্র নাট্যকার তাঁর পক্ষেও এই পরিমাণ নাটকের সংখ্যাও সুপ্রচুর বলে বিবেচিত হবে।

উৎকর্ষের কথা বিবেচনা করলেও প্রায় একই ধরণের উক্তি করতে হবে। এ কথা ঠিক যে, রবীন্দ্র-প্রতিভা মূলত নাট্য-প্রতিভা নয়। মানব-জীবনের সংঘাতময় রূপদর্শনের ও দেখানোর যে শক্তি মহৎ নাট্যকারের প্রধান কর্ম, সেই

বিশিষ্টতা রবীন্দ্র-প্রতিভার মূল ধর্ম নয়। মানব-জীবন সম্পর্কিত যে চিন্তা, যে ভাবনা কবিচিত্তের নির্মল, শুভ্র কল্পনার আকাশে প্রতিভাত হয়েছে রবীন্দ্র-নাটকের শ্রেষ্ঠ অংশে তারই প্রকাশ। মানব-জীবনের সংঘাতময় নাটকের মূল ধারা থেকে তাঁর নাটক ভিন্ন ধারায় প্রবহমাণ। নাটকের মূল ধারা যেখানে সংঘাতময় মানব-জীবনের মৃত্তিকা বহন করে মর্ত্যে গঙ্গার মত প্রবাহিত, সেখানে তাঁর নাটক নির্মল-প্রবাহিনী ভাব-জলের আকাশগঙ্গার মত।

তবুও একশো বছরের নাটকের ক্ষেত্রে তাঁর নাট্য-কীর্তি একান্ত ও বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। বিগত একশো বছরের নাট্য-সাহিত্য থেকে যদি কেউ বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে কোন অপরিচিত বিদেশী পাঠককে পরিচিত করাবার জন্য কয়েকটি নাটক নির্বাচন করতে চান তবে তাঁকে রবীন্দ্রনাথেরই শ্বারস্থ হতে হবে। বাংলা সাহিত্যের অজস্র ও অসংখ্য নাটকের ভিড় থেকে তাঁর হাতে তুলে দিতে হবে রবীন্দ্রনাথের রূপক ও সাঙ্কেতিক নাটকগুলি, যার সংখ্যা বেশ কয়েকখানি। কারণ সত্যদ্রষ্টা মহাকবি অনন্ত-বিস্তার সৌন্দর্য ও দেশকাল-নিরপেক্ষ মানব-সত্যকে নিজের অনুভবের মধ্যে পেয়ে তাকে প্রকাশ করবার মাধ্যম হিসাবে নাটককেও গ্রহণ করেছেন। ভিন্ন দেশের, ভিন্ন কালের, ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ এই নাটকগুলি হাতে পাবামাত্র এই নাটকগুলিতে বিধৃত মানব-সত্যগুলিকে আস্বাদ মাত্রেই অনায়াসে চিনতে পারবেন। এই কারণেই বাংলা নাট্যজগতের উত্তম পুরুষ গিরিশচন্দ্র যেখানে তৎকালীন নাট্য-মঞ্চের অভিনয়োপযোগী নাটক রচনা করেছেন সেখানে একমাত্র রবীন্দ্রনাথই পাঠ্য নাটক, যা বলতে গেলে অভিনয়ের চেয়ে পাঠের পক্ষেই বেশী উপযোগী, এমন নাটক রচনা করেছেন।

(২)

এ কথার আবার পুনরুক্তি করছি যে, যদি কোন বিদেশী উৎকৃষ্টতম বাংলা নাটক আস্বাদ করতে চান তা হলে তাঁর হাতে কম-বেশী দশখানি রবীন্দ্রনাথের রূপক ও সাঙ্কেতিক নাটকই তুলে দিতে হবে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অংশ হিসাবে। এ কথা ঠিক যে, তারা বাংলা নাট্য-সাহিত্যের প্রতিনিধিত্বমূলক বিচারে শ্রেষ্ঠ নাটক নয়, তবে সেগুলি অবিসংবাদীরূপে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের উজ্জ্বলতম সৃষ্টি।

কিন্তু আমাদের একান্ত দুর্ভাগ্যের কথা যে, এই নাটকগুলি বাংলার সাধারণ নাট্যমঞ্চের ফসল নয়। এদের জন্ম ও প্রকাশ ভিন্নতর ক্ষেত্রে। আমাদের জাতিরই দুর্ভাগ্য যে আমাদের সাধারণ নাট্যমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ এই

দুইয়ের স্বাভাবিক ও সহজ সংযোগ ঘটে নি। আমাদের সাধারণ নাট্যমঞ্চের অগ্রগতি এবং রবীন্দ্রনাথের নাটক রচনা এই দুই বরাবর সমান্তরাল রেখায় অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু কখনও দুটি রেখা একবারও পরস্পরের আকর্ষণে দূরত্ব কমিয়ে মিলিত হওয়া দূরে থাক, কাছাকাছিও আসে নি। বোধ হয় একবার ১৯১০।১১ সালের কাছাকাছি কোন সময়ে মহাকবির একখানি গদ্য নাটক অবলম্বন করে এই দুই রেখার মিলনের একটা প্রয়াস হয়েছিল। কিন্তু আজ দূর ইতিহাসের আবেগহীন পৃষ্ঠপটে দাঁড়িয়ে মনে হয় সে মিলনের প্রয়াস না হলেই ভাল ছিল। কারণ সে প্রয়াস শেষ পর্যন্ত বোধ হয় অপপ্রয়াসে পরিণত হয়েছিল, যার ফলে দুই সমান্তরাল রেখায় বিকর্ষণের ফলে ব্যবধান দূরতর হয়ে উঠেছিল।

অথচ মহাকবি জীবনের প্রায় প্রথমকাল থেকেই, কবিশক্তি উন্মেষের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কবিতা ও গানের সঙ্গে গীতিনাট্য রচনা আরম্ভ করেছিলেন এবং ১৮৮১ সাল থেকে ১৮৯৪ সাল পর্যন্ত মধ্যে মধ্যে গীতিনাট্য রচনা করে গিয়েছেন। ১৮৯২ সালে তিনি প্রথম গদ্য নাটক রচনায় হাত দেন। তার ফল হল প্রহসন 'গোড়ায় গলদ'। তারপর থেকে মধ্যে মধ্যেই গদ্যে ও কাব্যে তিনি নাটক রচনা করেছেন। এবং সে নাটকের মূল্য আজ আমরা সবাই মোটামুটি অবগত আছি।

এ সত্ত্বেও বাংলার সাধারণ নাট্যমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথের মিলন ঘটে নি। এমন উপেক্ষার ঘটনা অত্যন্ত বিরল। এর ফল রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির পক্ষে অশুভ হয়েছিল এ কথা অতি সাধারণ জনেও বলবেন না। কারণ তিনি এমন ধরণের শিল্পী যিনি নিজের মুখ চেয়ে এবং নিজের হৃদয়রঞ্জন ছাড়া অন্য কারও মনোরঞ্জনের জন্য শিল্পকর্মে হাত দেবার মানুষ ছিলেন না। কিন্তু এ মিলন যদি সংঘটিত হত তা হলে বাংলার সাধারণ নাট্যমঞ্চই উপকৃত হত। বাংলা নাট্যমঞ্চের প্রায়শ-অনুজ্জ্বল, বহু ক্ষেত্রে অস্বচ্ছ, প্রচলিত শিল্প-যাত্রার উপর এক ভিন্নতর উজ্জ্বলতা, চারুতা ও শ্রীর ছাপ পড়ত যাতে বাংলা নাটকের লাভ বই লোকসান হত না। কিন্তু তা হয় নি।

যা হয় নি তার জন্য অর্থহীন ক্ষোভ করে লাভ নেই। কিন্তু তাতে রবীন্দ্রনাথের নাট্যকর্মের ও নাটক রচনাব বোধ হয় কোন হানি হয় নি। বোধ হয় বললাম এই জন্য যে, তা নিশ্চিত করে পরিমাপ করার আজ কোন উপায় নেই। তবে তাঁর নাটক রচনার রীতি-পদ্ধতি, নাটকের চরিত্র, মেজাজ ও শিল্পকলা সবই সাধারণ রঙ্গালয়ে চলিত তৎকালিক নাটক থেকে পৃথক, অতি মাত্রায় পৃথক ছিল। ভাল-মন্দের কথা বাদ দিয়েও এ কথা সহজেই বলা চলে যে, বাংলা নাটক যেখানে মোটা ঘটনা, উচ্চকণ্ঠ স্পষ্ট আবেগ, কড়া দাগে

টানা চরিত্র অবলম্বন করে আত্মপ্রকাশ করত সেখানে রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রধান, সুউচ্চ সুচারু ও সুক্ষ্ম ভাবকে এবং সুক্ষ্মতর আবেগকে অবলম্বন করে রচিত সুকুমার নাট্যকলা অনেক দূরের, বড় অপরিচিত বিষয় ছিল। সেই কারণে এই সুকুমার নাট্যকলাকে প্রকাশের জন্য সে দিন হয়তো ভিন্নতর শিল্প-ক্ষেত্রেরও প্রয়োজন ছিল। সে ক্ষেত্র তিনি সৌভাগ্যক্রমে নিজের সুবৃহৎ, পরিশীলিত গৃহাঙ্গনেই লাভ করেছিলেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীই তাঁর সুকুমার ধ্যানের অনুপম ধনগুলিকে উপযুক্ত চারুতায় ও শিল্পশ্রীতে মণ্ডিত করে প্রকাশ করেছিল। পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনের উপযুক্ততর পরি-বেশে তাদের আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত পীঠভূমি মহাকবি নিজেই রচনা করে-ছিলেন।

কাজেই এখানে সমস্ত আলোচনার সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, বাংলার সাধারণ নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠার পর থেকে মধুসূদন, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ, অপরেশচন্দ্র প্রভৃতি নাট্যকারদের নাটক অভিনয় করে দর্শক সাধারণকে আনন্দ ও তৃপ্তি পরিবেশন করেছে তখন রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনীত হয়েছে জোড়াসাঁকো ও শান্তিনিকেতনের ভিন্নতর চরিত্রের শিল্প-ক্ষেত্রে।

(৩)

কিন্তু বাংলা নাট্যমঞ্চের সৌভাগ্যের কথা যে, মহাকবির সঙ্গে বাংলার সাধারণ নাট্যমঞ্চের যোগাযোগ শেষ পর্যন্ত, অত্যন্ত স্বল্পকালের জন্য হলেও ঘটেছিল। কিন্তু এ যোগাযোগ ঘটেছিল ১৯২৪ সালের পর। এই প্রসঙ্গে "বাংলার সাধারণ নাট্যশালা ও রবীন্দ্রনাথ" সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য (গল্পভারতী রবীন্দ্র সংখ্যা ১৩৭৯)। তিনি বলেছেন যে, ১৮৮৬ সালে ভুবনমোহন নিয়োগীর কর্তৃত্বাধীনে রবীন্দ্র-নাথের 'বৌঠাকুরাণীর হাট্" উপন্যাসের নাট্যরূপ "রাজা বসন্ত রায়" অভিনীত হয়। উপন্যাসটির নাট্যরূপ দেন কেদার চৌধুরী। এ ছাড়া শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রযোজনায় এই নাটকগুলি অভিনীত হয় ১৯০৩ সাল—রাজা ও রাণী—রবীন্দ্রনাথ মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের সঙ্গে এই অভিনয় দেখতে যান ক্লাসিক থিয়েটারে।

১৯০৪ সালে "চোখের বালি" মঞ্চস্থ হয়।

১৯১১ সালে "দালিয়া" গল্পের নাট্যরূপ অভিনীত হয় গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে।

১৯১৪ সালে "শান্তি" কাহিনী অবলম্বনে "অভিমানিনী" নামে একটি নাটকও অভিনীত হয় অমরেন্দ্রনাথের প্রযোজনায়।

১৯২৫ সালের ১৮ই জুলাই চিরকুমার সভার উদ্বোধন হয়। ২৫শে জুলাই রবীন্দ্রনাথ সেই অভিনয় দেখেন। শোনা যায় যে, অপরেশচন্দ্রের 'রসিক' অভিনয় তাঁর খুব ভাল লেগেছিল। অনেকদিন পরে স্টার থিয়েটারে শিশিরকুমার 'চিরকুমার সভায়' চন্দ্রবাবুর পার্ট করেন। —সাধারণ নাট্যমঞ্চের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ সৃষ্টির ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেকখানি হাত ছিল।

আর্ট থিয়েটার রবীন্দ্রনাথের আরো কয়েকটি নাটক মঞ্চস্থ করেন—

১৯২৫—গৃহপ্রবেশ।

১৯২৬—শোধবোধ।

১৯২৭—পরিত্রাণ।

তখন রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কবি-সার্বভৌমের মহান্ প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত। যে শিল্পী সাধারণ নাট্যমঞ্চে অভিনয়োপযোগী নাটক প্রথম রচনা করেন ১৮৯৭ সালে 'বৈকুণ্ঠের খাতা' রচনা করে, তাঁর নাটক প্রথম অভিনীত হল তার সাতাশ-আটাশ বছর পর।

১৯২৫ সালে তাঁর প্রথম জীবনের উপন্যাস 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' 'চিরকুমার সভা' নামে নাটকের মূর্তি লাভ করে। সেই নাটক অভিনীত হল বাংলার সাধারণ নাট্যমঞ্চে। তারপর 'চিরকুমার সভা'র পথ অনুসরণ করে এল তাঁর প্রহসন 'গোড়ায় গলদে'র পরিমার্জিত নাট্যরূপ 'শেষরক্ষা'। 'অন্তরালের শিশিরকুমার' নামক পুস্তকটির রচয়িতা তারাকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন যে, শিশিরকুমার 'গোড়ায় গলদে'র নাট্যরূপ আনতে শান্তিনিকেতনে গেছেন। কবি লিখে রেখেছিলেন; আমায় শোনালেন। শুনে চুপ করে আছি দেখে বললেন, কি হে পছন্দ হয় নি? আমি বললুম, অপছন্দ হবে কি করে? তবে 'চন্দ্র' আমাকেই সাজতে হবে। তাই অনুভব করছি ওকে মাঝখানে ছাড়লে দাঁড় করাতে পারবো না নাটককে। কবি বললেন— সব কথা খুলে বল। আমি সবিস্তারে বললুম। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে রবীন্দ্রনাথ ফালা ফালা করে ছিঁড়ে ফেললেন পাণ্ডুলিপি।

—"বলেন কি। বিশ্বাস হয় না যে।"

—"আমারও এখন বিশ্বাস হচ্ছে না। নিতান্ত স্বচক্ষে দেখেছি, তাই ভুলবো না কোন দিন।"

"তারপর?"

—পরের দিনই চায়ের টেবিলে ডাক পড়ল। গেলুম। চায়ের পালা চর্ব-

চোষ্য সারা হল। জানেন কি, কবি নিজে খেতেন, প্রয়োজন ও রুচিমত, কিন্তু টেবিলে যা পরিবেশন করা হত তা সাবাড় করতে একটা পাঁচ পাকস্থলী বিশিষ্ট উটের দরকার হত। আমার অভিজ্ঞতা তাই। অন্যে কি সাক্ষ্য দেবে জানি না।"

"তারপর ?"

—"আদ্যোপান্ত রচনা করেছেন কবি সারা রাত ধরে। নিখুঁত আশ্চর্য। বললেন, গোড়ায় গলদ ছিল, শেষরক্ষা হল। এর নাম হোক 'শেষরক্ষা'।" 'শেষরক্ষা'ও 'চিরকুমার সভা'র মত জন-সমাদর লাভ করেছিল।

আমি মহাকবির এই দুটি নাটককেই আজ আলোচনার বিষয় হিসাবে বেছে নিয়েছি। রবীন্দ্রনাথের মাত্র দুটি নাটক এবং বিশেষভাবে এই দুটি নাটক মাত্র, আলোচনার বিষয় হিসাবে উপস্থাপিত কেন করলাম তার জন্য কিছু কৈফিয়ৎ আপনাদের দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

যিনি বাংলা সাধারণ নাট্যমঞ্চের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে যুক্ত ছিলেন সেই গিরিশচন্দ্রের নাট্য রচনার পরিমাণের সঙ্গে মহাকবির সমগ্র নাট্যকর্ম সহজেই তুলনীয়। গিরিশচন্দ্র যেখানে সাতাত্তরখানি নাটক রচনা করেছিলেন সেখানে রবীন্দ্রনাথের বিবিধ শ্রেণীর নাট্য রচনার মোট পরিমাণ পঞ্চাশের কাছাকাছি। এই হিসাব থেকে তাঁর নৃত্যনাট্যের হিসাব বাদ দেওয়া আছে। তাঁর এই বিপুল পরিমাণ নাট্যকর্ম শুধু ভারের দিক দিয়েই ইন্দ্রধনুর মত বহুবিচিত্র নয়, নাটক, সঙ্গীত ও নৃত্যের বহুবিবিধ ভঙ্গিতে মিলনের ফলে তারা প্রত্যেকেই শিল্পরীতিতেও অনন্য এবং সমগ্রভাবে বহুবিচিত্র। তাঁর এই বৃহৎ ও বিচিত্র নাট্যশিল্প নিয়ে ইদানীং কাল পর্যন্ত বহু গভীর আলোচনা হয়েছে। সেই বিবেচনাতেই আমি স্বল্পক্ষণের বক্তৃতার মধ্যে তাঁর সমগ্র নাট্যশিল্পের পূর্ণ পরিচয় দেবার প্রয়াস করি নি। মাত্র তাঁর দুটি নাটকই বেছে নিয়েছি।

এ ছাড়া এ দুটি নাটকের বিষয়বস্তু এমন যে, এর অভিজ্ঞতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় যে কালের মানুষের আছে সে কাল বোধ হয় ইতিমধ্যেই অপসৃত। সে কালকে যাঁরা চিনতেন তাঁদের মধ্যে খুব বেশী মানুষ বোধ হয় আর নেই, যাঁরা আছেন তাঁরাও যাবার জন্য পা বাড়িয়েছেন। এক দুই দশক পর হয়তো এই নাটক দুটির ভাববস্তু পাঠকের কাছে অবাস্তব ও সেই কারণে অনেক পরিমাণে অর্থহীন বলে বিবেচিত হতে পারে। সেই কারণেই আলোচনার জন্য এই নাটক দুটি বেছে নিয়েছি।

এই প্রসঙ্গে আমার একটি কৌতুককর অনুমানের কথা নিবদেন করি। আজ যাঁরা সভায় উপস্থিত আছেন তাঁদের মধ্যে যাঁদের বাংলা নাটক সম্পর্কে আলোচনার ঔৎসুক্য আছে তাঁরা বিষয়টি পুনর্বার ভেবে দেখতে পারেন।

আমার অনুমান অভ্রান্ত এমন দাবী আমার নেই। তবে আলোচনার বিষয় হিসাবেই তা আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করছি।

'চিরকুমার সভা'র আদি রূপ 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাস এবং 'শেষরক্ষা'র আদি রূপ 'গোড়ায় গলদ' নামক প্রহসন। 'গোড়ায় গলদ' রচিত হয় ১৮৯২ সালে এবং 'প্রজাপতির নির্বন্ধে'র রচনা-কাল ১৯০৪ সাল। অথচ এ দুটির প্রচলিত নাট্যরূপ মহাকবি দেন যথাক্রমে ১৯২৫ ও ১৯২৮ সালে। নাটক দুটি সাধারণ নাট্যমঞ্চে অভিনয়ের মাধ্যমে অসাধারণ জন-সমাদর লাভ করেছিল। সেই কারণে আমার ধারণা যে ধরণের সামাজিক অবস্থার পটভূমিতে নাটক দুটির সৃষ্টি, সেই কাল প্রত্যক্ষভাবে সমগ্র বাংলা দেশে বোধ হয় এসেছিল ১৯২০ সালের পর এবং তার স্থিতি বোধ হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত। অথচ মহাকবি এই কালকে সমগ্র দেশে সম্পূর্ণ আবির্ভাবের অন্তত বিশ পঁচিশ বছর আগে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই যে দিন তারা প্রথম রচিত হয়েছিল সে দিনকাব সমগ্র বাঙালীর পক্ষে তাদের সম্পূর্ণ বসগ্রহণ সম্ভব হয় নি। এবং ১৯৩৯ সালের পর থেকে সে কালও বোধ হয় অপসৃত হতে হতে আজ সম্পূর্ণ অপসৃত হতে চলেছে।

এই নাটক দুটির অভিনয়ের মাধ্যমে রসগ্রহণের কাল বিগতপ্রায়। এর দ্বাবা নাটক দুটির সম্পর্কে বা নাট্যকার সম্পর্কে কোন অসম্মান সূচিত হচ্ছে না। কারণ এই একই বিস্মৃতির পথে বাংলার বিগত একশো বছরের অধিকাংশ নাটকই মহাপ্রস্থান করেছে। অথচ এই প্রসংগে মনে হয়, মহাকবির রচিত নাটকের ক্ষেত্রে এই সমাদরের তারতম্য আজ বিচিত্রভাবে পরিস্ফুট। সত্যকারের সাহিত্যগুণসম্পন্ন এবং বহুবিচিত্র ভাব ও কল্পনার আধারস্বরূপ তাঁর নাটকের সংখ্যাও অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত ও খ্যাতিমান নাট্যকারদের তুলনায় সর্মাধিক বলে তাঁর নাট্যসৃষ্টির ক্ষেত্রেই এ কথা সর্বাধিক প্রযোজ্য।

এর শ্রেষ্ঠ প্রমাণ পাওয়া যায় চোখের সামনে আধা-পেশাদারী, অপেশাদারী ও সৌখীন নাট্য-সংস্থাগুলির অভিনয়ের জন্য নাটক নির্বাচন থেকে। আজ যতদূর স্মরণ হয়, সাধারণ বাঙালীর কাছে রসকল্পনার সূক্ষ্মতা সত্ত্বেও 'বৈকুণ্ঠের খাতা' এক সময় বিশেষ জনচিত্তরোচক ছিল। এই কিছু কাল পূর্বেও মহাকবির 'রক্তকরবী' বিশেষ সার্থকতার সংগে কয়েক বৎসর ধরে বহু রাত্রি অভিনীত হয়ে সপ্রশংস খ্যাতিতে সার্থক হয়েছে। অথচ 'রক্তকরবী' রচিত হয়েছিল ১৯২৬ সালে, 'শেষরক্ষা' ও 'চিরকুমার সভা' রচনার সমসাময়িক কালে। তখন সাধারণ দর্শকের চিত্তবিনোদনের জন্য কেউ 'রক্তকরবী' অভিনয়ের কথা ভাবতেও পারতেন না। অথচ সে সময় 'শেষরক্ষা' ও 'চিরকুমার

সভা' সৌখীন সম্প্রদায়গুলির অভিনয়ের জন্য সর্বপ্রথম সোৎসাহে নির্বাচনের বস্তু ছিল। তাই মনে হয়, যত দিন যাবে তাঁর রূপক ও সাঙ্কেতিক নাটক-গুলি দিনে দিনে তত উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। সেখানে চিরকালের কথা সমগ্র পৃথিবীর পটভূমিতে বিধৃত। তাঁর নৃত্যনাট্যগুলি সম্পর্কেও সেই কথাই বলা চলে। তাদের বিপুল জন-সমাদর তো আমরা সকলেই চোখের উপর আজ দেখছি।

কিন্তু 'শেষরক্ষা' ও 'চিরকুমার সভা'র সে দিন আর নেই। যে কালের পটভূমিতে এরা চিত্রিত সে কাল অন্তর্ধান করেছে। নাটকের সেই চরিত্র-গুলি তাদের সেই কালের বহিরঙ্গের অঙ্গদ ধারণ করে চিরকালের মানুষটিকে নিজের অন্তরে ধরে রেখেছে। অথচ আমরা ওই নাটক দুটির স্পন্দমান উত্তাপ ও আবেগ অভিনয়-দর্শনের মারফৎ প্রত্যক্ষভাবে উপভোগ করেছি; আমাদের মধ্যে যাদের অভিনয় করবার শখ ও শক্তি ছিল, ওই দুটি নাটকে কোন কোন ভূমিকায় অভিনয়ও করেছি, নাটকের পাত্র-পাত্রীর সঙ্গে সহজেই একাত্ম হয়েছি। সে উত্তাপ ও আবেগের স্মৃতি আজও স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয় নি। অথচ আজকের দর্শক তার থেকে পুরো উত্তাপ তো পাবেন না, তার পুরো আবেগ তো তাঁদের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে সঞ্চারিত হওয়া দুরূহ। তাই সেই উত্তাপ ও আবেগের স্মৃতিশুদ্ধ নাটক দুটিকে আলোচনার জন্য উপস্থাপিত করছি।

এই সঙ্গে আর একটি ছোট কথা আছে। আমার এই বক্তৃতাই এই ধারার শেষ বক্তৃতা। নাটক দুটি সম্পূর্ণভাবে মধুর রসের নাটক বলেই এ দুটি গ্রহণ করেছি আরও বেশী করে। আমার বক্তৃতা সমাপ্ত করবার সময়ে যাতে সেই প্রাচীন ও অতি পরিচিত, অতি প্রচলিত কথাটি বলতে পারি—মধুরেন সমাপয়েৎ।

(৪)

নাটক দুটি সম্পূর্ণভাবে মধুর রসের নাটক। কিন্তু নাটক দুটির মাধুর্য-রস বিচারের পূর্বে নাটক দুটির কালের পটভূমি ও চরিত্র সম্পর্কে কিছু আলোচনার প্রয়োজন। কারণ সে দিন নাটক দুটি কেন রোচক হয়েছিল, আজ কেন অপরিচয়ের দরুণ রোচকতার অভাব ঘটল সে সম্পর্কে কৌতূহল জাগাই স্বাভাবিক।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই প্রাচীন বৃদ্ধ কালের পাশাপাশি এক নবজাত তরুণ কাল গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে প্রয়াগের দুই মিলিত জল-

ধারার মত পাশাপাশি প্রবহমাণ ছিল। দুই মিলিত জলধারার অন্তর্দেশে তারা দুয়ে মিলে মিশে এক হয়ে গেলেও, উপরের জলধারায় যেমন মিলিত দুটি ধারার স্পষ্ট পৃথক মূর্তি দেখা যায় তেমনি সমাজের বহির্লোকে এই দুই ধারাকে পৃথক করে চেনা যেত। নবীন ধারাটির জন্ম বিদেশাগত শিক্ষা-সংস্কৃতি থেকে, আর প্রাচীন ধারাটি কৌলীন্য-শাসিত বৃদ্ধ সমাজ-ব্যবস্থার অন্তমূর্তি। মধুসূদন, দীনবন্ধু যখন আবির্ভূত হয়েছিলেন তখন সেই প্রাচীন স্থবির তার গলিত জীর্ণ দেহ নিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের কাল গণনা করছে। কৌলীন্যপ্রথার অন্তকালের আংশিক ছবি আমরা দেখতে পাই দীনবন্ধুর 'লীলাবতী' ও 'জামাই বারিকে', গিরিশচন্দ্রের 'বলিদান' নাটকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে যখন রবীন্দ্রনাথ তরুণ-তরুণীর প্রথম প্রণয় ও পরবর্তী পরিণয়কে বিষয় করে 'গোড়ায় গলদ' রচনা করলেন তখন দেখা যায় দেশের অন্তত একাংশে সেই প্রাচীন বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে; একাংশ অন্তত-পক্ষে সেই কদাচারের রাহুমুক্ত হয়েছে।

এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ প্রয়োজন যে, প্রাচীন ও নবীন কাল যেখানে বিচ্ছিন্ন ও পৃথক রবীন্দ্রনাথ সে অংশের সৃষ্টি নন। সমাজের গভীরে যেখানে দুই ধারা মিলে মিশে এক নূতন মূর্তি নিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ সেই মিলিত সংস্কৃতির ফসল। তাই তাঁর রচনায় সর্বদাই সমাজের সমগ্র মূর্তি আভাসিত হয়েছে। 'প্রজাপতির নির্বন্ধে' এই মূর্তির প্রকাশ আরও স্পষ্ট। এখানে তিন শ্যালিকা সহ সস্ত্রীক অক্ষয়ের মধ্যে প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার শেষ মূর্তিটি দেখা যায়। চার কন্যার মধ্যে জ্যেষ্ঠা পুরবালা বিবাহিতা এবং স্বামী-সোহাগে প্রতিষ্ঠিতা, দ্বিতীয়া শৈলবালা বালবিধবা, তৃতীয়া নৃপবালা ও কনিষ্ঠা নীরবালা অবিবাহিতা; তাদের উপযুক্ত পাত্রের জন্য তাদের বিধবা জননী উৎকণ্ঠিতা। কন্যা দুটি লেখাপড়া ভালই শিখেছে; তারা সুন্দরী; তা সত্ত্বেও তাদের জননীর তাদের বিবাহের জন্য উৎকণ্ঠার অন্ত নাই। সেই পাত্র আবিষ্কার ও বিবাহের ষড়যন্ত্র ও আয়োজনকে অবলম্বন করেই নাটক। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, অপরূপ সুন্দর ষড়যন্ত্রের মধ্যে যে শৈলবালা পুরুষের বেশে সাক্ষাৎ পুষ্পধনুর মত আবির্ভূত হয়ে তরুণ-তরুণীর মিলন ঘটাতে সহায়তা করল, সমস্ত লীলামধুর ষড়যন্ত্রের অন্তে সে আপনার লীলার কিরাতবেশ ত্যাগ করে আবার তপস্বিনী মূর্তি ধরে পরমোজ্জ্বল আনন্দ-রাত্রির সভা থেকে আবার নিজের স্বেচ্ছানির্বাসনে ফিরে গেল নিজের নির্জন পূজার ঘরে।

তবু বলব নাটক দুটিতেই এক নবীন কালের প্রসন্ন উজ্জ্বল মূর্তি শিশুর মুখের হাসির মত ছড়িয়ে আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধাংশে

যার সমাপ্তি তার আরম্ভ-কাল বিচারের আজ প্রয়োজন নেই। তবে বিকৃত কৌলীন্য-শাসিত সমাজের বুকে যে অমা-রাত্রির অন্ধকার দীর্ঘকাল ধরে চেপে বসেছিল সে বিগত প্রেতের অপচ্ছায়ার মত তখন অপসৃত হতে আরম্ভ করেছে। কৌলীন্য-প্রথার বিকৃতির মধ্যে যাঁদের দুর্গতি ছিল সর্বাধিক, তাঁরা ছিলেন আমাদের সমাজের অপর অর্ধাংশ, আমাদের নারীকুল, যাঁরা জননী হয়ে আমাদের বুকে ধরে লালন করতেন, ভগ্নী হয়ে স্নেহ-সমাদর দিতেন, কন্যারূপে নয়নানন্দ হয়ে বিরাজ করতেন। অথচ তাঁদেরই দুর্গতির সে দিন অন্ত ছিল না। এক পুরুষের সঙ্গে বহু কন্যার বিবাহে বাধা ছিল না, প্রায় জন্ম মাত্রেই কন্যাদান চলত, আবার বয়স্থা কন্যার বিবাহ হত না, সমাজে ও গৃহে তাঁদের স্থান ছিল দুর্বল, প্রচ্ছন্ন, এমন কি অপমানিত। এই দুটি নাটকে সর্বপ্রথম আমরা দেখলাম—না, তা তো নয়, প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মের মতই নারী অশেষ প্রসন্নতার মধ্যে নিজের আসন লাভ করেছে পুরুষের পাশে। নারীকে তার প্রাপ্য সকল সম্মান দিয়ে ও আগ্রহ নিবেদন করে শুধু তার মূল্যেই তাকে লাভ করবার জন্য পুরুষ ব্যগ্র ও লালায়িত। রমণীর মন সহস্র বর্ষের সাধনার ধন না হলেও তা যে সাধনার ধন তা সানন্দে ও সশ্রদ্ধভাবে স্বীকৃত হয়েছে। আমাদের সমাজে, আমাদের গৃহে নারীর স্বাভাবিক আত্ম-প্রতিষ্ঠার বার্তা এই দুটি নাটকেই একান্ত স্পষ্টভাবে ধ্বনিত হয়েছে।

সমাজে নারীর সঙ্গে পুরুষের প্রতিটি সম্পর্কই যে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের, নারী যে সম্পর্কেই পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কিত হোক তারই মধ্য দিয়ে নারীর যে প্রাপ্য সম্মান তা পুরুষ দিয়েছে, বোধ হয় প্রথম দিয়েছে এই নাটক দুখানির মধ্য দিয়ে। এক গ্রহণ-লাগা কালের অবলুপ্তির অন্তে কালের এক নির্মল প্রভাতের সূচনার প্রসন্ন পরিমণ্ডলের মধ্য দিয়ে পুরুষের পাশেই সম-সম্মানে ও সম-সমাদরে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার মহিমায় নাটক দুটির পশ্চাৎপট মহিমান্বিত। বলতে গেলে নারীর সগৌরব আত্মপ্রতিষ্ঠার যে যাত্রাপথ আজ আমাদের সম্মুখে প্রসারিত দেখতে পাচ্ছি সেই যাত্রাপথে নাটকের ক্ষেত্রে প্রথম পথরেখার চিহ্ন এই নাটক দুটির অঙ্গে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি।

(৫)

পরিণত যৌবনে মন যখন পৃথিবীর শ্যাম শোভা ও লীলাচঞ্চলতার থেকে ধীরে ধীরে জীবনের গভীরতর অর্থের সন্ধানে নিজের মনের মধ্যে ডুবতে চায়

সেই কালে মানবলীলারসিক, মানবপ্রেমিক কবি 'ক্ষণিকা'র কাব্যগুচ্ছ রচনার সময় একদা নিজেকে প্রশ্ন করে নিজেই তার উত্তর দিয়েছিলেনঃ

"ওরে কবি, সন্ধ্যা হয়ে এল,
কেশে তোমার ধরেছে যে পাক—
বসে বসে ঊর্ধ্বপানে চেয়ে
শুনতেছ কি পরকালের ডাক।
কবি কহে, সন্ধ্যা হল বটে,
শুনছি বটে লয়ে শ্রান্ত দেহ,
এ পারে ওই পল্লী হতে যদি
আজো হঠাৎ ডাকে আমায় কেহ;
যদি হোথায় বকুলবনচ্ছায়ে
মিলন ঘটে তরুণতরুণীতে,
দুটি আঁখির 'পরে দুইটি আঁখি
মিলিতে চায় দুরন্ত সঙ্গীতে—
কে তাহাদের মনের কথা লয়ে
বীণার তারে তুলবে প্রতিধ্বনি
আমি যদি ভবের কূলে বসে
পরকালের ভালো-মন্দই গনি॥"

সংখ্যাহীন ভারী দায়-দায়িত্বের এই সংসারে, অন্তহীন কর্মমুখরতার মধ্যেও কবি এই দায়কে উপেক্ষা করেন নি। মনে হয় একেই তাঁর জীবনের অন্যতম প্রধান দায় বলে নিজের কাঁধে তিনি তুলে নিয়েছিলেন। এর শ্রেষ্ঠ পরিচয় তাঁর বিপুল-সংখ্যক সঙ্গীত সৃষ্টির একটি বিশিষ্ট অংশে এবং বহু কবিতায় অত্যুজ্জ্বল মণিখণ্ডের মত স্থির দীপ্তিতে দীপ্তিমান। কিন্তু এই দায় থেকে বার বার তাঁর মনকে বিবিধ সমস্যা ও ভাবনা তাড়িত ও ধাবিত করে অন্যত্র নিয়ে গিয়েছে। তাঁর কবিতায় ও বিশেষ করে তাঁর গানে তরুণ-তরুণীর মিলনাকাঙ্ক্ষার দুরন্ত সঙ্গীত এক বিদেহী অলৌকিক মূর্তিতে ও দীপ্তিতে প্রকাশিত। তাদের চরিত্র লৌকিক হয়েও তাদের অতি আশ্চর্য সৌন্দর্যের ও শুচিতার প্রভায় প্রায়-অলৌকিক প্রকাশে প্রকাশিত। কিন্তু সেই দুরন্ত সঙ্গীতের সম্পূর্ণ ও লৌকিক মূর্তি আঁকবার জন্য কবি কদাচিৎ আপনার শক্তিকে ব্যবহার করেছেন। এই নাটক দুখানি তার আশ্চর্য ব্যতিক্রম। মহাকবি যাই রচনা করুন তার মধ্যে জীবনের গভীরতা সদা-সর্বদা কায়ার

অনুগামিনী ছায়ার মত যুক্ত। লঘু কিছু রচনা করা তাঁর স্বভাব-শক্তির বিরুদ্ধাচরণ করারই সামিল ছিল। এই নাটক দুটি তাঁর স্বভাব-শক্তির সেই ব্যাতিক্রমে বিচিত্র ও উজ্জ্বল। এখানে সম্পূর্ণভাবে তিনি নির্মল প্রসন্নতার মধ্য দিয়ে সরসভাবে তরুণ-তরুণীর প্রণয়লীলাকে অতি চারু ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন। পিতামহ তাঁর তরুণ পৌত্র-পৌত্রীর, অথবা পরিপক্ক, সর্বজ্ঞ বয়স্য যেমন তাঁর তরুণ বয়স্যদের প্রণয়লীলা কাছে থেকে, সঙ্গে থেকেও একান্ত দূরস্থ হয়ে উপভোগ করতে পারেন, মহাকবি সেই দৃষ্টিতেই তরুণ-তরুণীর প্রণয়লীলাকে দেখেছেন ও প্রকাশ করেছেন।

বিধাতা যেমন তাঁর সৃষ্টির নেপথ্যলোকে অবস্থান করে তাঁর রচনা-করা জীবকুলের আনন্দময় প্রণয়লীলার ক্ষেত্র রচনা করে দিয়েছেন, এখানেও তেমনি আমাদের কবি-নাট্যকার তাঁর পাত্র-পাত্রীর প্রণয়লীলার মঞ্চটি রচনা করেছেন নেপথ্যে থেকে। 'শেষরক্ষা'য় বিনোদ-কমলমুখী, গদাই-ইন্দুমতীর এই প্রণয়-লীলার আয়োজন করেছেন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চন্দ্রকান্ত, ক্ষান্তমণি, নিবারণ আর শিবচরণ। এ'রা সকলেই এই প্রণয়ীদের জ্যেষ্ঠ ও অভিভাবক; প্রণয়ের কচি লতাগুলি যাতে বাতাসে লুটিয়ে না পড়ে, গরু-ছাগলে মুখ দিয়ে তাদের অস্তিত্ব কি বৃদ্ধি লোপ না করে তার জন্য কাজের মানুষগুলির কত চিন্তা, কত আয়োজন! এমন কি যখন আবেগাচ্ছন্ন প্রণয়ীরা ভুল করে নিজেদের প্রণয়লীলায় অকারণ ও অর্থহীন জটিলতা সৃষ্টি করছে তখন তাঁরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে সে জট ছাড়াবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে ব্যগ্র হস্ত প্রসারণ করেছেন।

'চিরকুমার সভা'য় প্রশ্ন আরও সহজ। সেখানে চিরকুমার শ্রীশ আর বিপিনের কৌমার্যব্রত ভঙ্গ করবার জন্য পুষ্পধনুর চক্রান্ত মানুষই রচনা করেছে। সকলের ভালবাসার পুত্তলী দুটি অনুপমা কন্যার জন্য, নীরবালা ও নৃপবালার জন্য। অক্ষয়, রসিক আর শৈলবালা তিনজনে মিলে সেখানে মঞ্চ রচনা করেছে। অপরার্ধে আছে চিরকুমার পূর্ণ। তার ব্যাপার আরও সরল। নাটকের আরম্ভ থেকেই এই চিরকুমার-ব্রতধারীর ব্রত পঞ্চশরের বাণে আহত, মৃত্যুমুখে। তার ব্রতভঙ্গের জন্য কাউকেই প্রয়োজন হয় নি। তার ব্রতহননকারী তার নিজের সত্তার মধ্যেই প্রথম থেকেই ধনুর্বাণ হাতে উদ্যত ছিল; নাটকারম্ভের সময় থেকে তার ব্রতকে বাণে বাণে জর্জর করেছে।

এখানে উল্লেখ প্রয়োজন যে, কবি-নাট্যকার আর তাঁর পার্শ্ব-চরিত্রগুলি যেমন এই প্রণয়লীলার লতাগুলিতে অপরিসীম উৎসাহে জলসেচন করেছেন তেমনি কালও সে দিন এই কাজে পরম সহায়তা করেছে। এই কাজে সম-সাময়িক কাল এসে সোৎসাহে নাট্যকারের হাত ধরে উৎসাহ দিয়েছিল প্রসন্ন-

মুখে। বিকৃত কৌলীন্য-প্রথার কবলমুক্ত প্রসন্নমূর্তি কাল সে দিন প্রণয়ীদের দিকে তার অসংকোচ প্রসন্ন দৃষ্টি প্রসারিত করেছিল। তার উপর সে দিনের পৃথিবী আজকের তুলনায় অনেক পরিমাণে নির্জন, মন্থর, আলস্যময় ও সমস্যাহীন ছিল। সে দিন প্রণয় ও পরিণয়ে সহজেই স্বচ্ছলতার জলসেক ঘটত; আলস্য-আনন্দময়, নির্জন মন্থর দিনে প্রণয়চর্চার অবসর ও মেজাজ ছিল। তাই নাট্যকার ও পার্শ্ব-চরিত্রগুলির প্রসন্নতাই নাটক দুটির নায়ক-নায়িকারা লাভ করে নি, কালের প্রসাদও তারা লাভ করেছিল। আজ আমরা সে দিনের দিকে চোখ ফিরিয়ে সক্ষেদ দীর্ঘশ্বাসই পরিত্যাগ করতে পারি। কিন্তু সে দিন আর ফিরবে না। তাই বিগত দিনের এই ঐশ্বর্যময়, স্বপ্নময়, আনন্দময় নাটক আজ আমাদের কাছে বাস্তব বলে মনে হবে না। কিন্তু তার ঐশ্বর্য, স্বপ্ন ও আনন্দ নিয়ে আমাদের এক পরিপূর্ণ ইচ্ছাপূরণের অমৃত-স্বাদ দিতে পারে।

(৬)

এই নাটক দুটির যারা পাত্র-পাত্রী—নায়ক-নায়িকা ও সমস্ত পার্শ্ব-চরিত্র—সকলেই এই বিশিষ্ট কালের সন্ততি। তাদের সকলের অঙ্গেই এই নির্জন, মন্থর, আলস্যময়, সমস্যাহীন কালের স্পর্শ লেগে আছে। মঞ্চে উপস্থিত হয়ে তারা তাদের সেই চরিত্রগন্ধই বিতরণ করে।

নাটক দুটিতে যে সমস্যা আছে তা আসলে কোন সমস্যাই নয়। যদি কোন সমস্যা থাকে তা কল্পিত, কল্পনায় তার সৃষ্টি; স্বপ্নেরই মত তা অলীক এবং মধুর; তার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। তবু সেই কল্পিত সমস্যার সমাধান করবার জন্যই কত আয়োজন, কত কৌশল! 'কমেডি'তেও তো অনেক সমস্যাই থাকে, সেই সমস্যা বা সেই দুঃসময় বা সেই দুর্বিপাক কাটিয়ে মিলনান্তক পরিণামকেই আমরা সচরাচর 'কমেডি' বলে আখ্যা দিই। কিন্তু 'শেষরক্ষা' এবং 'চিরকুমার সভা'র তো আসলে কোন সমস্যাই নেই। তাই এই নাটক দুটিকে মিলনান্তক নাটক না বলে মিলনাত্মক নাটক বললেই যেন আরও ভাল শোনায়। মহাকবি যেন এই নাটক দুটিতে তরুণ-তরুণীর মিলনের দুরন্ত সংগীতের অন্তরালে প্রণয়ী-যুগলদের যে মনের কথা, সেই মনের কথাকে বীণার তারে প্রতিধ্বনিত করবার প্রতিশ্রুতি পালন করেছেন। এখানে শুধু তরুণ-তরুণীর প্রণয়লীলাই ব্যক্ত ও বিধৃত হয়েছে। এর মধ্যে কেউ এই লীলার বিরোধিতা করে কোন সমস্যার সৃষ্টি করে নি; সবাই একই লীলাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমর্থন ও উৎসাহিত করেছে।

এই পটভূমিতে একবার নাটক দুটির পার্শ্ব-চরিত্রগুলিকে দেখুন। 'শেষ-রক্ষা'র নিবারণ আর শিবচরণ এবং 'চিরকুমার সভা'র রসিক আর চন্দ্রমাধব-বাবু যেন সে কালের একটি বেলোয়ারী কাঁচের বিভিন্ন দিক। নিবারণ সে কালের শান্তস্বভাব, বিচক্ষণ, বৈষয়িক, রস ও স্নেহপরিপূর্ণ অন্তর প্রৌঢ়; শিবচরণ আপাতকঠিন, দর্পিত, রূঢ়ভাষী, নিজের সংসারে সম্রাটমন্য, প্রতিষ্ঠা-বান, সামাজিক বন্ধুবৎসল ভদ্রলোক। আর রসিকদাদা যেখানে রসের সাগরে সাঁতার কেটে রসের ঝাপটায় অনভিজ্ঞ, রসস্পর্শলিপ্সু তরুণ সন্তরণপ্রয়াসী-দের ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন গঙ্গার ফেনশীর্ষ জোয়ারের মত, সেখানে চির-কুমার, মানবকল্যাণকামী, অন্যমনস্ক, আদর্শবাদী চন্দ্রমাধববাবু শরৎ-দিনের উদাসীন শুভ্র মেঘের মত নাটকের মধ্যে বিচরণ করে ফিরছেন। চরিত্রে এককে দেখে অন্যের বিপরীত মনে হতে পারে। কিন্তু চরিত্রধর্মে সকলেই সেই নির্জন, আলস্যরসমন্থর কালের চিন্তা-ভাবনাহীন, আনন্দময় সন্তান। তার ফলে সকলেরই চরিত্রে এক প্রসন্নতার কোমল স্পর্শ আছে। আর এক জায়গায় সকলেরই একাত্মতা রয়েছে। সকলেই তাঁদের স্নেহাস্পদ ও স্নেহাস্পদাগুলির জন্য সতত স্নেহে শঙ্কাশীল। তাঁদের অন্তরের কামনা এক—যাঁদের তাঁরা ভালবাসেন তারা প্রণয় ও পরিণয়ে সার্থকতা লাভ করুক, তারা সুখী হোক।

'শেষরক্ষা'র চন্দ্রকান্ত আর 'চিরকুমার সভা'র অক্ষয়ের চরিত্র প্রায় এক। দুই নাটকেই তাঁরা যদিচ নায়ক নন, তবু তাঁরাই দলের দলপতি। 'শেষরক্ষা'য় চন্দ্রকান্তকে অবলম্বন করেই তরুণ বন্ধুদের উচ্ছ্বসিত সমাগম আর 'চিরকুমার সভা'য় অক্ষয়কে কেন্দ্র করেই চিরকুমার সভা ধ্বংসের চক্রান্ত। দুজনেই সুরসিক, দাম্পত্যজীবনের আনন্দে পরিপূর্ণ, তাঁদের সেই আনন্দের উচ্ছ্বসিত ছটায় তরুণেরা মুগ্ধ, তাঁদের প্রীতিতে অভিষিক্ত। চন্দ্রকান্ত কথায় কথায় সরস রসিকতা করেন, অক্ষয় কথায় কথায় নিজে গান রচনা করে তৎক্ষণাৎ গেয়ে ওঠেন। নাটক দুখানিতে তরুণ-তরুণীর প্রণয়লীলাকে যদি ললিত লতার সঙ্গে তুলনা করি তা হলে বলতে হবে এই দুই রসিক, স্নেহশীল ভদ্র-সন্তানের চরিত্র ও কর্ম সেই লতাকে জন্মদানের মৃত্তিকা। দুজনেই নাটক দুখানিতে স্নেহশীল অগ্রজের ভূমিকায় সগৌরবে ও সসম্মানে অধিষ্ঠিত।

বাকী থাকেন নাটক দুটির নায়ক-নায়িকারা। 'শেষরক্ষা'য় বিনোদ-কমলমুখী, গদাই-ইন্দুমতী, 'চিরকুমার সভা'য় শ্রীশ-নৃপবালা, বিপিন-নীরবালা, পূর্ণ-নির্মলা। তাদের সম্পর্কে বলার কথা বিশেষ কিছু নেই। তারা চিরকালের তরুণ-তরুণী, যারা মহাকালের কুসুমাস্তীর্ণ বীথিপথ বেয়ে অনাদি কাল থেকে যাত্রা আরম্ভ করে বংশ-পরম্পরা হাত-ধরাধরি করে হাস্য-মুখে পথ চলেছে মানব-ইতিহাসের অতি সুদূর ভবিষ্যতের দিকে। মুক্তে

কারও চরিত্রে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। তফাৎ যা কেবল বাইরের স্বভাবে। তা সে পুরুষই হোক আর নারীই হোক। মহাকবির ভাষাতেই তাদের পরিচয় অতি সুন্দরভাবে বিবৃত।—

কেউ বা অতি জ্বলজ্বল, কেউ বা ম্লান ছলছল,
কেউ বা কিছু দহন করে, কেউ বা স্নিগ্ধ আলো।

(৭)

নাট্যকার হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ঘটনার সংঘাতের মাধ্যমে নাটকের কাহিনীকে গঠন করতেন না, করতেন ভাবের মাধ্যমে। এখানে ভাবের পরিবর্তে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন ভাষার, বাক্যের। এক আশ্চর্য বাক্-বিভূতিতে নাটক দুটির আদ্যোপান্ত অতি উজ্জ্বল, যেন জরির কাজ-করা মহার্ঘ অঙ্গদের দ্বারা তার সর্বাঙ্গ মণ্ডিত। সমগ্র রচনায় এমন বাক্-বিভূতি কদাচিৎ প্রত্যক্ষ করা যায়।

নাটক দুটিতে হাস্যরসের সঙ্গে মধুর রস পাক করে পরিবেশন করা হয়েছে। আমি যাকে মধুর রস বলে অভিহিত করছি তা আসলে সেই অনাদি আদি রস। আদি রসের ঘনত্বকে মহাকবি এখানে লঘু ও পাতলা করে মধুর রসে রূপান্তরিত করে নাটকে মূর্তি দিয়েছেন। মানব-জীবনের চর্চার ফলে কাম প্রেমে রূপান্তরিত হয়, আবার সেই প্রেম যখন প্রণয়ের মধ্য দিয়ে তার অপটু, লজ্জিত, শঙ্কিত প্রথম পদপাত করবার জন্য উদ্যত হয় তখন তার আস্বাদ অস্পষ্ট, লঘু, এবং তা যত হৃদয়রোচক তত নয়নানন্দকর। তা বড় স্বাদু বড় সুন্দর। সেই কারণেই বোধ হয় একে আদি রসের পরিবর্তে মধুর রস বলা হয়েছে। এই মধুর রসই নাটক দুটির মূল রস। মনোহরা নামক যে মিষ্টান্ন তার বাইরে চিনির একটা শক্ত আবরণ দিয়ে যেমন ভিতরে নরম ক্ষীরের পুর দেওয়া হয়, তেমনি এই নাটক দুটিতে বাইরে হাস্যরসের আবরণ দিয়ে ভিতরে মধুর রস পরিবেশন করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

নাটকের ফলশ্রুতি মধুর-রসজাত আর তার পরিপূর্ণ অঙ্গসজ্জা হল হাস্যরসের। এমন বুদ্ধিদীপ্ত, সরস, অসূয়া ও আঘাতহীন বাক্যসম্ভার বাংলা সাহিত্যের সুবিস্তৃত অঙ্গনে কতটুকু মিলবে! তার ফলে একটি উজ্জ্বল সরসতায় দর্শক ও পাঠকের চিত্ত ছেদহীন ভাবে সর্বদা সতর্ক ও সরস থাকে। আশ্চর্যের কথা এই যে বুদ্ধির ও চিত্তের এই দীপ্তি নাটক দুটির আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত একবার এক মুহূর্তে স্খলিত বা অনুজ্জ্বল হয় নি।

সেই সঙ্গে এর চারুতা। এমন পরিশীলিত পরিমণ্ডল বাংলা নাটকে

আমরা কদাচিৎ প্রত্যক্ষ করেছি। অতি সুচারু, নির্মল, সরস রসিকতার তরঙ্গের মাথায় মাথায় এখানে শ্রোতা-দর্শক-পাঠকের বিচরণ। মধ্যে মধ্যে তাতেও যেন কবি-নাট্যকারের তৃপ্তি হয় নি। সেই নির্মল, উজ্জ্বল তরঙ্গ মধ্যে মধ্যে যখন উত্তুঙ্গ হয়ে উঠেছে তখনই তা রূপ নিয়েছে একটি সঙ্গীতের মূর্তিতে অথবা অনুবাদসহ একটি সংস্কৃত শ্লোকে। গদ্যের দীপ্তির সমস্ত চাঞ্চল্য সেখানে গিয়ে কাব্য-হীরকের স্থির দ্যুতিতে অবয়ব নিয়েছে।

এইখানে একটি বিশেষ বক্তব্যের উল্লেখ করতে হবে। আমাদের সমাজে শ্যালিকার সঙ্গে রসিকতার সম্পর্ক চিরকালের। নূতন কাল তাতে একটি নূতন সুর যোগ করে দিয়েছিল। সম্পর্ক রস-রসিকতার হলেও শ্যালিকা যে মূলত ভগ্নীর মত, কন্যার মত তার একটি বোধ প্রচ্ছন্নভাবে এনে দিয়েছিল। এই নববোধের পটভূমিতে ভগ্নীপতির অসঙ্কোচ হৃদয় যে রসিকতা 'চিরকুমার সভা'র মাধ্যমে শ্যালিকাদের উদ্দেশে নিবেদন করেছে তা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেই শুধু নয়, বাংলা সংস্কৃতিতেও অভিনব। ভগ্নীপতির সঙ্গে শ্যালিকার রসিকতার একটি অতি চারু ও উচ্চ মান নাট্যকার নাটকটির মাধ্যমে বাঙালীকে তাঁর অজস্রবিধ দানের সঙ্গে দিয়ে গিয়েছেন।

(৮)

নাটক দুটি সম্পর্কে আমার বক্তব্য শেষ হয়ে এসেছে। পরিশেষে শুধু এই কথাই বলি, যে কালের নাটক এ দুটি, সে কালও যেমন বিগত তেমনি এমন সম্পূর্ণ-মাধুর্যমণ্ডিত পরিপূর্ণ আনন্দের নাটক আর বোধ হয় বাংলা সাহিত্যে রচিত হবে না। নাটক দুটি সর্বত্র শুভ্র প্রসন্নতায় রৌদ্রকরোজ্জ্বল; কোথাও বেদনার ছায়া মাত্র নাই। তবে এ কথা বলে বোধ হয় ভুলই করলাম মনে হয়। কারণ 'চিরকুমার সভা'র সমাপ্তি-মুহূর্তে যখন সমস্ত মঞ্চ আনন্দে থৈ থৈ করছে, সেই আনন্দিত উজ্জ্বল মুহূর্তে একজনের স্থান সেখানে হয় নি। সে নিজেকে সেখানে অতিরিক্ত বিবেচনা করেছিল। পুরুষের বেশ ত্যাগ করে, লীলা-মৃগয়া সমাপ্ত করে সে তখন পূজোর ঘরের নির্জনতায় পা বাড়িয়েছে। বিধবা শৈলবালা ও তার সঙ্গে শৈলবালার স্রষ্টাকেও এ মেনে নিতে হয়েছিল। অথচ তার হৃদয়ের লীলা তো তখনও সমাপ্ত হয় নি। 'চিরকুমার সভা'র হাস্যোজ্জ্বল মূর্তিতে শৈলবালা তাই এক বিন্দু অশ্রুর মত চিরকাল লোক-দৃষ্টির অগোচরেই রয়ে গেল।

যে পাঁচজন নাট্যকারকে আমার বক্তৃতার বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেছিলাম তাঁদের সম্পর্কে আমার বক্তব্য শেষ হয়েছে। এই কয়জন নাট্যকার সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি আমার স্বল্প-পরিসর বক্তৃতার মধ্যে আমার বক্তব্য সাধারণভাবেই বলেছি। বিশেষভাবে কোন নাটক সম্পর্কে সচরাচর বলার সুযোগ আমার সংক্ষিপ্ত বক্তৃতাগুলির মধ্যে ছিল না। তবে তাঁদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাঁদের অস্তিত্বের পটভূমি যে কাল, যে কাল তাঁদের পাদপীঠ, যে কালের তাঁরা সন্তান, সেই কালের লক্ষণ, রুচি ও বিশিষ্টতা সম্পর্কেও আমার বক্তব্যের মধ্যে স্পর্শ করে যাবার চেষ্টা করেছি।

আজ তাঁরা কালের বুকে তাঁদের কীর্তির উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে বিগত। তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের কালও বিগত। সে কাল আর ফিরে আসবে না। আজ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরপারে দাঁড়িয়ে, অতি দ্রুত-পরিবর্তিত এক পৃথিবীকে সম্মুখে নিয়ে এক কালান্তরে আমরা উপনীত। এই কালান্তরের ভূমিতে দাঁড়িয়ে সে কালকে চেনা বড় কঠিন।

আজকের পরিবর্তিত পৃথিবীর মূর্তি ভিন্ন: রুচি, শিল্প-সংস্কার সব পৃথক। সে দিন যে সব শিল্পকর্ম সুপ্রচুর পরিতৃপ্তি দিয়েছে, তাদের অধিকাংশই আজ পরিতৃপ্তি দিতে পারছে না, পারবে না। আজকের চিন্তা, আজকের কথা, আজকের ব্যথা আজকের অনুভব সব কিছুরই প্রকৃতি অনেকখানি পৃথক রূপ নিতে চলেছে।

পৃথক হবার আর দোষ কি? বদল তো কম হয় নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে সেই যে ভাঙার কাজ আরম্ভ হয়েছে সারা পৃথিবীতে সেই ভাঙার কাজ সমানেই চলেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর বিশ্বব্যাপী সে ভাঙার যে কাজ তা আজ এখানে কাল সেখানে ঘটে চলেছে। এর ফলে মানুষের ঘর-সংসারই শুধু ভাঙে নি, মানুষ পূর্বে যা বিশ্বাস করত তাও কতক ভেঙেছে, কতক ভাঙছে, বাকী কতক ভেঙে যাবার জন্য অপেক্ষা করছে। তবে এর মধ্যে একটা কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, আমাদের পুরনো বিশ্বাস ভেঙেছে, কিন্তু তার জায়গায় নূতন কোন বিশ্বাস এসে আমাদের মস্তিষ্কে বা হৃদয়ে এখনও আসন পেতে বসে নি।

এই পটভূমিতে তাই শুধু তাকে খোঁজার কাজই চলছে। সারা পৃথিবীতেই চলছে। আজ পুরনো কিছু সামনে তুলে ধরলে তার মধ্যে আমাদের সন্ধানী মন পছন্দমত যেটি সেটি খুঁজে না পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে তাকে বাতিল করে দেয়। অথচ সন্ধানী মন আসলে আজ নিজেই জানেই না সে কি চাইছে, সে কি খুঁজছে! তাই আজ অনন্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

সেই সঙ্গে পৃথিবী আজ বড় ছোট হয়ে এসেছে। পৃথিবীর অন্য প্রান্তের

পরীক্ষা-নিরীক্ষার সংবাদ আজ পাশের বাড়ীর সংবাদের মতই সহজেই আমাদের কাছেও পেঁাছে যায়। তার মধ্যেও পরম আগ্রহে আমরা আমাদের সন্ধানের ধনকে খুঁজে দেখি।

বাংলা নাটকের বিবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রেও এ বার্তা আজ সুপরিস্ফুট। তাকে সম্মান ও প্রশংসা জানাতেই হবে। তবে সেই সঙ্গে এ কথাও বলতে হবে যে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা যে দেশের সংস্কৃতি থেকেই আসুক সে যেন স্বদেশের নিজস্ব মূর্তিতেই আবির্ভূত হয়। এ কথা ভুললে চলবে না যে, বিশ্বাসের, চিন্তার ও রুচির যত অদল-বদলই হোক, সর্বদেশে সর্বকালে শিল্পের উপাস্য দেবতা মানুষ। আর সেই উপাস্য নিজের অপরিচিত মূর্তি শিল্পের মধ্যে দেখে তাকে আপনার মূর্তি বলে চিনতে না পারলে, শিল্পীর পূজা গ্রহণ করবেন না। শিল্পীকে তাঁর উপাস্যকে পূজা নিবেদন করতে হবে সেই মূর্তিতে, যে মূর্তিতে তিনি প্রসন্ন মনে পূজা গ্রহণ করতে পারেন। শিল্পী তাঁর উপাস্যের সেই মূর্তিকে খুঁজে পেতে পারেন একমাত্র তাঁর নিজের সংস্কৃতির ও নিজের দেশের মানুষের মধ্যে। আর সে মানুষ তাঁর সম্মুখেই বিচরণ করে ফিরছেন নিজের আনন্দে, নিজের দুঃখে, নিজের জীবনযাত্রার পথে।
